আকাশ-পাতাল

সৌরীন্দ্র মজুমদার

রুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
লিকাতা।

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৪৩

উপন্যাস

দাম দুই টাকা

প্রবর্ত্তক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ৮নং ওয়েলিংটন
স্কোয়ার হইতে শ্রীসুনীল মজুমদার বি-এ
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আমার

প্রথম

বইখানি

উৎসর্গ

ক'রলাম-

মা'কে

৬০।২ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,

ক'লকাতা

১৫ই আশ্বিন '৪৩।

রচনা কাল—১৩৪০ সাল।

কানপুর।

— দু'টো কথা —

ভূমিকা বা পরিচয় লেখবার প্রয়োজন হয়ত' আছে। সমালোচকদের হাতে পড়ে এর কি অবস্থা দাঁড়ায় দেখবার জন্যে এবার ভূমিকা দিলাম না, প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে প্রকাশ ক'রবো।

যারা আমায় উপন্যাস লেখবার অনুপ্রেরণা, উৎসাহ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে পল্লীকবি শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ চক্রবর্ত্তীর নাম উল্লেখ না ক'রলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে। তাঁদের শুভেচ্ছা না পেলে হয়ত' এ প্রচেষ্টা আজ সম্ভব হতো না।

যুক্ত প্রদেশে থাকা কালীন প্রবাসী শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক শ্রীযুক্ত কেদার-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যক্ষ সুকবি শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য আমায় যথেষ্ট উৎসাহিত ক'রেছেন।

কানপুর থেকেই উপন্যাসখানি পাঠিয়েছিলাম পূজনীয় শিক্ষাগুরু রায় জলধর সেন বাহাদুরের নিকটে। সংশোধন ও প্রবর্ত্তন ক'রবার অনুরোধে তিনি শুধু মতামত জানাননি অজ্ঞাত প্রবাসী তরুণ লেখকের বইখানি ভারতবর্ষ পত্রিকার জন্যে মনোনীত করেন। আজ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রবার মত ভাষা নেই—মৌন, মূক শ্রদ্ধাই আমার সম্বল।

আকাশ-পাতাল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'অপত্য-স্নেহ' নামে প্রকাশিত হ'য়েছিল। মানসিক শ্রমিকের (mental worker) অধ্যায় যোগ ক'রে ও স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ক'রে বই আকারে প্রকাশিত হলো।

সবই নিজেকে দেখতে হ'য়েছে এবং কাজের ফাঁকে পরিবর্দ্ধিত অধ্যায়গুলি লিখতে হ'য়েছে বলে ভুল, ত্রুটি থাকা সম্ভব, আশাকরি প্রথম অগ্য বলে পাঠক ক্ষমা ক'রবেন।

আনন্দবাজারের বাণিজ্য-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছেন ; তাঁর উৎসাহ ও সাহায্যের জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

প্রথিতযশাঃ শিল্পী বন্ধুবর শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদারকে প্রচ্ছদপটটির জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনুজ তরুণ কবি শ্রীসুনীল মজুমদারের সাহায্য না পেলে বইখানি প্রকাশ করা আমার পক্ষে সুকঠিন হতো।

সৌঃ মঃ

কানাই পল্লীর তরুণ যুবক। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচিত; সে ত' প্রকৃতির নগ্ন দেহের একটি আভরণ মাত্র। মানুষের রুচি-মার্জ্জিত শহরের সঙ্গে তার কোন দিন পরিচয় ঘটে নি; সেজন্যে তার মনে কোন দ্বন্দ্বও হয়নি। সে মূর্খ চাষীর ছেলে, পাড়াগাঁ তার আপন, পল্লীর তরুণ যুবকরা তার সঙ্গী, চাষীর জীবন তার উদ্দেশ্য, —জীবনের গতানুগতিক চরম পথ; সঙ্গীদের সঙ্গে পাড়াগেঁয়ো খেলাধূলা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। যা হয় দশজনের, তারও তাই হচ্ছিলো। তাই হবে বলে সে জানতো, দশজনেও জানতো। হঠাৎ হাওয়া গেলো উল্টে, মন হলো চঞ্চল, প্রাণ উঠলো দুলে, জীবনের গতি গেলো এলে, চরম পথ হলো কুয়াশাচ্ছন্ন, নির্দ্দিষ্ট পথ হলো অনির্দ্দিষ্ট।

কানাই'র শহরের কোন জ্ঞান নেই, কোন কল্পনাও নেই মনে; ভাবতে পারে, ত্রিবর্ণে রঞ্জিত ক'রতে পারে এমন সম্পদও সে কোন দিন পায়নি। গাঁয়ের জমিদার-পুত্র জমিদারীর কোন কাজে এসেছিলেন দেশে। তাঁরি নিকট কুড়িয়ে পাওয়া ছবিতে দেখা শহরের কথা, মুখের কথাতে, ছবিতে পেয়েছিল রূপকথার মায়াপুরী বাস্তবে। তাই মানস-পট হলো শুভ্র, অহর্নিশি চললো রঙ-বেরঙে আলিম্পনা! কল্পিত শহরের প্রলুব্ধ, মোহিনীময়, আবেশময় হাওয়া এলো ছন্দে ছন্দে গুঞ্জরিয়ে, অভিভূত করে দিলো মাতাল মদিরার মত। দিনরাত্তির শুধু শহরের আকর্ষণ তাকে শূন্যপথে উড়িয়ে নিয়ে চলে। চেয়ে আছে, বা চোখ বুজে আছে, তবু দেখে শহরের ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য; কানে শোনে শহরের সদা-জাগ্রত কোলাহল। স্বপ্ন আসে জাগরণে, স্বপ্ন দেখা দেয় ঘুমের ঘোরে, গভীর রাত্তিরে যায় ঘুম ভেঙ্গে, সচকিতে চেয়ে দেখে, অদিশায় হাতড়ায়, হতাশ হয় স্বপনের অলীক মায়ায়। তার নেই মুক্তি, নেই নিষ্কৃতি, চরণে ফুলের কাঁটা। ক্ষণিকের তরে ধরে রাখবার মত শক্তি

পল্লী-সুন্দরীর নেই। শহর! রাজপথ, দু'ধারে সাজানো বড় বড় দালান-কোঠা স্বর্গে তুলে দিয়েছে তার চির উন্নত শির, সমস্ত স্থান থেকে চয়ন ক'রে নিয়ে আসা সাজানো বাগান, রাস্তার মোড়ে মোড়ে মোটর, ট্রাম, বাস, রেলগাড়ি, আকাশ-রথ (এরোপ্লেন) কত কি। স্বর্গ-স্বর্গ-স্বর্গ! অলিতে গলিতে দোকান, মহল্লাতে মহল্লাতে বাজার, থিয়েটার, বায়োস্কোপ, সার্কাস্, এটা-সেটা কত কি আশ্চর্য্য রকম ব্যাপার স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় এত লোক? নিশ্চয়ই বোম্বাই শহর ইন্দ্রপুরী।

সূর্য্যদেব যখন পশ্চিম নীলাকাশে পদাঘাত ক'রে সৌন্দর্য্যের শেষ রক্তাভাযুক্ত মেঘের স্তরে, পাহারের চূড়ায়, বনবনানীর উচ্চ শিরে আলিম্পনা করেন, তখন হয় পাড়াগাঁ নিঝুম; আর শহরে, বৈদ্যুতিক আলো জেলে সূর্য্যদেবকে বিদায়-আরতি দে'য়া হয় যখন তিনি তুলাপেঁজা স্তূপাকৃত মেঘরাশি থেকে, উচ্চ কলের চিমনী থেকে, মন্দির মস্‌জিদের গম্বুজ থেকে অস্তরাগের বৈচিত্র্যময় রূপমাধুরী ধীরে ধীরে টেনে নেবার প্রয়াস করেন। চিমনীর ধূসর ধোঁয়াগুলি কুণ্ডলী পাকিয়ে লতিয়ে লতিয়ে ধূপশিখার মত অনন্তে মিশে আরতির আড়ম্বর বৃদ্ধিই করে। শহরে আঁধার নেই, রাত্তিরের বিভীষিকা নেই, দিনের মত সহজ, সরল, পরিষ্কার; শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর ওপর মানুষের রুচি-মার্জ্জিত সম্পর্ক দিয়ে ঐশ্বর্য্যশালী করে, চিরমধুর, চিরসুন্দর, অফুরন্ত জ্যোৎস্নাময়, চিরষোড়শী সুন্দরী করে তুলে। নেই কোন ভয়, নেই বিভীষিকা, নেই কোন কিছুর দারিদ্র্য।

আর পল্লীগাঁয়ের? সূর্য্য ডুববার সঙ্গে সঙ্গে আঁধার, ভয়াবহ জমাট অন্ধকার পাতালপুরীর মত নির্জ্জন, নীরব, নিথর, নিস্তব্ধ, পাগলা ঝড়ো হাওয়ার যমরাজ প্রলয়নাচে ধেয়ে আসে মৃত্যুবার্ত্তা নিয়ে, সুবিধে না হ'লে

দিয়ে যায় দুঃখ দুর্দ্দশা নির্ম্মম ভাবে। মড়মড়ি কড়কড়ি ডালপালা ভেঙ্গে পড়ছে, বাড়ি-ঘর উড়ে চলে যাচ্ছে; কত কি মৃত্যু অভিসারের আড়ম্বর। সাপ, শেয়াল, পাগলা কুকুর, বাঁদর, ভূতপ্রেত কত কি ভয়ঙ্কর জীব পল্লীর আনাচে কানাচে অহরহ ঘুরে বেড়াচ্ছে। পল্লীগাঁয়ে কি আছে? কিছু নেই, কিছু নেই, একঘেয়ে পড়া পাহাড়ী মাঠ, বন জঙ্গল, ডোবা, মশা মাছি। অসুখ-বিসুখ তো একচেটে করে নিয়েছে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চাষ ক'রে ফসল উৎপন্ন করতে হয়, তাতে শুধু ডাল-রুটি, আর কিছু নয়। কশ্চিৎ বহু সৌভাগ্যের জোরে টাকার সুন্দর মুখ দেখা যায়। ৷ শহরের কত সুবিধে। অসীম, অনন্ত! যতটুকু কাজ করবে ঠিক ততটুকু মূল্যও পাবে। ইচ্ছে হলো কাজ ক'র, কড়ায় গণ্ডায় হিসাব নাও, কোন মারাত্মক ক্ষতি নেই। কি আরাম! কি সুখ! সব নগদ টাকার ব্যাপার! রাজা প্রজা নেই—সব স্বাধীন, কে কার তোয়াক্কা রাখে। দেশে জমিদারের অত্যাচার, একবার শস্য নষ্ট হলো তো সর্ব্বনাশ, শুকিয়ে মরবার যোগাড়।

কানাই পল্লীর ছেলে, পল্লীর অসুবিধে, দুঃখকষ্ট হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পেরেছে। সে শহরবাসী নয়, পাহাড় পর্ব্বতবাসীও নয়; তাই চিরপরিচিত পুরাণো গাঁয়ে নতুনত্ব কিছু পায় না, অদৃশ্য আকর্ষণও অনুভব করতে পারে না। দুনিয়ায় তার কোন প্রিয়জন নেই, পিতা মাতা অতি শৈশবেই মারা যান। অনাত্মীয়ের নিকট সে মানুষ হয়েছে। তাই গৃহ থেকেও সে গৃহহীন, সংসারের মধুর স্নেহ-বন্ধন হ'তে সে মুক্ত। কল্পিত ইন্দ্রের নন্দন-কাননের সঙ্গে যখন নিজের গাঁয়ের তুলনা ক'রে, সূক্ষ্মভাবে বিচার করে, তখন গাঁয়ের মাঝে কোন কিছু ভাল দেখতে পায় না। পল্লীর জীবন বিশেষতঃ চাষীর জীবন অতি হীন বলে মনে হয়, সঙ্গে সঙ্গে অবজ্ঞা সৃষ্টি হয়। আজন্ম পল্লীর ছেলে বলে যে জন্ম-

ভূমির প্রতি একটা অচ্ছেদ্য মায়া, আকর্ষণ মজ্জাগত ভাবে লোকের ওপর প্রভুত্ব করে, তাও অস্বীকার করতে কোন অসুবিধে হয় না। শহরের অদৃশ্য আকর্ষণ কানাই'র ওপর প্রভাব বিস্তার করার পর থেকে, কোন কিছুতে তার মন বসে না, ভাল লাগে না। খাওয়া-পরায়, কাজ-কর্ম্মে মন বসে না, চুপ করে বসে থাকে, শহরের কল্পনা আকাশ-পাতাল ভরিয়ে বিভোর করে তোলে। মাঠে যায়, এক ঘণ্টার কাজ পাঁচ ঘণ্টায়ও শেষ হয় না, সর্ব্বদা অন্যমনস্ক হ'য়ে থাকে। সুগভীর কূয়ো থেকে গোরু দিয়ে জল তুলতে যায়। দু'এক বাল্‌তি জল ওঠে, জল নদীর মত এঁকে বেঁকে নর্দ্দমা দিয়ে বহু দূরে শস্যক্ষেত্রে চলে যায়। কানাই অন্যমনস্ক হয়, চালকহীন হয়ে গোরুগুলি থেমে যায়, নর্দ্দমার জল শুকিয়ে যায়। লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে গোরু এদিক ওদিক খানিক ঘুরে ঘাস খেতে থাকে, মাঠ আর চাষ করা হ'য়ে ওঠে না। এমনি চলে সকল কাজকর্ম্ম।

জ্যোৎস্নালোকে যখন দিক্‌চক্রবাল অপূর্ব্ব মাধুরীতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, মৃদুমন্দ সমীরণ সুমধুর গুঞ্জরণে গাছের ডালে ডালে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায় দোল দিয়ে এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্তে তালে তালে নেচে চলে যায়, পল্লীর ছেলেরা মনের আনন্দে খোলা মাঠে দৌড়োদৌড়ি খেলে, কানাই দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, নীরস মনে হয়, বন্ধুরা জোর করে খেলায় নামালে খেলতে পারে না, বার-বার হেরে যায়, রাগ ক'রে সরে যায়। লতায় লতায় বেষ্টিত বনে, অচ্ছেদ্য, আলো বাতাস রুদ্ধ ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে মহা আড়ম্বর ক'রে লুকোচুরি খেলায় এখন আর মন বসে না, ভাল লাগে না সারা বনময়, মাঠে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি ক'রে খেলে বেড়ানো। ডালে ডালে দোল খেলানো এখন যেন অকিঞ্চিৎকর হ'য়ে উঠেছে। পূর্ব্বে যে গেঁয়ো খেলাধূলা তার প্রাণে আলোড়ন তুলে সকল

দিক মথিত করে ভবিষ্যৎ আনন্দের শত ফোয়ারার উৎস ছুটিয়ে দিতো, এখন সে সব অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য হ'য়ে পড়েছে!

স্পিরিটে যদি কিঞ্চিৎ আগুন ধরে, স্পিরিট অসীম থাকুক, আগুন অতি অল্প থাকলেও ধ্বক্ ধ্বক্ করে সব পুড়ে শেষ হ'য়ে যায় যদি বাতাসের সহযোগিতা থাকে। কানাই'রও হলো তাই, সবুজ প্রাণ, অপরিণামদর্শী যুবক, মায়াবন্ধনহীন; তাই অতি সহজে জন্মভূমির আকর্ষণ ছিন্ন করতে সমর্থ হলো। জমিজমা যা আছে তাতে একার পক্ষে যথেষ্ট, বিয়ে করলেও বিশেষ কোন অসুবিধে হতোনা। যত্ন করলে অপর লোকদের মত তারও জীবন বেশ চলে যেতো। যাক্, সে সব চিন্তা সে ক'রলোনা, তার নিকট শহরের মায়াজাল অনেক বড়, অনেক সৌভাগ্যের বলে মনে হলো। জমিজমা বিক্রয় ক'রে কানাই বম্বে চলে এলো। রেলগাড়িতে বড ভয় হ'য়েছিল, ভবিষ্যৎ চিন্তায় মুসড়িয়ে পড়েছিল। শহরের হট্টগোলে ক্লান্ত মন, শঙ্কিত চিত্ত, শ্রান্ত দেহ সজীব হ'য়ে উঠলো, পুলকে শিউরে উঠলো।

—দুই—

কানাই বম্বে এসে প্রথম বড় ঘাবড়িয়ে গিয়েছিল। সে আজন্ম পল্লীবাসী, তার ওপর সঙ্গীসাথীহীন একা যুবক; বম্বের মত এতবড় শহরের কোন হদিশই পায়নি, কোথায় বা এর আদি, কোথায় বা অন্ত; কোথায় বা এর উত্থান, কোথায় বা এর পতন! এত লোক এক স্থানে একই সময়ে, কখনো সে কল্পনা ক'রতে পারেনা! অলিতে গলিতে যেন দেশে গাঁয়ের হাটবাজার সর্ব্বদা লেগে আছে। ট্রামের বাসের ধাক্কা খেয়ে জনতার পেষণে জর্জ্জরিত হ'য়ে অতিকষ্টে, বহু অনুসন্ধানের পর তাদের গাঁয়ের জমিদারের বাড়ির খোঁজ পেয়েছিলো। একমাস ত' শহর দেখতে না দেখতেই ফুরিয়ে গেলো। এটা-সেটা কিনে কিনে, চোর, জোচ্চোর, পকেট-কাটার হাতে পড়ে প্রায় সব টাকা ফুরিয়ে এলো। এখন চাকরি না ক'রলে চলেনা; পরের বাড়িতে কতদিন থাকা যায়। সে ত' গতর খাটাতে শহরে আসেনি, সে হতে চায় চাকুরে। জমিদারবাবুকে হাতে পায় ধরে একটা কাপড়ের মিলে চাকুরি নিলে। দিন-মজুর, বাসস্থান উঠিয়ে নিলে কুলি বস্তিতে।

ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলে নিয়ম কানুনের অধীনে চলা এই প্রথম। স্বাধীনতা নেই, খেয়াল চলে না; কাজকর্ম্মের ওপর আধিপত্যও খাটানো যায় না, নির্দ্দিষ্ট নিয়ম মেনেই চলতে হয়। ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই; এমন কি অসুখ-বিসুখের দোহাই চলে না, কড়ায় গণ্ডায় পাওনা-

খানি হিসেব ক'রে দিয়েই আসতে হবে। তবু ভালো লাগে, নতুনের মোহে দৈবশক্তির প্রেরণা জাগে যেন, ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে যেন নবীন সজীবতা এনে দেয়। দেশে থাকলে সে স্বাধীন থাকতো ঠিক, কিন্তু স্বাধীনতায় কি এতো বড় সম্পদ মিলতো, স্বাধীনতায় কি অর্থ মিলে। দেশবাসী তার যাত্রাপথে বাধা দিতে চেয়েছিলো, কয়েকজন জামাতা ক'রে কঠিন বাঁধনে বাঁধতে চেয়েছিলো। সে মানেনি, ভ্রূক্ষেপ করেনি। শহরকে তার প্রাণ চায়; অতৃপ্ত প্রাণকে, তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয়কে সে বঞ্চিত ক'রতে পারে না। ভগবানের ইচ্ছেই ছিলো যে তার অপূর্ণ জীবন পূর্ণ হোক্, শহরের সুখ-সমৃদ্ধি থেকে সে বঞ্চিত না হোক। পল্লীবাসীরা স্বার্থপর পরশ্রীকাতর, তাই বাধা দিতে চেয়েছিলো। ওদের কুপরামর্শে সে ভুল করেনি বলে আনন্দিত হ'লো। ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানালো। দেশে থেকে ত সে শুকিয়ে মরতে পারে না। হোক না সে চাষীর ছেলে, তাই বলে তাকেও চাষী হ'তে হবে এমন কোন নিয়ম নেই। বংশ-পরম্পরায় অসভ্য বর্ব্বর ছিলো বলে তাকেও পূর্ব্বপুরুষের পথ মেনে চলতে হবে কোন্ যুক্তিতে? মানুষ হবে কাল উপযোগী। যখন যেখানকার তখন সেখানকার, যে অবস্থায় পড়বে সে অবস্থার হবে। এই তো জগতের প্রকৃত রীতি। তবে স্মৃতিকে মুছে ফেলা যায় না। অতীত যে বর্ত্তমানকে ছেড়ে থাকতে পারে না। অতবড় বিরহ (tragedy) সে সহ্য করতে পারে না। স্মৃতিকে ক্ষমতাহীন করা, মূল্যহীন করাই হয় ওর সম্মান দেওয়া, ওর যথার্থ মূল্য দেওয়া।... চাকুরিতে পরাধীনতা ঠিক, দশটি ঘণ্টা কর্ত্তৃপক্ষের যন্ত্র হয়ে থাকতে হয় ঠিক, কিন্তু নগদ মূল্য আছে, কড়ায় ক্রান্তিতে টাকা মিলে। কানাই স্বাধীনতা যে কি অমূল্য জিনিষ বুঝতে পারলো না। মনুষ্যত্বের মত মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ অজ্ঞানতায় বিসর্জ্জন দিলো। মূর্খ যুবক দুনিয়াকে

বুঝলো না। সংসারের চাল চাতুরীর নিকট অতি ছোট শিশুই রয়ে গেলো।

কানাই'র জীবনের প্রথম অধ্যায়ের সংস্কার করা নতুন জীবন চলেছে ভাল। কলের বাঁশি শুনে জেগে ওঠে। প্রথম প্রথম কষ্ট হতো, আলস্য ত্যাগ করা বড় কঠিন হতো। এখন আর হয় না, হ'লেও কর্ত্তব্য-বোধে, সঙ্গীদের জাগরণের সাড়ায় দুর্ব্বলতা সহজেই কাটাতে পারে। দল বেঁধে নির্দ্দিষ্ট সময়ে মিলে যায়, বারোটার সময় ছুটে আসে খেতে, কোন দিন খাবার সঙ্গে নিয়ে যায়, কাজ শেষ করে ছ'টায় মিল থেকে বের হয়। মিলের কাজ যেন বড় কঠোর মনে হয়। যত সহজ ও সুখের মনে করেছিলো তার তুলনায় বহু কঠিন, শক্ত। মিলের কাজের তুলনায় কৃষিকার্য্য যেন অনেক সহজ, সুবিধের। হোক সুবিধের, সহজ কিন্তু কৃষিকার্য্যে ত' টাকাকড়ি পাওয়া যেতো না। টাকা পয়সার কথা তুলে মনকে প্রবোধ দেয়, মন কিন্তু দুর্ব্বল যুক্তি মানতে চায় না। টাকা যেন সাপুড়েদের গাছের শিকড়, সাপের নাকের কাছে ধরলে যেমন সাপ ভয়ে সরে পড়ে, আবার শিকড় সরিয়ে নিলে সাপ মাথা তুলে দাঁড়ায়, তেমনি টাকার রূপ দেখে সত্যি, খাঁটি মনের অভিজ্ঞতা মূল্যহীন, অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে। শহরের ঐশ্বর্য্য, সুখ সমৃদ্ধি যেন মরুমায়া, মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত্তের নিকট মায়া-সরোবর, প্রমত্ত প্রেমিকের নিকট দুর্দ্ধর্ষ সংস্কারাবদ্ধ অসূর্য্যম্পশ্যা রূপসী, শিশুর চাঁদ ধরা। এ ঐশ্বর্য্যের নিকট ঘেঁসা যায় না, অনুভব ক'রে সুখী হওয়া যায় না, নয়ন মুদে আরামে গা এলানো যায় না, শুধু দেখা যায়, আপন পর নির্দ্দেশ করে, অসামঞ্জস্যের বিকৃত অবস্থা বুঝিয়ে দেয়, কল্পনায় তুষানল জ্বালে, তিলে তিলে পুড়িয়ে অঙ্গার ক'রে দিতে থাকে। জলের ভেতর থেকেও যদি জল পান না ক'রতে পারা যায় তবে এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য মানুষের আর

কি থাকতে পারে? কানাই মনে মনে ভাবে এর চেয়ে যেন পল্লীগাঁ ছিলো ঢের ভাল। বাল্যবন্ধুরা ছিলো অনেক ভাল, অনেক আপনার জন। কী দিন ছিলো! যখন যা খেয়াল চাপতো তাই ক'রতো। আম, জাম, পেয়ারা, কাঁকড়ী, খরমুজা, আক, কুল প্রভৃতি দল বেঁধে চুরি করে খাওয়াতে কত আমোদ ছিলো। চুরি করে সব জিনিষ নিয়ে বনে ঢুকতো, গাছের ডালে পুকুরের ধারে বসে নানা কথাবার্ত্তার মাঝে ফেলেছেড়ে খেতো। বড় বড় গাছের ডালে ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করতো, বনের মাঝে লুকোচুরি খেলতো, মাসে অন্ততঃ একদিন গভীর বনে লুকিয়ে বনভোজন ক'রতো। সে দিন কি আর কখনো আস্‌বে? কাউকে না বলে চুপি চুপি জিনিষ পত্তর যোগাড় করা, পাড়াপড়শীর চোখে ধূলো দিয়ে লুকিয়ে বনে পালানো, হল্লা করে বনভোজন করা কত কঠিন ছিলো, অথচ কত সহজ, কত বড় উৎসব ছিলো।

'হোলীর আমোদ!' বলেই কানাই'র মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। ভেবে চল্‌লে—দুর্গাবাঈকে চুপি চুপি কেমন আবীর গোলাতে লাল করে দিয়েছিলো।

দোলের উৎসব! ছেলে মেয়ে, যুবক যুবতী, বুড়ো বুড়ী সব্বাই মদ খেয়ে ঢলাঢলি করছিলো, দীর্ঘ একটি বৎসরের পর তেপান্তরের দুঃখ-দুর্দ্দশাময় মাঠ পেরিয়ে ক্ষণিকের সুখ এসেছে, সব্বাই আমোদে প্রমত্ত—কারো কোন দিকে হুঁস নেই, সে বন্ধুদের এড়িয়ে পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট স্থানে হতাশায় ব্যাকুল, অস্বস্তিময় দুর্গাবাঈকে হঠাৎ পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে লালকে লালময় করে দেয়। চুম্বনে চুম্বনে অগ্নিশিখার মত লাল ও উত্তপ্ত ক'রে দিয়েছিলো। দুর্গাবাঈ তাকে ভালবাসতো বলে বন্ধুদের কত মিষ্টি-ঝরা ঠাট্টা, বিদ্রূপ, কৌতুক, গোপন হিংসা।

সেই বড় গাছটা! মস্ত বড় কদম গাছ, কত মোটা, কত সরু অসংখ্য ডালপালা। এত বড় বনে এই বিকট কদম গাছটা যেন বৃক্ষরাজ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেমনি উঁচু তেমনি চারিদিক বিস্তৃত। প্রাচীন লোকেরা বলেন—এ গাছটা নাকি শ্রীকৃষ্ণের সময়কার। এ গাছটায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা দোল খেতেন। আজো সমস্ত গাছটা কদম ফুলে ভরে যায়, কচি কোমল সবুজ পাতাগুলির ফাঁকে ফাঁকে বের হয়ে থাকে লালের ওপর সাদা শির-তোলা পাপড়ী, কে বলবে যে এগুলো ফুলের রেণু। দূর থেকে মনে হয় যেন শত শত, সহস্র সহস্র ফুলের তোড়া স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে আছে। সমস্ত তোড়া নিয়ে একটি মস্ত বড় তোড়া, এই তোড়ায় ওপর শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকতেন, আর শ্রীকৃষ্ণ বাঁশের বাঁশী বাজিয়ে শ্রীরাধাকে প্রেম-মোহে আচ্ছন্ন ক'রে সুখ-সমুদ্র কল্লোলে ভাসিয়ে দিতেন। সে গাছটায় কেউ কখনো ওঠেনি, সে গাছটার নিকট কেউ একা যেতে সাহস পেতো না। একদিন সে বাজি রেখে দর্পভরে সে গাছটায় উঠেছিলো, শ্রীকৃষ্ণ তাকে ক্ষমা করেননি, দর্প চূর্ণ করে এক ধাক্কায় নীচে ফেলে দেন। যদিও কেউ ওদের প্রত্যক্ষ দেখেনি তবে পূর্ব্বপুরুষরা নাকি দেখেছিলেন। কলিকালে যদিও কেউ শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পায় না, তবে গাছের অবস্থা থেকে বেশ বুঝা যায়, ভগবানের মাহাত্ম্য বেশ উপলব্ধি ক'রতে পারা যায়। ভূত প্রেত ঐ গাছটার চারিদিকে দিনরাত্তির পাহারা দেয়। একদিন সে কি ভয়ই না পেয়েছিলো! সে ভয়ে তার জ্বর হয়, কি ভয়ানক জ্বর, দু'দিন কোন হুঁসই ছিলো না, বাঁচবার কোন আশা ছিলো না।

দুর্গাবাঈ তাকে বাঁচিয়ে তোলে। সত্যিকারের প্রেম না থাকলে কি প্রেমিকরাজের হৃদয় জয় করা যায়? রাধা নিজের প্রতিবিম্ব দিয়েছিলেন দুর্গাবাঈ'র অন্তরে, তাই তিনি প্রেমের আদর্শকে অপমান ক'রতে

ারেননি। দুর্গাবাঈ তাকে ভালবাসতো, গভীর ভাবে ভালবাসতো! নাই'র প্রাণও মোচড় দিয়ে ওঠে, নয়ন জ্বালা করে, টস্‌টস্ করে দু'তিন ফোটা অশ্রুও ঝরে। ক্ষণকালের মধ্যে অস্থির হয়ে পড়ে, নয়ন বিস্তৃত ক'রে পল্লীর পানে তাকায়, যে অতীতকে হেলা ভরে ত্যাগ ক'রেছিলো,— খনো স্মৃতিপটে স্থান দেবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলো, সেই অতীত ানে না তাকিয়ে পারে না, মন আপনি দুর্দ্ধর্ষ গতিতে চলে, নইলে বড় ব্যথা পায়, অস্বস্তি বোধ করে। সেই পল্লী! পল্লী-রমণীরা কলসী কাঁখে সারি সারি চলে যেন যমুনার কূলে যায় অভিসারে। যুবকরা হাঁ করে তাকায়, খেলাধূলোয় মন বসে না। কেউ প্রিয়াকে অলক্ষে; ভ্রূকুটি করে, কেউ মুচকি হাসে, পল্লীবালারা লজ্জায় আরক্ত হয়, মাথা নত করে, কেউ হয়ত' কোন ভ্রূক্ষেপ করে না; বর্ষীয়সী কেউ থাকলে কলিকালের যুবকদের বেহায়াপণার জন্যে বকাবকি করে। প্রমত্ত প্রেমিক দল যুবতীদের শুনিয়ে শুনিয়ে গান ধরে, প্রেমের গান বহু রাগিণীতে বিশ্রী ঐক্যতানের সৃষ্টি করে। ছোট ছেলে-মেয়েরা কেমন ছিঁ-ছিঁ-রিঁ-রিঁ করে ছোটে,—কেবলি ছোটে, যেন কোন হুঁস নেই, ওরা না মানে মাথা-ফাটা রদ্দুর, না মানে শীতবর্ষা; কিছুতেই আর আশা মেটে না। কি দুষ্টু! এই ফুল পাড়লে, মাথায় গুঁজলে, বর-কনে সাজলে, পাকা সংসারীর মত সংসার ক'রলে, যেন সত্যিকারের স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী। মিলে মিশে খেলাধূলো ক'রলে, আবার ঝগড়া বিবাদ ক'রে পাতানো সংসার ভেঙ্গে দিলে। দুষ্টুমি বুদ্ধি মাথায় ঢুকলো; গাছের ডালপালা, ফুল, ফুলের কুঁড়ি ভেঙ্গেচুরে খুব আমোদ ক'রলে। কি ধৈর্য্য, কি সখ! খেলা—কেবল খেলা। ওদের বয়সে সেও তো—কানাই হঠাৎ চমকে ওঠে, অতীত আলিম্পনা ঝাপসা হয়ে যায়।

কানাইকে বন্ধুবান্ধব, পাড়াপড়সী সব্বাই প্রবোধ দেয়, নানা কথা বলে প্রাণ মন সতেজ সজীব ক'রবার চেষ্টা করে। নুতুন নতুন বিদেশে এলে সবারই মন খারাপ হয়, ও কিছু না, দু'দিনে মন ঠিক হয়ে যাবে। এ বয়সে কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে নাড়া-চাড়া ক'রতে হয়, নইলে কি মন ভাল হতে পারে! যৌবনে যুবতী স্ত্রী ঘরে না এলে মন স্বস্তি পাবে কেন; ক্ষেপা তরঙ্গ স্থির হবে কেন? সংসারী হ'লেই সব দুর্ব্বলতা, অস্থিরতা দূর হয়ে যাবে। কানাই মনকে প্রবোধ দেয় যে তার অস্বস্তি, অস্থিরতা, দুর্ব্বলতা দেশত্যাগে নয়, নতুন স্থানে বলে নয় রূপসী যুবতী স্ত্রীর অভাবে শুধু নয়, মনের ক্ষুধা, আকাঙ্ক্ষা মেটাবার জন্যে। উত্থিত হ'তে হলে দেহটা ভারি বোধ হবেই, ভারি বোধ হওয়া স্বাভাবিক। সে তো ছেলেমানুষ নয়, তাকে এখন উঠতে হবে, ঠেকে-ঠুকে উঠবার শক্তি সঞ্চয় ক'রতে হবে। উঠতে হলেই ত' নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে, খামখেয়ালী ছাড়তে হবে।

— তিন —

প্রায় পাঁচ বছরের কথা, কানাই'র বিবাহিত জীবন চলছে। প্রথম বৎসরটি কি করে কাটলো তা কানাই নিজেও টের পায়নি, যুবতী স্ত্রী গঙ্গাবতীও টের পায়নি; হয়তো কখনো টের পেতোনা যদি গঙ্গাবতী সন্তানের জননী না হতো। কানাই হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর যুবক, পল্লীর মুক্ত হাওয়ায় বর্দ্ধিত হয়েছে, তাই তার সর্ব্বাঙ্গ থেকে একটা সহজ, সরল, উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য-দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়।

হঠাৎ শহরে এসেছে, তাই ক্ষুধিত প্রাণে অনন্ত পিপাসার তীব্র জ্বালা। সে পল্লীর যুবক, শহরের মেয়েকে বিয়ে ক'রতে পারা একটু কঠিন ও উঁচু দরের মনে করে। গঙ্গাবতীকে যখন সত্যি সত্যি বিয়ে ক'রতে সক্ষম হলো, তখন নিজেকে ধন্য মনে ক'রেছিল; কৃতজ্ঞতায় উৎফুল্লে গঙ্গাবতীর খেয়ালে নিজকে অতি সহজে অর্পণ ক'রে দিলো। গঙ্গাবতী মনে ক'রতো কানাই অমূল্য রত্ন। পূর্ব্ব জন্মে শিবের মাথায় পূর্ণ ভক্তিতে ফুল বেল পাতা না দিলে এমন স্বামী লাভ করা যায় না। কানাই'র টাকা আছে, প্রাণের প্রসারতা উঁচু দরের, প্রেম অমলিন, অমিত, হৃদয়ে মস্ত বড় ক্ষুধা সদা উন্নতির পথে চালিত করে। গঙ্গাবতী জানেনা হৃদয়ের অত বড় ক্ষুধা কানাই'র মত লোকের পক্ষে মহা ক্ষতিকর; উন্নতির চরম শিখরে না তুলে অধঃপতনের পাতালে হঠাৎ ফেলে দিতে পারে।

পারে বা নেবার মত কিই বা নিতে পারে! একটি নারীর এমন কি সম্পদ থাকতে পারে যাতে সে সেই মধুচক্রের চারধারে গুঞ্জরিয়ে ঘুরতে পারে। বিরক্তি ধরে গেছে, বিতৃষ্ণা হ'য়ে গেছে। এক স্রোতে চলছে, তা'তে না আসে জোয়ার, না হয় উথান-পতনের আলোড়ন; তা'তে আবর্জ্জনায় স্রোতকে বিশ্রী ক'রে তুলছে মাত্র। যদি সন্তান না হ'তো তবে কি হ'তো জানিনে, সন্তানের আগমনকে অত বড় কুরূপ দিয়ে ভাবা বড় কঠিন! হয়তো কানাই কুপথে যেতো, দ্রুত না যাক্ ধীরে ধীরে যেতো। তখন তো গঙ্গাবতীর মন-প্রাণ বিভক্ত হতো না!

কানাই যদিও অশিক্ষিত কলি-যুবক, তবু সে দুনিয়াকে চেনে, দুনিয়ার হালচাল বুঝতে পারে, তার ভাববার শক্তি আছে। সে জানে মানুষের জীবন ক্ষণকালের তরে, কতক্ষণের জীবন তা কেউ বুঝতে পারে না; যদি কাল মরি, তবে কালের আশায় আজকার দিনটা ব্যর্থ ক'রবো কেন? মনের ক্ষুধা যেদিকে চালানো যায়, ঠিক সেই দিকেই চলবে। সে চলার মাঝে ভালমন্দ দুই হ'তে পারে, কিন্তু ফলটা ত' ভবিষ্যতের হাতে। কানাই মনকে বুঝায়, বিবেককে কষাঘাত করে, ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতে হবে, অতএব বর্ত্তমান হোক দুর্দ্ধর্ষ, দুর্জ্জয়, অপ্রতিহত। সে নিজের সুখ-সুবিধে খুব বড় ক'রে দেখে, নিজের স্বার্থ সর্ব্বত্র বজায় রাখে, মনে যা জাগে তাই করে। জীবনে টাকার আরাধনা ক'রে এসেছে, চিরজীবন টাকার আরাধনা ক'রবেও। বন্ধুবান্ধব ভিন্ন দিন চলে না, মদ খেয়ে মাতাল না হ'তে পারলে চলে না। সুখ পেতে হ'লে প্রচুর পরিমাণ টাকা চাই। হাতের টাকা বহুদিন হলো ফুরিয়ে গেছে। সংসারের খরচ চালানোই কঠিন। দিন দিন সংসারের খরচ কেবল বেড়েই চলেছে। সর্দ্দার মারা গেছে, এখন তাকে সংসারের সকল খরচ চালাতে হয়। সে একা কত টাকা রোজগার ক'রতে পারে যাতে সংসার-খরচ চলবে, এবং

তার আমোদ আহ্লাদও চলতে পারে? গঙ্গাবতী ত' পরের টাকায় সংসার চালাচ্ছে চোখ বুজে এবং ছেলেপিলে নিয়ে বেশ মজা ক'রে সময় কাটাচ্ছে, কিন্তু তার উপায় কি? বছরে একটি ক'রে সন্তান হচ্ছে এখন উপায়? সে এসেছে দু'দিন ভোগ ক'রতে, উৎসব ক'রতে, জীবন-মদিরা পান ক'রতে। এখন সে সংসার প্রতিপালন ক'রবে, না বন্ধুদের নিয়ে কুপল্লীতে মজলিস ক'রবে?

সংসার যে আর চলে না। না চলে নাই চলুক, তার কি? তেলজল কি কখনো মিশে? আলোড়নে ক্ষণকালের জন্য মিশতে পারে, কিন্তু উত্তাপে তেলের ও জলের বৈসদৃশ্য সম্পর্ক বের হ'য়ে পড়ে। পরস্পরের কি দরদ থাকতে পারে? না থাকাই স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়। কানাই নিজে রোজগার করে নিজের জন্যে। স্ত্রী পুত্রকন্যা একগোষ্ঠী লোকের জন্যে ত' সে জীবনটা মরুভূমি ক'রতে পারে না, নিজের ব্যক্তিত্ব ত' ত্যাগ ক'রতে পারে না, প্রাণের আকাঙ্ক্ষাকে ত' হত্যা ক'রতে পারে না। অতগুলি সন্তান হলো কি তার দোষে না তার ইচ্ছায়? সে চায় কামনার পরিতৃপ্তি, কিন্তু তার ফল ত' সে চায় না। সে যদি গঙ্গাবতীকে বিয়ে না ক'রতো তবে কি অতগুলি সন্তানের জন্য সে দায়ী হতো? কানাই চায় ব্যবসায়ী নারীদেহ, সে চায় না প্রেমের গভীরতার মাঝে দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের দেহের মিলন; সে চায় না কোন পক্ষের অধিকার তার কামনা পূরণের পরিণামে। ভাবে, রাগে তার হাড় জ্বলে, ঘরের পানে তাকা'লে অস্বস্তি বোধ করে। ছেলেপিলেগুলির যেমনি চেহারা, তেমনি সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার খাই খাই স্বভাব, যেন দুর্ভিক্ষের কতকগুলি কীট। ছেলেপিলের কথা মনে হ'তেই তার রাগে গা জ্বলে। ছেলেপিলেগুলি উড়ে এসে পড়ে খাচ্ছে, খেয়ে খেয়ে সব ফতুর ক'রে দিলো। কার ধন কে খায়? না! সে এত বড় অত্যাচার সহ্য ক'রবে না। কি সম্পর্ক

তার এদের সঙ্গে? তার ক্ষতিই বা কি? সন্তান হচ্ছে, প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী হ'তেই হবে। হচ্ছে, হোকনা। সে শুধু জন্মদাতা, আর তো কোন সম্পর্ক নেই। যে দশমাস পেটে কীটগুলি সাদরে ধারণ করে, তারপর দারিদ্র্যের উপাদানগুলিকে দীর্ঘজীবন ললাটে লিখে দিয়ে দুনিয়ার বুকে অভিনন্দন দিয়ে নিয়ে আসে, সেই তাদের হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কানাই'র কি মাথা-ব্যথা পড়েছে! তার একটুকুও দরদ নেই, স্নেহ, ভালবাসা, রক্তের আকর্ষণ একটুকুও অনুভব ক'রতে পারেনা। ঘরের সঙ্গে সম্পর্কই বা কতটুকু! সারাদিন ত' হাড়খাটুনি মিলের কাজ, তারপর মজলিস। যেদিন টাকাকড়ি থাকে সেদিন ত' ঘরের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই, মিলের ছুটির পর সুরা ও নারী। যে কয়েকদিন নিতান্ত টাকা থাকে না, সে কয়েকদিন তার অহিফেনের মজলিস হয় রাত্তির প্রায় দু'টো পর্য্যন্ত। রাত্তিরে ঘুমোবার জন্যে ও তৈরি খাবার পাবার জন্যেই তো ঘরে আসা, বউ রাখা, সংসার করা। মাথা গুঁজবার ঠাঁই কি এ শহরে মিলে! মাথা-পিছু ছ'ফিট স্থান; নিজেরই ভাল ক'রে ঠাঁই হয়না, অপরকে দেবে কি ক'রে?

নিত্যি কুপল্লীতে থাকার ঠাঁই হয় না, বন্ধুদের বাড়িতে রাত কাটানো যায় না, সরকারী বাগানে পুলিসের অত্যাচারে টেঁকবার উপায় নেই। যদি অপর কোথাও ঠাঁই মিলতো তবে সে মরতেও বাড়ি আসতো না। খাবার ও শোবার জন্যেই ত' বাড়ি আসা, তাও রোজ আসা হয় না। এমনি বদমাইস ছেলেপিলে যে একদণ্ড স্বস্তি দেয় না। একটু বিশ্রাম ক'রবার জন্যে বাড়ি আসা তা যে ওদের কত পুণ্যির জোর তা স্বীকার করে না, এমনি বদমাইস! যেমনি মা, তেমনি তার সন্তান! 'এটা দাও!' 'ওটা চাই!' 'বাবা! তুমি রোজ আস না কেন? মা বড্ড কাঁদে!' - 'তুমি বড্ড দুষ্টু! মার সঙ্গে কেবল ঝগড়া ক'র কেন?'

আব্দার কি! গা জ্বলে যায়! এক মুহূর্ত্ত কি টেঁকবার উপায় আছে? কি দরদ! এ গোষ্ঠী মরলেই ভাল। লখিয়া (বেশ্যা) কিংবা লছমী (বন্ধুর বোন, গুপ্ত চরিত্রহীনা নারী) এক জনকে ঘরে এনে সুখের সংসার পাতানো যাবে। কেউ কারো ধার ধারবে না, শুধু রাত্রির অভিসার। কি সুবিধেই হ'বে, কত খরচ তার কমবে! ধাড়ী মাগী মরেও না, সহজে পথেও আসে না! বন্ধুবান্ধব আসতে চায়, দু' চারটা আলাপ-সালাপ ক'রতে চায়, আর ত' কিছু নয়। কেউ আলাপ-সালাপ ক'রলেই কি সতীত্ব নষ্ট হয়ে যায়? দু'টি মিষ্টি কথায় তার মদ খাওয়ার খরচ বাঁচে, কিছু অর্থেরও সুবিধে হ'তে পারে। এতে এমন কি দোষ? দু'টি কথাতেই দোষ, আর প্রায় ঘরে ঘরে যে সুন্দরী মেয়েরা গোপনে অর্থ রোজগার করে! সে ত' কত বন্ধুর বাড়ি গিয়ে আমোদ আহ্লাদ করে, বন্ধুরাই চালাকি ক'রে মিলনের পথ পরিষ্কার ক'রে দেয়। দেবেই না কেন? গরিব লোক কি না খেয়ে মরবে? বাইরেও সতী রয়ে গেলো, অর্থকষ্টেও মরতে হলো না। গঙ্গাবতী দুনিয়ার হালচাল সব জানে ও বুঝে। এমনি বজ্জাত মাগী যে কোথায় কোন ফাঁকে ধরা পড়ে যায় তারি ভয়ে সে কারো ছায়া মাড়ায় না। দিন রাত আছে ছেলেমেয়ে ও সংসার নিয়ে। যৌবনক্ষুধার চঞ্চলতা পর্য্যন্ত নেই। কি চতুর মেয়ে! ছেলেমেয়েদের আবদারে অতিষ্ঠ হ'য়ে কিছু বল্‌লে গঙ্গাবতী আড়ালে দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করে? তেজ আছে! চার ছেলের মা হলো তবু সোহাগ যায়না! ঢঙ্ ক'রে কথা বলা হয় না, মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর ক'রে ছেলেমেয়েদের জড়িয়ে পৃথক বিছানায় শুয়ে থাকে। এসব ঢঙে কি কানাই ভুলে? তার সতীত্ব বজায় রাখতে হয় না, যাদের সতীপণার বড়াই আছে ওরা আপনি এসে পায়ে ধরে সাধাসাধি ক'রবে। তার যত দিন অর্থশক্তি আছে ততদিন নারীদেহের অভাব হবে না।

নেহাত খাওয়া-পরার ও ঘুমোবার অভাব, নইলে এক লাথি মেরে চলে যেতো! কানাই বিশ্রী মুখভঙ্গী করে, বিড় বিড় ক'রে বকে এবং সত্যি সত্যি জোরে লাথি মারে মেঝেয়। আপন রোষে এক মনে স্ত্রী পুত্রকন্যার মাথা চটকাতে আরম্ভ করে।

কানাই প্রায় দিনই মাতাল হয়ে পথে-ঘাটে পড়ে থাকে; পুলিসের রুলের গুঁতো খেয়ে টলতে টলতে বাড়ি ফেরে। বমি ক'রে ঘর-দোর নোংরা করে, বিশ্রী রকম মাতলামি করে। কোন কোন রাত মাঠে-ঘাটেই পড়ে থাকে, শেষ রাত্তিরে বাড়ি এসে হৈ চৈ বাধিয়ে দেয়। স্ত্রীপুত্রকন্যাকে হিঁচড়ে ঘুম থেকে জাগায়। সারা রাত্তির জেগে থাকেনি বলে স্ত্রীকে ঘুসি চড় মারে। মাতালের ক্ষণী-রক্ত চক্ষু দেখে কেউ কোন প্রতিবাদ করে না, ভয়ে জড়-সড় হয়ে চুপ ক'রে অত্যাচার সহ্য করে। ভীতার্ত্ত ছেলে-মেয়েরা আকস্মিক ভয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে থেমে যায়, ভয়ে জননীর কোলে আত্মগোপন করে। কোলের শিশু বুঝেনা, ভয়ে খুব চেঁচাতে আরম্ভ করে, কানাই'র কিল থাপ্পড়ে আরো বেশি চেঁচিয়ে কান্না জুড়ে দেয়। কানাই চরিত্র খুইয়ে দ্রুত অধঃপতনের নিম্ন স্তরে নামতে লাগলো। সে শুধু চরিত্রহীন মাতাল নয়, অত্যাচারী, পাষণ্ড।

—চার—

রজতের মা শয্যাগত কাতর !

রজত কবি, ঔপন্যাসিক। সাহিত্যিক বলেই সে গরিব ! সংসারে তার কেউ নেই, কালের পর্দ্দায় ধূলার মত জড়িয়ে আছেন তার বৃদ্ধা মাতা ! সংসারে আপন বলতে শুধু তার বৃদ্ধা মাতা ; কথাটা ভাবতেও শরীর শিউরে ওঠে ! জ্ঞান হওয়া অবধি জানে শুধু স্নেহময়ী মাকে ! দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই ক'রে কী অপূর্ব্ব কৌশলে তিনি তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন ! তার বাবা টাকাকড়ি রেখে যেতে পারেননি, জমিজমাও বিশেষ ছিল না—কী ক'রে যে তিনি স্কুল-কলেজের পড়ার খরচ চালিয়ে সংসার সচল রেখেছিলেন—তার আশ্চর্য্যময় কৌশলটা বহু গবেষণায়ও রজতের নিকট আলোকপাত করে না।

রজত নিশ্চিন্তমনে বি-এ অবধি পড়েচে, ক'লকাতায় সিনেমা, থিয়েটার দেখেচে, বন্ধুবান্ধবীদের নিয়ে রেঁস্তরায় খেয়েচে, কোন দিন টাকার জন্যে ভাবতে হয়নি। বি-এ পাশ ক'রতে পারলে না, বাড়িতে বসলে, চাকরির চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ক'রলে সাহিত্য-সেবা ! বেশ যাচ্ছিল দিন ! হঠাৎ একদিন মাথায় যেন বাজ পড়লো ! মা গোড়াশূন্য তমাল-তরুর মত একদিন সামান্য বাত্যাঘাতে উচ্চ, দুর্ব্বিনীত শিরে লুটিয়ে পড়লেন। মাতার এত বড় অপমান রজতের বক্ষে শেল সম বিঁধেছিল। মাতার মৃত্যু বাঞ্ছনীয়, বিদ্রোহ বরণীয়, কিন্তু অসহায়তা, অনুনয়, দীনতা

তাকে যে রূপেই বিকাশ ক'রতে যাওয়া যাকনা অপরের নিকট অন্ধকার, জড়—যেমনটি ছিল তেমনটি অপরের নিকট হ'তে পারে না!…

মা তার শয্যাগত কাতর! মা বাঁচতে চান, মরণের প্রতি তাঁর বিভীষিকা নেই, কিন্তু বাঁচার প্রতি অসীম প্রয়াস! কাজ তার সমাপন হয়নি! তাই তিনি পুত্রের হাত ধরে অনুনয়, বিনয় ক'রচেন—তাকে বাঁচাতে হবে! তাকে বাঁচতেই হবে—দুঃখের জীবন ছেড়ে দিয়ে তিনি অক্ষয় স্বর্গে গিয়ে বাস ক'রতে চান না! কাশীর প্রতি হিন্দু রমণীদের একটা মস্ত বড় আকর্ষণ। কাশীবাসের মস্ত বড় সুযোগ পেয়েও তিনি যাননি—কাশীবাসের আহ্বানকে উপেক্ষা ক'রে তার পাপ বেড়েচে সত্যি কিন্তু তিনি যেতে পারেননি—তার কারণ তো শুধু রজত! রজত কাশীর চেয়ে বড়!…

রজত কি ক'রবে?—টাকা চাই, টাকা, টাকা, টাকা! অতদিন কোথা থেকে টাকা আসতো? টাকার গাছ কি জননীর অসুখের সঙ্গে সঙ্গে মরে গেলো! মরে গেলে চলবে কেন? জননীকে তার বাঁচাতে হবে? ডাক্তার চাই, ওষুধ চাই, পথ্য চাই, চাই টাকা—টাকা, টাকা, টাকা!

তিন বছর যাবৎ সে বড় বড় পত্রিকায় লিখচে—কোন কাগজ থেকে সে টাকা পায়নি কারণ সে লজ্জা ভেঙ্গে টাকা চাইতে পারে না! না চাইলে যে কোন পত্রিকাও'লারা সেধে টাকা দিয়ে যায় না, তা সে জানে! টাকার জন্যে অনুগ্রহ চাইতে তার সব চেয়ে বাধা, সে পারেনা, মন চায় কিন্তু কইতে পারে না! ভারতী পত্রিকায় সে তিন বছর যাবৎ লিখচে—এ পর্য্যন্ত একটি পয়সা পায়নি! ভারতী পত্রিকায় গত বছর তার একখানা উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হ'য়েছিল, কর্ত্তৃপক্ষ উপন্যাসটীর জন্য একটি পয়সা দেননি, অথচ ভারতী পত্রিকা

মাসে দেড় হাজার টাকার ওপর লাভ করে! 'ভারতী' পুস্তক-প্রকাশক কার্য্যালয়ে রজত তার উপন্যাসখানি প্রকাশ ক'রবার জন্যে বহু অনুরোধ ক'রেচে, কর্ত্তৃপক্ষ প্রথম সংস্করণ কিনে নিতে রাজি হয়নি। এদের ছাপাখানা আছে; মাইনে করা প্রিন্টার, প্রুফ্ রিডার, বুক বাইণ্ডার এবং এদের ব্লক তৈরি ক'রবার লোক আছে। ভারতীর কর্ত্তৃপক্ষ নতুন লেখকের বই ভাল হলেও কিনে নেননা কারণ নতুন লেখকেরা নাম ও ভাল পুস্তক-প্রকাশক পাবে বলে নিজের খরচে ভারতী পুস্তক-প্রকাশকদের সোল এজেন্সী দেয়।···

রজত মা'র অসুখে রীতিমত সীরিয়াস হয়ে যায়; বুঝতে পারে যে টাকাটাই আসল, সাহিত্য, নাম, যশ গৌণ! সপ্তাহখানেক আগে ভারতীতে একখানা বড় গল্প দিয়ে এসেছিল, সম্পাদককে বলে এসেছিল যে গল্পটার জন্যে পারিশ্রমিক নেবে! টাকার খুব প্রয়োজন, মতামত তাড়াতাড়ি চায়।

—মা'র অবস্থা খুব খারাপ দাঁড়িয়েছে, বড় ডাক্তার দেখানো উচিত! দু'টি টাকা হাতে নেই যে ভিজিট দিয়ে ডাক্তার আনতে পারে! তারপর ওষুধ পত্তর আছে! মা'র অবস্থা যত সঙ্গীন হয় ততই ভয় বাড়ে, টাকার রিক্ততায় মাথা যায় গুলিয়ে! ধার মিলেনা—কী ক'রতে পারে সে? অতদিন সখের সাহিত্য চর্চ্চা ক'রেচে, কত গল্প উপন্যাস লিখেচে—এত শ্রম ক'রে যে লিখলো, বিপদে যদি একটু না সাহায্য ক'রলো তবে এসব লিখে লাভ? মানসিক শ্রমের মূল্য কি?

পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে, চাদরখানি কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়লে! বারাকপুর থেকে ক'লকাতা আর কতদূর! ভারতী পত্রিকা থেকে যদি অগ্রিম টাকা আনতে পারে তবে একজন ভাল ডাক্তার দেখাতে পারবে!

সম্পাদক অফিসে নেই, সহ-সম্পাদক রজতকে গল্পখানি ফিরিয়ে দিলেন। রজত অবাক হ'য়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে পাণ্ডুলিপিখানির প্রতি তাকিয়ে রইলো! ভারতী পত্রিকায় তার গল্প অমনোনীত হলো! কত আশা ক'রে এসেছিল অগ্রিম টাকা নেবে, সেই টাকাতে ভাল ডাক্তার আনিয়ে মা'কে চিকিৎসা করাবে! ব্যস্, সব প্ল্যান্ খতম!

কোন ভাবে জিজ্ঞেস ক'রলে—গল্পখানি কে অমনোনীত ক'রলেন?

'সম্পাদক দেখে প্রোপ্রাইটরের নিকট পাঠিয়েছিলেন টাকা মঞ্জুর (sanction) করাতে, প্রোপ্রাইটর রাজি হননি।'

'সিতাংশু বাবু অমনোনীত ক'রেছেন তো?'

'হাঁ!'

'তিনি দোকানদার, সাহিত্যের মর্ম্ম কি বুঝেন এবং তার জ্ঞানই বা কতটুকু!'

'কি করবো মশাই পরের চাকরি করি, ওদের খুশি মত চলতেই হয়! বহু ভাল ভাল লেখা টাকার অভাবে আমাদের ফেরত দিতে হয়!'

'বেশ আছেন আপনারা! আপনারা নামে সম্পাদক আসলে ওরাই হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা! আপনাদের শিখণ্ডী রূপ দাঁড়া করিয়ে ওরা বেশ সাহিত্যিকদের exploit ক'রচে! আপনাদের ক্ষমতা শুধু যারা বিনা পারিশ্রমিকে লিখবে অর্থাৎ যারা নতুন লেখক, বড়লোক, প্রফেসর ও পণ্ডিত ওদের রচনা মনোনীত বা অমনোনীত করা! ব্যবসা চালিয়েছে মন্দ নয়। যারা টাকা নেবেনা ওদের লেখা দিয়ে কাগজ ভর্ত্তি থাকবে এবং মধ্যে মধ্যে দশ পনেরো টাকা খরচ ক'রে নাম করা লেখকের দু' একটা গল্প নেওয়া হবে। আপনাদের কাগজে যে এত লোক লেখেন কা'কে আপনারা টাকা দিয়ে থাকেন? ভাল গল্প-লেখকদের ক'টা

গল্প বছরে আপনারা ছাপেন? আপনাকে বলে লাভ নেই, চল্‌লাম আমি সিতাংশু বাবুর কাছে, আজ আমি ছেড়ে কথা কইবো না!

রজত গল্পের পাণ্ডুলিপিখানি নিয়ে হন্ হন্ করে প্রোপ্রাইটরের নিকট এসে একটা নমস্কার ক'রে সশব্দে চেয়ার টেনে বসে বল্‌লে—দেখুন। আপনাদের ভারতী কাগজে আমি তিন বছর যাবৎ লিখচি। একটা উপন্যাস লিখেচি, বহু গল্প; কবিতা লিখেচি। এই তিন বছরে আমার গল্প ও উপন্যাসের জন্যে আপনারা আমার পারিশ্রমিক দেননি। অবিশ্যি সেজন্যে আমি কোন দিন কোন কথা তুলিনি। এই গল্পখানি আমি ভারতী কাগজের জন্যে দিয়ে গিয়েছিলাম, দেবার সময় বলেছিলাম যে পারিশ্রমিক নেবো। শুনলাম আপনি নাকি অমনোনীত ক'রেছেন?

সিতাংশু বাবু গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে মিথ্যাকে সত্যের রূপ দিয়ে বল্‌লেন 'সম্পাদক অমনোনীত ক'রেছেন।'

'সম্পাদক অমনোনীত ক'রেছেন!' রজত এত বড় মিথ্যা কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গেলো।

'তাঁর পছন্দ হয়নি বলে অমনোনীত ক'রেছেন।'

'Strange! তিন বছর ধরে আমার গল্প অমনোনীত হলো না, আর টাকা চেয়েছিলাম বলে কি প্রথম অমনোনীত করা হলো? সম্পাদক আজ নেই নতুবা জিজ্ঞেস ক'রতাম কোন অজুহাতে তিনি আমার গল্প অমনোনীত ক'রেছেন! ভারতী পত্রিকায় এর চেয়ে বহু নিম্ন স্তরের গল্প প্রকাশ ক'রেচি, প্রেম সংক্রান্ত বহু গল্প লিখেচি—যার মনস্তত্ব ও রূপ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে বদলাচ্ছে, কিন্তু যে গল্পখানি অমনোনীত ক'রেছেন তা শাশ্বত, চিরন্তনী! আজ আমার জীবনের ওপর দিয়ে যা বয়ে গেলো, তা আমি হৃদয় দিয়ে অনুভব ক'রেচি, যার পীড়ন আমার ওপর দাগ কেটে গেচে, তা সত্য যেমন হ্যুট হ্যামসুনের 'হাঙ্গার' চিরন্তনী।

যাক সে কথা, আপনাদের কাগজ, আপনারা যা খুশি ক'রতে পারেন। যতদিন বিনা পারিশ্রমিকে লিখেছি ততদিন সাদরে লেখা প্রকাশ ক'রেচেন, যেমনি টাকা চাইলাম অমনি অমনোনীত হ'তে লাগলো। এই কারণেই ভাল গল্প লেখকদের লেখা আপনাদের কাগজে পাই না। আমার উপন্যাসের জন্যে অতদিন টাকা চাইনি, আমার প্রয়োজন পড়েচে। উপন্যাসটার জন্যে আজ আপনাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে।'

'উপন্যাসের জন্যে পারিশ্রমিক দিতে হবে অমন কোন কথা ত' ছিল না! নতুন লেখকদের লেখা আমরা অমনি ছাপি!'

'আপনারা আমাদের লেখা ছাপিয়ে ব্যবসা ক'রবেন, লেখকদের পারিশ্রমিক কেন দেবেন না?

'আপনার লেখা টাকা দিয়ে কিনে নেবার উপযুক্ত নয়! নতুনদের আমরা পারিশ্রমিক দিইনে, ভারতীর লেখক হওয়াই ভাগ্যের কথা। বহু প্রতিভাশালী লেখক আমাদের কাগজে বিনা পারিশ্রমিকে রচনা ছাপাতে পারলে কৃতার্থ হন!'

'এই মস্ত বড় সুযোগ পেয়েই আপনারা আমাদের মহা ক্ষতি ক'রতে পেরেছেন! বাংলাদেশে ভারতীর চেয়ে বড় পত্রিকা আছে, যদিও সে কাগজটা একটা সম্প্রদায়ের তথাপি এক বিষয়ে ওরা অনেক ভাল, যে উৎকৃষ্ট রচনা পেলে ওরা ছাপে এবং পৃষ্ঠা হিসেবে পারিশ্রমিক দেয়—ওরা লেখকের নাম দেখে বিচার করে না! আপনাদের পত্রিকায় আমার মস্ত বড় একখানা উপন্যাস ছাপলেন, আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই যে কি ক'রে আপনারা টাকার ব্যাপারে এমনি কথা কইতে পারলেন! আপনি সাহিত্যিক নন, উপন্যাস লেখা যে কত ধৈর্য্যের, কত শ্রমের, কত যত্নের ব্যাপার তা বুঝতে পারবেন না। আপনি অসাহিত্যিক, businessman বলেই চট ক'রে না বলতে পারলেন। তা যাক্—

আমার কথা হ'লো—আমার উপন্যাসখানি আপনারা এক বছর ধরে প্রকাশ ক'রলেন, কেন প্রকাশ ক'রেছেন—নিশ্চয়ই সম্পাদকের ভাল লেগেচে, ভারতীর মত বড় পত্রিকায় যখন ছাপা হ'য়েছে তবে বলবো যে বইখানি তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস হয়নি! আপনারা পত্রিকার ব্যবসা ক'রে মাসে এক হাজার থেকে প্রায় দু' হাজার টাকা রোজগার করেন তবে কেন আমার পারিশ্রমিক দেবেন না? ভারতীর প্রিণ্টার, প্রুফ-রিডার, কেরাণী, দপ্তরিরা মাইনে পাবে, এমন কি রাস্তার হকাররা কমিশন পাবে, তবে লেখকরা কেন টাকা পাবে না? আমরা লেখি বলেই পাঠক পড়েন এবং পাঠক পড়েন বলেই বিজ্ঞাপন পেয়ে থাকেন। পত্রিকার জীবন হ'লো লেখক, এ কথা অস্বীকার করা চলে না! যারই রচনা ছাপা হোকনা; সে খ্যাত কি অখ্যাত, তা আমরা বিচার করবো না যখন আমরা দেখবো যে তার রচনা পত্রিকায় স্থান পেয়েচে! রচনা প্রকাশ পেলেই বলবো যে রচনার literary value একটু হ'লেও আছে! যেহেতু ভারতী পত্রিকা প্রথম শ্রেণীর, আপনারা স্বীকার ক'রতে বাধ্য যে ভারতীতে প্রকাশিত রচনার literary value আছে, তবে কেন পারিশ্রমিক দেবেন না?'

'আপনি শুধু নিজের দিকটাই দেখচেন। বাইরে থেকে বুঝতে পারেন না পত্রিকার অবস্থা কেমন! সেদিন আর নেই, এখন পত্রিকা চালানো মানে, ক্ষতি। প্রেসটা আছে বলে কোন ভাবে চলে যায়!

'একথা অপর লোককে বল্‌বেন! ভারতীর ভেতরের খবর আমি ভাল ক'রেই জানি! যে সব কাগজ stand ক'রে গেচে ওরা at ease লেখকদের টাকা দিতে পারেন!'

'টাকা দিয়েই যদি সব লেখা নিই তবে আপনাদের লেখা কেন নেবো?'

'আমাদের লেখা যদি না নেন তবে জোর প্রতিযোগিতা হবে তাতে লেখার standard ক্রমশঃ বাড়বে! Exploitation কমবে!'

'আমরা exploit করি? আমরা যদি আপনাদের রচনা না ছেপে শুধু বিখ্যাত লেখকদের রচনা নিই তবে আপনাদের স্থান কোথায় পড়ে থাকবে? আমরাই তো আপনাদের তৈরি করি। আমরা প্রথমে লেখক তৈরি করি তার পর আপনাদের নিকট থেকে লেখা চেয়ে আনি উপযুক্ত পারিশ্রমিকে! আপনাদের দু'টো দিকই বিবেচনা করা উচিত!'

'বিখ্যাত লেখকরা চিরদিন বাঁচবেন না, ওদের স্থান নতুনকেই পূরণ করতে হবে। নামের মোহে যদি ওদের খারাপ লেখা সর্ব্বদা ছাপেন তবে বিচারে পত্রিকার স্থান নিম্নেই পড়বে। অসুবিধে কি—জানেন? নামের মোহে আমরা আপনাদের অনুরোধ করি, আপনারা এই সুযোগে করেন ব্যবসা! আমরা যখন নাম করি তখন আপনারা আমাদের লেখা চেয়ে নেননা কারণ আমরা টাকা ছাড়া দেবো না! আমরা যে স্থান খালি ক'রে আসি তা নতুনের দল পূরণ করে। অভাবে পড়ে বড় বড় লেখকরা আপনাদের কাগজে লেখা পাঠান, আপনারা কম মূল্যে তা কিনে নেন, যাদের self-respect জ্ঞান আছে ওরা লেখা ছেড়ে বসে থাকে! আপনারা তৈরি করেন সত্য তবে ওদের অকালে হত্যাও করেন! যতদিন লেখক বিনা পারিশ্রমিকে লেখে ততদিন আপনারা ওকে পরিচিত করেন এবং যেমনি পারিশ্রমিক চাইতে বাধ্য হয় অমনি ওর রচনা অমনোনীত করেন। যারা নাছোড়বান্দা ওরা আবার লেখা পাঠায়। লেখকরা গরিব, সংসারের গুরুভারে মনুষ্যত্ব হীন হয়, তাই আপনারা টাকার প্রভাবে ওদের পুতুল নাচ নাচান! আপনারা যাদের তৈরি করেন ব'ল্‌লেন, ওদের কি পরিণতি হয় জানেন—কেউ লেখা ছেড়ে চাকুরে হয়, কেউ হয় ভ্যাগাবণ্ড; অল্প সংখ্যক হয় পেশাদার তৃতীয় শ্রেণীর লেখক!

সত্যিকারের লেখক শতকরা একটি বেরোয় কিনা সন্দেহ! আমার মা অসুস্থ, আপনার সঙ্গে তর্ক ক'রলে চলবে না, আমাকে আজ টাকা যোগাড় ক'রতেই হবে!

সিতাংশুবাবু নিজের কাজে মন দিলেন! রজত দাঁড়িয়ে বল্‌লে— ছোট ছোট কাগজেও গিয়েছিলাম, ওদের অবস্থা বুঝতে পারি তা'ই টাকা চাইনি। একটা কাগজে গল্পের জন্যে কিছু দিলে কারণ তা'রা জানে যে আমার বিপদে সাহায্য না ক'রলে আমি আর কখনো ওদের কাগজে লিখবো না! আপনি আমাকে একটি পয়সাও দিলেন না কারণ আপনার পত্রিকা stand ক'রে গেচে, আমি লিখি বা না লিখি তাতে ভারতীর কিছু আসে যায় না, আমার মত বহু লেখক আপনার দুয়ারে আসবে! তবে এটুকু বলতে চাই যে নাম করা সাহিত্যিককে শিখণ্ডী-তুল্য সম্পাদক রেখে যে ব্যবসা চালিয়েছেন তা এ সাম্যের যুগে বেশি দিন টি ঁকবে না!'

রজত হন্‌ হন্‌ ক'রে বেরিয়ে গেলো কথার বাণগুলি সিতাংশুবাবুর ক্রুর, অপমানিত মুখে ছুড়ে দিয়ে!

রাস্তায় এসে রজতের চৈতন্য হলো! মা মরণ শয্যায়, তা'কে টাকা যোগাড় ক'রতেই হবে! কোথায় পাবে টাকা! এমনি দুরবস্থায় রাগারাগি করা উচিত হয়নি! অনুনয় বিনয় ক'রে যদি দুরবস্থা জানাতো তবে নিশ্চয়ই কিছু টাকা পেতো! মনটা তার ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠলো! ফিরে যাবে নাকি? হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালো! ···না সে পারবে না ফিরে যেতে। যারা এমনি বিপদে ন্যায্য টাকা দেয়না ওদের নিকট সে ফিরে যেতে পারবে না, বরঞ্চ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে ক'রবে!

এই তার প্রথম প্রয়োজন, প্রথম প্রয়োজনেই এমনি অবস্থা, আর যাদের এমনি প্রয়োজন দৈনন্দিন ওদের অবস্থা কেমন? ভাবলে সে—

যদি তার ক্ষমতা থাকতো তবে দেখে নিতো এদেরকে, যদি তার টাকা থাকতো নিজে পত্রিকা খুলতো, পুস্তক প্রকাশক হতো এবং এই ব্যবসায়ী সাহিত্যিকদের কবল থেকে দরিদ্র সাহিত্যকদের রক্ষা ক'রতো! পত্রিকার দুরবস্থার কথা জানে, সে বুঝতে পারে পুস্তক-প্রকাশকদের অসুবিধের কথা, কিন্তু যে পত্রিকা মোটা হাতে লাভ করে ওরা কেন লাভের অংশ কমিয়ে লেখকদের টাকা দেবে না, পুস্তক-প্রকাশকরা কেন বাজার মন্দা অজুহাতে লেখকদের সর্ব্বনাশ ক'রবে! ◦ ◦ ◦

রজত হাঁটতে হাঁটতে তাপসীদের বাড়ির নিকট পৌঁছল! তাপসীরা খুব বড় লোক না, কিন্তু গরিব নয়! তাপসীর নিকট ধার চাইলে কেমন হয়? কথাটা মনে ভাবতেও আত্মসম্মানে বাঁধে! পত্রিকায় গল্প উপন্যাস লিখে কোন দিন টাকা চাইতে পারেনি, প্রয়োজনে কখনো যদি ভেবেচে যে আজ চোখ বুজে চেয়ে বসবে তবে অস্বস্তির সীমা থাকতো না। বলি বলি ক'রেও না বলে সরে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে! আজ তাপসীর নিকট টাকা চাইবে! যার সঙ্গে বিয়ে ঠিক, যাকে সে এক বছর যাবত ভালবেসে এসেচে, যাকে সে থিয়েটার, সিনেমায়, খেলায় নিয়ে গেচে, যাকে সে বহুবার মূল্যবান সামগ্রী উপহার দিয়েচে তা'র নিকট টাকা চাইবে! আর যা করা চলে, চলেনা শুধু অভাবে প্রণয়ীর নিকট টাকা ধার করা, প্রণয়ীর নিকট পৌরুষ বজায় রাখতেই হয়!

তাপসী! তাপসী তাকে কত ভালবাসে, তাপসী তার জন্যে প্রাণ দিতে পারে। তাপসী কত সুন্দর, কত মধুর, কত ভাল, কি তার চেহারা, কি তার স্বভাবচরিত্র, কি মিষ্ট তার কথা, গান; তার কবিত্বময় জীবন তাপসীর আগমনে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে! একটি বছরের মাত্র পরিচয় অথচ মনে হয় কত যুগ যুগান্তরের বন্ধু এরা। স্ত্রী বা স্বামী অনেকই হয়, প্রত্যেকেই হ'তে পারে কিন্তু প্রণয়-প্রণয়ী হওয়া যায় না!

তাপসী কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বেও লিখেচে—প্রিয়! তোমাকে বহুদিন যাবৎ দেখি নে, তোমাকে সর্ব্বদা, সর্ব্বক্ষণ নয়নের পাশে না রাখতে পারলে মনটা আমার জড় হ'য়ে পড়ে! তোমার কবিত্ব তোমার থাক্, বিরহ আমি সইতে পারবো না—না, সত্যি বলচি আমি আর পারিনে, এরপর যদি তুমি ছুটে না আস তবে আমি একদিন তোমাদেরকে আচম্বিত ক'রে বারাকপুর এসে হাজির হবো! সত্যি বলচি তোমার কবিত্ব আমি সইতে পারবো না, বিরহ-কাব্য লেখার কোন প্রয়োজন নেই। কাল যদি তুমি না আস তবে আমি পরশু দিন বারাকপুর সন্ধ্যায় পৌঁছবো—যদি দুর্ণাম হয় তবে আমার কিছু আসে যায় না—লোকে বল্‌বে অমুকের অমুক ইয়ে হয়ে গেচে, বুঝলে ত' বোকা! মনে রেখো আমার সকল লজ্জা তোমার 'পর!···

এই বসন্ত-রজনী বৃথা যাচ্চে—তুমি কত নিষ্ঠুর! এই বসন্ত-রজনীতে কি আমি তোমার কোলে মাথা রেখে শুভ্র জ্যোৎস্নায় আনন্দ বিহ্বল হ'য়ে তোমার চাঁদ মুখ দেখতে দেখতে তোমার রূপসায়রে, তোমার প্রেম-সমুদ্রে ডুব দিয়ে মরতে পারবো না?···দাদার এক বন্ধু এলাহবাদ থেকে এসেচেন! প্রফেসর মানুষ, তোমাদের বয়সী, প্রফেসর বলে মনে হয় না। ভারি চমৎকার লোক। এসো, আলাপ ক'রে সুখ পাবে!···

চিঠি পাবার পর রজত আসতে পারে নি! চিঠিতে জানিয়েছিল যে তার মা খুব কাতর, দেখাশোনা ক'রবার কেউ নেই, একটু ভাল হ'লেই ছুটে আসবে! মা'র অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে গেলো, রজত আর আসতে পারে নি।

রজত তাপসীদের বাড়িতে এসে থমকে দাঁড়ালো! বাড়িতে লোকজনে গিজ্ গিজ্ ক'রচে, ছাদে তাঁবু পড়েচে, রান্নাঘরে মহোৎসব চলচে—ব্যাপার কি? যা অবস্থা দেখা যাচ্ছে তা'তে বিয়ে বাড়ি বলে

মনে হয়! কার বিয়ে? রজতের মনে কাঁটার মত ফুটে উঠলো অনেক প্রশ্ন! বিয়ে বাড়ি যে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—কিন্তু কার বিয়ে? তাপসীর দাদার? অসম্ভব, তবে কি সে খবর পেতো না! তাপসীর? চন্দ্র-সূর্য্য নিয়মিত উঠচে তাপসীর বিয়ে কি ক'রে হয়! কোন আত্মীয়-স্বজনের নয় তো? মনটা তবু ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে! নতুন ভাড়াটে নয়ত'?...

হঠাৎ আচম্বিত, বিমর্ষ রজতের হাত ধ'রে তাপসীর ছোট ভাই আবেগের সুরে বল্‌লে—এই যে রজতদা'! বেশ লোক আপনি! কবে থেকে আর দেখা নেই! কতদিন ধ'রে বায়োস্কোপ দেখতে পাই নে, চকোলেট, আইসক্রীম খেতে পাইনে!'

রজত ঢোক গিলে বল্‌লে—পানু! তোমাদের বাড়িতে আজ কি?

পানু সোৎসাহে বল্‌লে—আপনি জানেন না? আপনি নেমন্তন্ন চিঠি পান নি, কত চিঠি—অতগুলি চিঠিতে (দুহাত বিস্তৃত ক'রে পরিমাণ দেখালো) টিকিট লাগিয়েচি। সত্যি পাননি? ঠাট্টা ক'রচেন, এ হতেই পারে না যে দিদির বিয়ে আর আপনি কোন খবর পাননি!

'দিদির বিয়ে!' রজত চেঁচিয়ে বল্‌লে—তাপসীর বিয়ে! মিথ্যে কথা, তুমি ভুল বলচো পানু!'

'বারে! দিদির গায়ে হলুদ দিয়ে চান করালো, কত জিনিষ পত্তর কিনেচে দিদির জন্যে, দিদির বিয়ে নয়! চলুন না দিদির কাছে। দিদি ঐ ঘরে উপোষ ক'রে বসে আছে আর আমি দিদিকে দেখিয়ে দেখিয়ে কত খেয়েচি!'

'তোমার দাদার যে বন্ধুটি এসেচেন ওর সঙ্গে বিয়ে হবে—না?'

'কনক বাবুর সঙ্গে বিয়ে হ'বে। জানেন রজতদা', দিদি বলেচে কনক বাবুর নাকি নতুন মোটর গাড়ি আছে, এলাহাবাদে মস্ত বড় বাড়ি

আছে, বাগান আছে। দিদি আমাকে নিয়ে যাবে এবং রোজ গাড়িতে চড়াবে, কত খেলনা কিনে দেবে! জামাই বাবু নাকি কলেজের মাষ্টার, আমি কিন্তু পড়বো না বলে রাখচি। দিদিকে পড়াতে চাও পড়াও— আমি পড়বো না—ঈস্, পড়ালেই হ'ল, আমার ত' মাষ্টার ম'শায় আছেই!'

রজত স্বপ্ন ভেঙ্গে যেন জেগে উঠলো! জানলার ফাঁকে কার নয়ন-যুগল দেখা যায়? তাপসী, হাঁ তাপসীই তো!…একবার ইচ্ছে হলো চেঁচিয়ে বলে—'তাপসি! কনক বাবু যখন তোমাকে প্রশ্ন ক'রবেন যে তোমার হৃদয়-মন কি তিনি সম্পূর্ণভাবে পেয়েছেন, তখন তুমি কী অভিনয়ে বলতে পারবে যে ওই ওষ্ঠ যুগলে অপর কোন ওষ্ঠ যুগল স্পর্শ করেনি, তোমার মন-মুকুরে আর কারো ছায়া পড়েনি!…যার সঙ্গে এক বছর খেলা ক'রেচো তার প্রভাব কি একেবারেই ব্যর্থ যাবে—এ কি শুধু খেলা, আর কিছু নয়? বুঝতে পেরেচি যে তুমি অভিনয়টাকে অতদিন শুধু ফেনিয়ে তুলেচো—সাগর-দোলার ফেনা যতই অসার হোক, যতক্ষণ স্থায়ীই হোক—একটু হলেও তো সার অংশ থাকে। তোমার মাঝে কি একটুকুও ছিল না?…ছিল হয়ত', থাকবেও, কিন্তু কি ক'রে অত নীচে নামলে? টাকাই কি মানুষের সব! কবি সম্রাট সেক্সপীয়ার! যদি তুমি 'Frailty thy name is Woman' না লিখে লিখতে Money thy name is Woman, তবে আজ তোমাকে আমার বাস্তব চিত্রখানি উপহার দিতাম!'…

রজত উন্মাদের মত বেরিয়ে গেলো, প্রিয় বালকের বাধা, অনুনয়, বিনয়, ওই জানালার ফাঁকের চঞ্চল দু'টি আঁখি তাকে আটকাতে পারলে না!

রজত এক বিষয়ে ভাল ক'রেছে, অপর বিষয়ে ক'রেচে ভুল! তাপসীর সঙ্গে দেখা না ক'রে ভালই ক'রেচে, পূর্ব্বরাগ জাগানো বাঞ্ছনীয়

নয়—ক্ষতিকর, সেন্টিমেন্টের প্রভাবে কত অপ্রিয় সত্য, মিথ্যা কথা প্রকাশ পেতো তাতে তাপসীর ভবিষ্যৎ জীবন ছন্দহীন হয়ে পড়তো! রজতের যা ক্ষতি হ'বার তা' হয়ে গেচে।···রজত তাপসীর ওপর সুবিচার ক'রতে পারে নি, ভুল ক'রেচে! লতা সর্ব্বদাই শক্ত জিনিষকে অবলম্বন ক'রে বাঁচে; তাপসী নারী, নারীরা লতার মতই পুরুষকে অবলম্বন করে। তাপসী বুদ্ধিমতী, বুঝতে পারে জীবনের বাস্তবতায় হৃদয়ের চেয়ে টাকা অনেক বড়! ভাবপ্রবণতা সুন্দর, মুখরোচক কিন্তু বাস্তবের মাপ কাঠিতে ওর মূল্য বেশি নয়! রজতের সঙ্গে দেখা হ'লে তাপসী নিশ্চয় বলতো, প্রেম ভাবপ্রবণতার, প্রেম জীবনকে রাঙিয়ে তোলে, সরস করে, আনন্দ বরিষণ করে; প্রেম অনেকের সঙ্গেই করা যায়, তাতে পাত্র বিচার ক'রতে হয় না, কিন্তু বিয়ে ছেলেমানুষি নয়—বিয়ের ওপর জীবনের গতি, বিকাশ, প্রশস্তি সব নির্ভর করে, যাকে বিয়ে ক'রে জীবন সঙ্গী করা হবে তাকে যাচাই ক'রে নিতে হবে!—প্রেম ছেলে বয়সে অনেকেই করে, তা বলে বিয়ে ক'রতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই!···আমরাও তাপসীকে সমর্থন করি! সংসারে থাকতে গেলে নিছক কবিত্বে চলে না, কবিত্ব ক'রতে হবে সত্য কিন্তু আসলে রাখতে হবে স্বার্থ বজায়! কনক বাবু রজতের চেয়ে বিয়ের বাজারে মূল্যবান, কিন্তু জীবনের উচ্চতার স্তরে রজত কনক বাবুর চেয়ে বড়! নারী আদর্শ চায় না, উচ্চতা চায় না—তারা চায় পণ্য দ্রব্যের মত বিকাতে ও গ্রহণ ক'রতে! দশজনের মত তাপসী ভালই ক'রেচে—বিয়ের জন্যে প্রেম নয়।···

রজতের টাকা সংগ্রহের উগ্রতা একেবারে নিভে গেলো! মাথায় তার আগুন জ্বলচে, মন পুড়ে যাচ্চে, সে আগুন শরীরে শিরায় উপশিরায় ছড়িয়ে পড়েচে! দিশাহারার মত চল্‌লো!···

— পাঁচ —

রজত যখন বাড়িতে ফিরলো, রাত্রি তখন সাড়ে এগারোটা! উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় রাস্তায়, মাঠে মাঠে, একা একা বেড়িয়ে মন অনেক শান্ত হয়েচে। উত্তেজনার মাথায় কতই ভেবেছিল, সংসার ত্যাগ ক'রবে, সাধু সন্ন্যাসী হবে, তাপসীর বিষয় নিয়ে উপন্যাস লিখে তাপসীর নামে উৎসর্গ ক'রবে—মেয়ে জাতির materialistic নীচতা নিয়ে right and left ঠুকবে···বিয়ে ক'রবে প্রতিশোধ নেবার জন্যে··· মদ ধরবে, বেশ্যা বাড়ি যাবে উচ্ছন্নে যাবার জন্যে ·····

মাথায় অনেক কিছু এসেছিল, শেষ পর্য্যন্ত সব চাপা পড়লো যখন মায়ের কথা মনে পড়লো। মা শয্যাগত কাতর, কখন শেষ হয়ে যাবে স্তিমিত প্রাণ-প্রদীপ—আর সে উন্মাদের মত পথে পথে ঘুরচে! তুচ্ছ নারীর প্রেম, প্রেম, প্রেম—তুচ্ছ, তুচ্ছ—তুচ্ছ, জীবন বড়—অনেক বড়, তার চেয়ে বড় অর্থ!···ছুটে এলো বাড়িতে!

ঐ তুলসী বেদী তলে তার মা উত্তর শিয়র ক'রে একটা খাটিয়ায় শুয়ে আছেন। মার দেহ শুভ্র কাপড়ে আচ্ছাদিত, মিটি মিটি ক'রে তৈল দীপ্ জ্বলছে, সুতার মত সরু ধূসর ধূপের শিখা লতিয়ে লতিয়ে খনিক এগিয়ে এলোমেলো ভাবে ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়চে—মিষ্টি সুবাস! উর্দ্ধে শূন্য তমসাবৃত অসাড়তা, আরো উর্দ্ধে নীলাকাশ, নীলাকাশে চাঁদ, অগুণতি নক্ষত্রপুঞ্জ, বাড়ির আঙ্গিনা থেকে গন্ধরাজ, বেলা, চাঁপা,

শেফালিকা সুবাস মাখানো মলয় হিল্লোল দুলে দুলে আসচে—নিশুতি রাত, বিভীষিকা ছড়ানো!

তাঁর মা'কে বাইরে এনে রেখেচে, আর তাকে ঘরে নেবেনা। যারা তাঁর চার ধারে বসে জটলা ক'রচে ওদের কি ভয়ঙ্কর দেখাচ্চে—যেন যমদূত! উঃ!……

রজতকে দেখে সব্বাই এক সঙ্গে যেন ক্ষেপে গেলেন; বকাবকির পালা শেষ হ'লো রজত কোন কথার প্রতিবাদ ক'রলো না, প্রতিবাদ ক'রবার মুখ নেই, থাকলেই বা ক'রবে কি ক'রে—মা তো বেঁচে নেই, সত্য সত্যই মারা গেচেন। মরবার সময় ছেলের মুখ দেখতে পাননি, শুনতে পাননি ছেলের কথা, ছেলের হাতের গঙ্গাজলও মুখে পড়েনি।…পাড়াপড়সীরা বকাবকির পর সান্ত্বনা দিতে লাগলো—সান্ত্বনার প্রয়োজন কি? কি হবে আর সান্ত্বনায়! মা!…উঃ! বুক ফেটে যাচ্চে! মা'কে সে ভালবাসতো, কত যে ভালবাসতো তার পরিমাপ নেই। মা তাকে স্নেহ ক'রতেন, মাতৃস্নেহ যে কত বড়, কত উঁচু স্তরের তা সে শুধু অনুভব ক'রতে পেরেচে, বলতে পারে না, ভাষায় ফুটিয়ে জানাতে পারে না! তার আর কেউ নেই—শুধু মা ছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত মা'ও চলে গেলেন! মানুষ যখন সত্য সত্যই মরে তখন কত বড় অবিশ্বাস্য, অসম্ভব বলে মনে হয়।

রজতের চোখ বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল পড়লো! সে কোন কথা কইলে না; কইতে পারলে না! পাড়াপড়সীর নির্দ্দেশ মত শ্মশানঘাটে মা'কে নিয়ে গিয়ে একধারে চুপ্ ক'রে বসে রইলো! চোখের সুমুখে চিতা সাজানো হ'লো, চিতার ওপর মা'কে শোয়ালো, শুকনো কাঠে মা'র পবিত্র দেহটা ঢেকে দিলে, 'দাঁড়াও, ঢেকে দিও না, একবার আমায় দেখতে দাও! একবার ঐ চরণ দুটি বক্ষে ধরতে দাও, রক্ত-

মাংসের ঐ শুভ্র চরণ-যুগল তো আর বক্ষে ধারণ ক'রতে পারবো না!' রজত ছুটে গিয়ে মা'কে জড়িয়ে ধরলো! নিশুতির কালো আকাশে হাতুড়ি পেটার শব্দে বাজচে মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু—মৃত্যুর মত সত্য দুনিয়াতে আর কিছু নেই! মানুষের পরিচয়, মানুষের অস্তিত্ব মৃত্যুতে!...

পাটশোলার আগুন তার হাতে, মায়ের চিতা প্রদক্ষিণ ক'রে মা'র মুখে আগুন দিতে হবে! ওই মুখে তাকেই আগুন দিতে হবে! মানুষের মুখে মানুষ কি ক'রে আগুন দেয়? অজ্ঞান অবস্থায় বাবার মুখে আগুন দিয়েছিল; আজ জেনে শুনে কি ক'রে মা'র মুখে আগুন দেবে? ঐ মুখে কতবার চুম্বন ক'রেচে, ঐ মুখ থেকে কত কথা শুনেচে, ঐ মুখের ভাষায় সে কথা কইতে শিখেচে; আজ কোন্ প্রাণে, কোন্ সংজ্ঞায় ঐ মুখখানিতে স্বহস্তে আগুন লাগাবে?...

লক্ লক্ করে অগ্নির লেলিহান লালে লাল জিহ্বা শূন্য আকাশ বেয়ে ওপরে উঠলো! কি ভীষণ আগুন! পুড়ে সব ছাই ক'রে দিলে, বৃদ্ধ হাড়গুলি ঠাস্ ঠাস্ করে ফুটচে—এক একটা হাড় ফোটে আর রজতের বক্ষে যেন শাঁ করে এসে বিঁধে! ০ ০ ০

মা'র দেহ পুড়ে ছাই হ'য়ে গেলো! পুকুরের জলে চিতার আগুন নেবানো হ'লো! কি প্রয়োজন চিতার আগুন নেবানোর! জলুক না—বাকি আর কে আছে যে অত ভয়? বাকির মধ্যে সে—ক্ষতি কি!

কেউ কেউ রজতের সঙ্গে রাতে থাকতে চাইলো! রজত বললে প্রয়োজন নেই! সে একা থাকতে চায়, একা, একা—সম্পূর্ণ একা! পাড়াপড়সীদের সহানুভূতি, আত্মীয়তা ও সাহায্যের হাত থেকে কোন ভাবে এড়িয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ ক'রে দিলে!

গাঁখানি একেবারে নিঝুম, শেষ রাতে লোক শুয়েচে, ঘুমে অচেতন হ'তে বেশিক্ষণ লাগলো না। নিঝুম, নিঃশব্দ রজনীতে কশ্চিৎ নিশাচর

পাখীর সাড়া পাওয়া যায়। রজত শুয়ে থাকতে পারলে না, উঠে বসলে। মাথায় তার আগুন ধরেচে, মাথা বিকৃত হ'য়ে গেচে—একা কত ভাবতে পারে, ক'দিক সামলাতে পারে? তাপসীর বিশ্বাসঘাতকতা—মাতার মৃত্যু! মাথা ভো-ভো-ভো ক'রচে। তাপসী, তাপসী, তাপসী! বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠলে! তাপসী টাকার মোহে একটি অজ্ঞাত-কুলশীল লোকের গলায় মালা পড়াবে? তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন ক'রবে; তার কণ্ঠে সুধা ঢেলে বলবে, 'আমি তোমায় আমার অনাবিল, অনাঘ্রাত হিয়া, প্রস্ফুটিত কুসুম সাজিয়ে রেখেচি যুগ যুগ ধরে তোমারই জন্যে—ওগো মম অন্তর দেবতা! তোমার নিবেদিতা পুষ্প গ্রহণ কর'!... তাপসী, তাপসী, ফ্লার্টিং মেয়ে, আমি তোমায় হত্যা ক'রবো! ব্যবহৃত হিয়া দিয়ে তুমি অপরকে ছলনা ক'রবে, তা হবে না। তুমি আমার, শুধু আমার—তোমার প্রেম নারকীয় হোক কিন্তু আমার স্বর্গীয়! আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমাকে ছাড়তে পারিনে—তোমার জন্যে আমি মা'কে মরণকালে দেখতে পেলাম না, মা'র মুখে গঙ্গাজল দিতে পারিনি! আমি তোমাকে মেরে ফেলবো—তোমাকে হত্যা ক'রে পরপারে পাঠাবো—তারপর আমি তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াবো! এখানে তোমাকে রাখতে পারিনে—তুমি ভয়ঙ্কর, ছলনাময়ী, নীচ, হীনা—তোমাকে আমি মৃত্যু দিয়ে নিজের ক'রে নেবো!...টাকা, টাকা, টাকা—money, money—মানুষ টাকা, জীবন টাকা, মৃত্যু টাকা, প্রেম টাকা; নারীর রূপ ও মন টাকা—money. তাপসী আস্ত একটা টাকার স্তূপ। ভারতী পত্রিকা টাকার অফিস; সিতাংশু চৌধুরী টাকার কুমীর—ছোট লোক; নীচ, হীন!

রজত উঠে দাঁড়ালো, হাত পা নেড়ে বকতে লাগলো! চেহারা বিকট, চোখ লাল, চুল রুক্ষ, দেহ জংলী, স্বভাব বর্ব্বরের মত!

'আমি কবি—আমি ঔপন্যাসিক—আমি সাহিত্যিক—লোকে আমার লেখা পড়ে সাগ্রহে, আমার লেখা পড়ে সময় কাটায়—ধন্যবাদ দেয়—প্রশংসা করে—damn, swine! কী মূল্য আছে? Nothing—nothing—absolutely nothing is real, substantial, useful in the realistic world except money—money damn—damn, hundred times damn! Damn—damn হো-হো-হো!…

রজত যা' খুশি বকতে লাগলো এবং খাতাপত্র বই সব ছুড়ে ফেলতে লাগলো!

কী হবে ও-সব খাতা-পত্তরে, কী প্রয়োজন আছে পুঁথি পুস্তকের! পুড়ে ফেলো, পুড়ে ফেলো! আমার গল্প, উপন্যাস, কবিতার খাতায় আগুন ধরিয়ে যারা বিনা পয়সায় বই পড়তে চায়, যারা গরিব লেখকদের গলায় ছুরি চালিয়ে ব্যবসা করে, ওদের মুখে ছাইগুলি ছড়িয়ে দিয়ে আস। (মুখ বিকৃত ক'রে বল্‌লে) বাংলা সাহিত্য পচা, নিকৃষ্ট—ভদ্র-লোক পড়তে পারে না। বাংলা উপন্যাস মেয়েদের জন্যে!…লজ্জা করে না বল্‌তে? Shameless, idiot Bengalees! সাহিত্য কি আকাশ থেকে আলগোছা ঝরে পড়বে? পেটে নেই ভাত, পথে অপথে একশো রকম আইন, গোষ্ঠীশুদ্ধো লোক ক'রবে exploit আর সাহিত্যিকরা যেন দৈবশক্তি বলে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা ক'রে যাবে!…

বাংলাদেশে ক'টা লোক আছে যে পয়সা খরচ ক'রে বাংলা বই কিনে পড়তে পারে?…জিজ্ঞেস করি ক'জন বড় লোক আছেন যে ষ্টাইল ক'রে ইংরেজি বই কিনে সাজিয়ে রাখা ছাড়া বাংলা বইও কেনেন? বাঙ্গালীরা যে বই কিনে পড়তে পারে না, তবে অশ্লীল বইগুলি কে কিনে? প্যারিস পিক্‌চার, উলঙ্গ ছবি দেওয়া সিনেমার বই, অশ্লীল বইগুলি কি

ক'রে অত কাটতি যায়?···দুর্ভাগ্য বাঙ্গালীর যে পুস্তক-প্রকাশকরা অনেকেই এক হাজার বই ছাপাতে নিয়ে ছাপেন দেড় বা দু' হাজার, দেনা-পাওনার হিসেব বছর ঘুরিয়েও পরিষ্কার করেন না, দশ বার দিন ঘুরিয়ে এক টাকা, দু'টাকা লেখককে দেন—বাংলাদেশের আরো দুর্ভাগ্য যে পাঠকরা লেখকের নিকট চান complimentary, কেউ কেউ ধার চান পড়ে আপ্যায়িত ক'রবার জন্যে!···দোষ কারো নয়, দোষ লেখকেরও নয়—দোষ এ মহা পাপী জাতির!'

রজত একখানি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে পড়তে লাগলো, হঠাৎ চটে উঠে দাঁতে দাঁত চেপে বলতে লাগলো 'উপন্যাস—এই উপন্যাসখানি লিখতে কতখানি রক্তপাত ক'রতে হয়েচে? Fools, idiots বুঝবে না! এরা কি বলতে চায় আমি শুধু ঠুনকো নামের জন্যে উপন্যাস লিখবো—সাহিত্য কি নামের জন্যে? Internal inspiration হেতু লিখবো—লেখকরা লিখে যায় যখন, তখন বিচার করে না তার literary value এবং commercial value—সত্য কথা। কিন্তু inspiration আসবে কি ক'রে যদি পেটে না থাকে ভাত, শক্তিই বা বৃদ্ধি পাবে কি ক'রে—অভাব অভিযোগ যদি মুষ্টিবদ্ধ ক'রে রাখে তবে সে ভাববে কখন, আর গুছিয়ে আনা ভাবিত কথাগুলি প্রকাশ ক'রবেই বা কখন!···কত কষ্টে লেখা আমার বইগুলি—এর মূল্য কি? আমি যে শ্রম ক'রে, খেলাধূলা বিসর্জন দিয়ে সুখভোগের জন্যে টাকা রোজগারের পথে না গিয়ে বইগুলি লিখেচি, কী এর মূল্য? এরা কি আমায় বিপদ কালে এক তিল সাহায্য ক'রেচে! আজ আমার মা বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন, কাল আমি উপোষ ক'রবো; যদি বিয়ে ক'রতাম, তবে স্ত্রীপুত্র কন্যা উপোষ ক'রতো, অভাবে হয়তো একে একে মরে যেতো—তখন আমি কি ক'রতাম—পাঠক

শাসিয়ে বলতো উপন্যাস লেখো, পচা বটতলার উপন্যাস না লিখে উঁচু দরের উপন্যাস লেখো! মেয়েরা বলতো উপন্যাসে কথা দাও বেশি, রোম্যান্‌টিক উপন্যাস লেখো—লেখো, লেখো, লেখো—দাম কমিয়ে দাও, complimentary বই দিলে আরো ভাল হয়! দিচ্ছি, দিচ্ছি, দিচ্ছি উচ্চ স্তরের উপন্যাস—বাঙ্গালী পাঠক; উপন্যাস বাঙ্গালীর—না? হাঁ-হাঁ-হাঁ! রজত অট্টহাসি দিয়ে ঘরে ছুটতে লাগলো! হঠাৎ চমকে দাঁড়িয়ে খাতাগুলি একত্র ক'রে দিলো আগুন ধরিয়ে! বই ও খাতাতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো, রজত উল্লাসে আগুনের পাশে নৃত্য আরম্ভ ক'রলো। টেবিলের ওপর দোয়াত কলম, পেন্সিল, কাগজ চাপা দেবার কাচের স্ফটীক, পিন, ক্লিপ্ সযত্নে সাজানো রয়েচে। রজতের নজরে পড়তেই ক্ষেপে গিয়ে সব ছুড়ে ফেলতে লাগলো আগুনের ওপর। ধীরে ধীরে সর্ব্বগ্রাসী আগুন সব গ্রাস ক'রে নিভে গেলো!

সাহিত্য গেলো—রজত এখন আর সাহিত্যিক নয়! আগুনের হল্‌কায় পুড়ে সাহিত্যকে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিতে পেরেচে! শ্রান্ত হয়ে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালে। আবার সেই নিশুতি রাতের কালো আকাশ, ওই দূরে পাহাড়ের ছায়ার মত বন! নিশুতি রাত মনের মাঝে আগুন ধরিয়ে দেয়, উত্তেজিত করে, পাগল ক'রে দেয়। শূন্য আকাশ হঠাৎ মনে করিয়ে দিলে তাপসীর কথা—তাপসীর আজ বিয়ে! তাপসী, তাপসী, তাপসীর—বিয়ে, বিয়ে, হ্যাঁ বিয়েই! সে ভুল ক'রেচে, পর্ব্বত প্রমাণ ভুল ক'রেচে। আজ তাপসীর সঙ্গে দেখা ক'রে আসা উচিত ছিল, পৌরুষ দিয়ে এমন একটি tragedy সৃষ্টি ক'রে আসা উচিৎ ছিল যা'তে তাপসী শুভ লগ্নে চোখের জলে ভাসে, যা'তে তার সুখের জীবনে সে কাঁটা হয়ে থাকতে পারতো—তাকে যেন জীবনে ভুলতে না পারে! Tragedy-র চূড়ান্ত করা উচিত ছিল—অন্ততঃ

উপন্যাস সৃষ্টি করা উচিত ছিল! উপন্যাস, উপন্যাস তৈরি ক'রতে পারলে চমৎকার হ'তো! একখানা ছোরা নিয়ে যদি বলা যেতো তাপসীর প্রণয়ী দুজন থাকতে পারে না—হয় থাকবে কণক রায় নতুবা রজত সেন। হো-হো-হো!

রজত স্যুটকেস খুলে এক তোড়া মেয়েলী হাতের চিঠি বের করলো। তাপসীর প্রেম-পত্র! এক গাদা চিঠি, একত্র ক'রে ছাপালে একটা বড় বই হয়! এক, দু', তিন···দু'শোর ওপর চিঠি! কোন চিঠি পাঁচ পাতা, কোনটা পনেরো পাতা, একটা চিঠি পঁচিশ পাতায় লেখা। একদিন এই চিঠিগুলির কত মূল্য ছিল, সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখলে এর মূল্য দে'য়া যেতো না—আজ এর মূল্য কি? কোন মূল্য নেই, শুধু দুর্ব্বল, কোমল মর্ম্ম স্থলে আগুনে পোড়া লৌহ শলাকার মত দাগা দেয়। এ চিঠিগুলি রেখে আর কি হবে? পুড়ে ফেলো—যেমনি ক'রে পোড়ানো হ'য়েচে গল্প, উপন্যাসের খাতা! প্রেম-পত্র পুড়ে তাপসীকে পুড়তে হবে, হৃদয়-মন পুড়তে হবে—নব-জীবন লাভ হ'বে চিতাভস্ম থেকে!

তাপসী! তা-প-সী—কত ভালবাসতো তাকে! তাপসীর মাঝে অনেক বড় সম্পদ পেয়েছিল, তাপসীর মাঝে ছিল কল্পনার কত বড় ঐশ্বর্য্য, তাপসীর মাঝে ছিল দেবীত্ব—মিথ্যা, সবই মিথ্যা, নিছক কবি মনের কবিত্ব! তাপসী অতি সাধারণ নারী, প্রত্যেক নারীই অতি সাধারণ! যতোদিন নারী ছায়ার মত থাকে ততদিন ওরা থাকে দেবী, বৈচিত্র্যময়ী, রহস্যময়ী, জটিল, অতি উচ্চ স্তরের, কিন্তু ওদের অসারত্ব, সাধারণত্ব ধরা পড়ে যখন বাস্তবের মাঝে আসে! তাপসী ideal নয়, কবিত্বের প্রাণ উৎস নয়! তাপসীর সঙ্গে যদি তার বিয়ে হতো তবে দু'দিন পরে আক্ষেপের সীমা থাকতো না!

কিন্তু একটি নারী অত বড় ছলনা ক'রলে! সে অত বড় idiot! তাপসী কেন অত বড় খেলা ক'রলে—হয়ত' খেলা করেনি, এ জাতের এমনি স্বভাব। ঝড়ে তরুরাজ ভূপতিত হয়ে অন্তিম শয্যা নেয় তখন স্বর্ণলতা সহযাত্রা করে না, নবীন উদ্যমে অপরকে আশ্রয় ক'রে বাঁচে! নারী idealistic নয়, realistic, very accurate & sensitive.

কিন্তু আমি কেন সহ্য ক'রবো! আমি অত বড় মহৎ নই যে আদর্শ সৃষ্টি ক'রবার জন্যে বিরহী জীবন পাত ক'রবো। I'll see her, I won't excuse her.

ক'টা বাজে? চারটে! Impossible—তিনটেতে বিয়ের লগ্ন, চারটে বাজে কি ক'রে? you bitch watch! I'll teach you a good lesson, you damn!—রজত ঘড়িটা ছুড়ে মারলো মেঝেতে!

তিনটে বাজে। বিয়ের লগ্ন, তিনটে কুড়ি মিনিটে! আর কুড়ি মিনিট পরে তাপসীকে রজত বিয়ে ক'রবে! হাঁ, সে বিয়ে ক'রবে! কেন সে বি'য়ে ক'রবে না?

রজত তাপসীর চিঠিগুলি একত্র ক'রে আগুন ধরালো! আগুনের পাশে বসে রজত তাপসীর ফটোখানি আগুনের আলোকে ধরে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো, ওই যে ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি—ওকি শুধু ছলনা? ওকি একেবারই ব্যর্থ। ও হাসি কি নিম্ন স্তরের? ভগবান! ভগবান! এ'কথাও কি তার বিশ্বাস ক'রতে হবে? ওই চোখ, ওই হাসি, ওই মুখ—সবই কি কৃত্রিম?

কী আসে যায়! Money thy name is woman i. e. Tapashi. আজ যদি তার টাকা থাকতো, থাকতো যদি বড় বাড়ি, গাড়ি-তবে তাপসী তো তাপসী বহু নারীই নারী-জন্ম সার্থক ক'রতে তারই নিকট ছুটে আসতো! বিয়ের বাজারে কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো!

দুনিয়া শুধু টাকার জন্যে! তাপসী যদি টাকাকে বিয়ে ক'রতে পারে তবে পত্রিকাওয়ালারা কেন exploit করবে না।

তাপসী বিয়ে ক'রেচে টাকাকে, আমি বিয়ে করবো তাপসীর মৃত্যু মাথা কঙ্কালকে!...

রজত তাপসীর ফটোখানি হাত ঘুরিয়ে সাতপাক ঘুরালো—সাতপাকের পর বল্‌লে—আমার প্রাণ তোমার হোক, তোমার প্রাণ আমার হোক। তারপর একটা চুম্বন ক'রে আগুনের ওপর ছুড়ে দিলে।

ফটোতে আগুন ধরলো, রজত লাফিয়ে উঠে উল্লাসে পাগলের মত চেঁচাতে চেঁচাতে বল্‌লে—Money thy name is Tapashi, Money, money, money. ॰ ॰ ॰

আবার সেই জানালার ফাঁকে নীলাকাশ! এই নিঝুম আকাশ মনটাকে বিশ্রী ক'রে দেয়। রজত হঠাৎ জানালা থেকে ফিরে এসে ঘরের মধ্যে পাগলের মত ঘুরতে লাগলো, বল্‌লে—Finished, আর কেন? সাহিত্য গেলো, love গেলো, মা গেলেন! কেউ নেই, মা নেই, বাবা নেই, ভাই বোন নেই, টাকা নেই, সাহিত্য নেই, তাপসী নেই—All go to hell, damn!...

রজত ঘরের বেড়াতে, চালে ভাল ক'রে আগুন ধরালো! আগুন ধক্‌ধক্‌ ক'রে সারা ঘরে ধরে উঠলো! সম্পূর্ণ ঘরে আগুন ধরেচে, আর কেউ নেবাতে পারবে না—hurrah. hurrah!

সারা বাড়িতে সর্ব্বগ্রাসী আগুন ধরেচে!...

— ছয় —

গঙ্গাবতী অতি শৈশবে মাতৃহীন হ'য়ে পিতার বড় আদুরে হ'য়ে পড়েছিল। সংসারে পিতা-কন্যা ভিন্ন ওরা অন্য কিছু জানতো না! স্নেহের বাঁধন এত বড়, এত সুন্দর, এত দৃঢ়, এত আকর্ষণীয় ছিল যে এরা নিজের :ব্যক্তিত্ব পৃথকভাবে পেতোনা, দু'জনের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। এদের চাহিদা, দেনা-পাওনা ছিল মাত্র দু'জনের মাঝে। গঙ্গাবতী জ্ঞান হ'বার পর হ'তে দেখছে শুধু বাবাকে, তার কোন কিছু মনে উদয় হ'লেই হাতিয়ে বেড়াতো পাবার জন্যে, স্নেহময় পিতা মনের ভাব বুঝে সে-অভাব পূরণ ক'রে দিতেন। কোনদিন মাতার অভাব সে অনুভব ক'রতো না। বৃদ্ধ জনক ছিল তার সেবায় জননী-তুল্য। একজনের মাঝে সে জনক-জননীর বাস্তব মূর্ত্তি পেতো। বৃদ্ধ বহু সন্তান ও স্ত্রীকে হারিয়ে একমাত্র মেয়ে গঙ্গাবতীকে বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হ'য়ে কতদূর যে আনন্দিত হ'য়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। গঙ্গাবতী ছিল শাপ-ভ্রষ্টা স্বর্গের দেবীর মত। বৃদ্ধ এক মুহূর্ত্তের জন্যে গঙ্গাবতীকে ছেড়ে থাকতে পারতো না, প্রাণ তার হাঁপিয়ে উঠতো। বৃদ্ধের নিকট যে, সে ছিল স্বর্গের দেবী। তাই সদা ষোড়শোপচারে দেবীর ভোগ দিতো। ছলনা ক'রে বলতো অসুখ হ'য়েছে, গা'টা কেমন ক'রছে, নানা অছিলা ক'রে নিজের খাবার মেয়েকে জোর ক'রে খাওয়াতো। নিজে উপোষ ক'রেও মেয়ের দুধ যোগাতো।

বৃদ্ধ মিলে কাজ ক'রে ক্লান্ত হ'য়েও মেয়েকে হেঁসেলে ঢুকতে দিতো না; পাড়াপড়শীর হাসি, ঠাট্টা, বিদ্রূপ, শাসনেও গঙ্গাবতীকে রান্না ক'রতে দিতো না। অতি আদরযত্ন পেয়ে গঙ্গাবতী বড় জেদী ও দুষ্ট হ'য়ে পড়েছিল; যে বিষয়ে একবার গোঁ ধরতো—না ক'রে কখনো ক্ষান্ত হতো না। ওর দুরন্তপনায় পাড়াপড়শীরা অতিষ্ঠ হ'য়েছিল। গঙ্গাবতী ছিল ছেলের বাড়া, ছেলেদের সঙ্গেই ছিল তার গতিবিধি বেশি এবং খেলাধুলা হ'তো ছেলেদের সঙ্গে। মেয়েদের সঙ্গে মিশ খেতো না। এমনি দস্যি মেয়ে ছিল যে, সমবয়সী কোন ছেলেমেয়ে তার সঙ্গে কোন বিষয়ে এঁটে উঠতে পারতো না; ঝগড়া বিবাদ লাগিয়ে সব্বাইকে মারধর ক'রতো। বড় বড় ছেলেদের পর্য্যন্ত কিল, থাপ্পড়, কামড় দিয়ে একশেষ ক'রে দিতো। সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সে ছিল দলনেত্রী। সারাদিন খেলাধুলা করা এবং পরের জিনিষ চুরি করা, অপরের ক্ষতি করা ছিল মস্ত বড় কাজ। এ দলটাকে সব্বাই রীতিমত ভয় পেতো। বিশেষতঃ গঙ্গাবতীকে সব্বাই হিসেব ক'রে চলতো, কারণ এরা কোন ফাঁকে কি মহা ক্ষতি ক'রে বসে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। নিত্যই পাড়াপড়শীরা গঙ্গাবতীর নামে নালিশ ক'রতো। বৃদ্ধ সর্দার মেয়ের হ'য়ে সকলের নিকট ক্ষমা চাইতো, সামর্থ্য মত ক্ষতিপূরণ ক'রে দিতো।

বৃদ্ধ একমাত্র মেয়েকে পর ক'রতে হ'বে বলে বিয়ের নাম মুখে আনতো না। কেউ বিয়ের কথা তুললে চুপ ক'রে যেতো, সে কোন্ প্রাণে এতটুকু মেয়েকে পরের হাতে দেবে, ব্যবধানে কি সে বাঁচতে পারে—না গঙ্গাবতীই বাঁচবে? বহু লোক গঙ্গাবতীর বিয়ের জন্যে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি ক'রছিল, বৃদ্ধ কোন দিকেই মত দেয়নি, 'হাঁ' বা 'না'র মাঝে বহু দিন সমস্যাটাকে এড়িয়ে যায়। তার ইচ্ছে ছিল, এই কিন্তুর মধ্য দিয়েই যতদিন পারে চলবে। শেষটায় সমাজের নিন্দা, কটূক্তি

শাসন আরম্ভ হ'য়েছিল, বৃদ্ধ সর্দ্দার তা'ও উপেক্ষা ক'রেছিল অপত্য-স্নেহের দুর্ব্বলতায়, জড়তায়। গঙ্গাবতীও বিয়ের নাম শুনলে ভয়ে জড়সড় হ'য়ে যেতো, বিবাহিত জীবনের দুঃখ দুর্দ্দশার কাহিনী প্রত্যক্ষ দেখিয়ে বাপের সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া ক'রতো। এ'রকম সুখের, স্বাধীন জীবন ছেড়ে—বিয়ে ক'রে অন্যের দাসী হ'তে চায়না। গঙ্গাবতী বিয়ে ক'রতে চায় না বলে বৃদ্ধ হ'য়েছিল অত্যন্ত খুশি, যদিও সে মুখে বিয়ের পক্ষে বক্তৃতা দিতো, নিজের বিবাহিত জীবনের সুখের কথা বলে বিয়ের পক্ষে মত করাতে চেষ্টা ক'রতো। গঙ্গাবতী পিতার মনের প্রকৃত প্রতীক দেখতে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তো, পিতার বিয়ে দেবার জোর জবরদস্তি নেই, বরঞ্চ খুব খুশি হন বিয়ে না হ'লে—বুঝতে পেরে মুক্তির নিঃশ্বাস নিয়ে উৎফুল্ল হতো।...হঠাৎ কানাই এদের মাঝে এসে একটা আলোড়নের সাড়া জাগায়। সে আলোড়নে বৃদ্ধ ও গঙ্গাবতী দু'জনেই বিচলিত হ'য়ে পড়েছিল। বৃদ্ধ উঠে পড়ে লেগে যায় কানাইকে ঘর-জামাই ক'রবার জন্য, গঙ্গাবতী কানাই'র স্বভাব চরিত্র, রূপগুণে মুগ্ধ হ'য়ে অতি শীঘ্র আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েছিল। বৃদ্ধ যখন বিয়ের প্রস্তাব তুলে, তখন গঙ্গাবতী মনের মত মানুষ পেয়ে কোন আপত্তি তুলতে পারেনি। শ্বশুর শাশুড়ীর অত্যাচার নেই, স্বামীর ঘর ক'রবার জন্য নিজের বাড়ি ছাড়তে হবেনা, পিতার স্নেহময়ী কোলটি থেকেই যাবে, বন্ধুদের ত্যাগ ক'রতে হবে না, যা কিছু ছিল সবই থাকবে, পাবে মস্ত বড় সম্পদ।

গঙ্গাবতী যদিও নারী—তবু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নারীত্ব বিকাশ পায় নি; পুরুষের মাঝে সর্ব্বদা থাকতো বলে পৌরুষ স্বভাব প্রভাব বিস্তার ক'রেছিল। প্রকৃতির নারী-কাঠামো ভিন্ন নারীর কোন লক্ষণ ছিল না। পাড়ার যুবকরা গঙ্গাবতীকে নির্জ্জনে পেয়ে যখন নারী-দেহ পাবার জন্যে

প্রলুব্ধ ক'রতো, যৌন ক্ষুধা উত্তেজিত ক'রেও যখন ব্যর্থ হ'তো, তখন জোর ক'রে অধিকার ক'রতে যেতো তার দুর্ব্বল নারীদেহ, গঙ্গাবতী পুরুষের বিসদৃশ ভাব দেখে কেমন হ'য়ে যেতো, সে ভাবতে পারতো না যে তা'র সঙ্গে এদের এত বিপর্য্যয় কেন? সে যে নারী—তা ভুলে যেতো, পশুপ্রবৃত্তি-যুবকদের নিকট সে নিজেকে যুবক বলেই উঁচু ক'রে ধরতো। তার পূর্ণ শৌর্য্যের নিকট কারো ক্ষমতা ছিল না যে তার দেহ কলঙ্কিত করে। কোন যুবক যখন তাকে ফুসলাতে চেষ্টা ক'রতো, বা নির্জ্জনে অত্যাচার ক'রতে চাইতো—গঙ্গাবতী দু'তিনটা মিষ্টি কথার পর দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে এমন ঘুসি বা লাঠির ঘা দিতো—যে কেউ আর তার দিকে ফিরে তাকাতে সাহস পেতো না; গঙ্গাবতীর জয়ের অট্টহাসির নিকট মাথা নীচু ক'রে সরে পড়তো। গঙ্গাবতী এমনি ভাবে স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে বড় হচ্ছিল। কোন বিপদে কাবু হ'তে হয়নি বলে সে নিজের স্বভাব চরিত্রের গতি সংযত করে নি। যতগুলি বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল —তার প্রায় সবগুলিই সে নিজে ভেঙ্গে দিয়েছে, যেসব যুবক নিজে বিয়ের প্রস্তাব ক'রেছিল, গঙ্গাবতী ছেলেমানুষের পাগলামি বলে তাদের কথা শ্লেষের স্বরে উড়িয়ে দিয়েছিল; স্বামী হ'বার অনুপযুক্ত বলে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিল; এমন কি অভিভাবকেরা, যারা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসতেন তাঁদেরও অপমান ক'রে—বকাবকি ক'রে তাড়িয়ে দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। কোন কোন অভিভাবককে স্পর্দ্ধাভরে বলেছিল 'কোন লজ্জায় বিয়ের প্রস্তাব ক'রতে সাহস পেলেন! সেদিন আপনার ছেলে আমায় অপমান ক'রেছিল বলে দু' ঘুসি মেরেছিলাম। সে ঘুসি খেয়ে জ্বর হয়, চার পাঁচ দিন বিছানা থেকে উঠতে পারেনি। এমন ছেলের মেয়ে হ'য়ে ঘরের কোণে থাকা উচিত; মাগীমুখো ছেলে—বিয়ে ক'রতে চায় কি লজ্জায়, আমি হ'লে বিষ খেয়ে মরতাম।…মেয়েদের

সম্মান ক'রতে শিখুক, নিজে মানুষ হোক প্রথম। পাড়ার বউ ঝিদের নষ্ট ক'রে বুঝি সাহস বেড়ে গেছে, আমায় বিয়ে ক'রবার সাহস করে!' ...'আপনি এসেছেন এই যা রক্ষা! আপনার ছেলে এলে আর ফিরে যেতে হতো না, খুন ক'রে ফেলতাম। মেয়েরা বুঝি মানুষ নয়? হারামজাদা গর্ভবতী স্ত্রীকে সেদিন খুন ক'রলে, আজই চায় আবার বিয়ে ক'রতে। বলবেন—এ আর কেউ নয়, গঙ্গাবতী! চাবকিয়ে দাঁত ভাঙ্গবে—গায়ের চামড়া তুলে ফেলবে।'...

এ ধরণের নারী হ'য়েও গঙ্গাবতী শেষটায় কানাই'র প্রতিভার নিকট মাথা নীচু ক'রে প্রণয় ভিক্ষা ক'রেছিল। স্বভাবদোষে যদিও সে কানাইকে অপমান ক'রতে ছাড়েনি, বাড়ি থেকে তাড়িয়েও দিয়েছিল, কিন্তু বিয়ের প্রস্তাবে পূর্ব্বের একগুঁয়েমী 'না' বলতে পারে নি—কারণ মন গোপনে অন্তরঙ্গতা ক'রেছিল, মনে বড় ভাল লেগেছিল। নিতান্ত নারী হ'য়ে জন্মেছে, পিতা বৃদ্ধ হ'য়েছেন, স্নেহময় পিতার আদেশ—তাই যেন সে বাধ্য হ'য়ে বিয়ে ক'রতে রাজি হ'য়েছিল।...

যে গঙ্গাবতী চলছিল গঙ্গার মত হিমালয়ের গুহা থেকে প্রলয়বেগে, যার বেগ সহ্য ক'রতে না পেরে ঐরাবত 'প্রিয়ার' স্থানে 'জননী' বলে নিস্তার পায়—তেমনি ভয়ঙ্কর গঙ্গাবতী কি ক'রে আবার গঙ্গার মতই শান্ত হয়, নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ধরণীকে সুজলা সুফলা করে? যে গঙ্গাবতী বিয়ে হ'য়ে গেলেও কাউকে তোয়াক্কা ক'রতো না—নিজের প্রাধান্য বজায় রাখতো সর্ব্বদা, সর্ব্বস্থানে, বয়োজ্যেষ্ঠদের পর্য্যন্ত গ্রাহ্য ক'রতো না, সত্যের কোঠায় পা' রেখে দশ পাঁচ কথা মুখের ওপর বলে দিতো, সমানে ও ছোটদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ ক'রতো, দস্যি ছেলেদের মত এগারো বারো বছর বয়সেও মারধর ক'রতো—সে কী মন্ত্রগুণে এমনি নীরব, গম্ভীর হলো? যৌবনের, প্রণয়ের আগমন হেতু চঞ্চলতায়,

ও সলজ্জ সজীবতায়, রূপ মাধুরীর সার্থক বিকাশে কি ক'রে সে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো? কি মায়ার পরশে সে খাঁটী, পাকা গৃহিণী হ'য়ে উঠলো? স্বামী পুত্র কন্যাদের পেট ভরে খাইয়ে যা অবশিষ্ট থাকে—তা খায়, যেদিন অবশিষ্ট না থাকে—সেদিন উপোষ করে। কোন কোন দিন অভাব অনুসারে নিজের খাদ্য ছেলেমেয়েদের জন্যে তুলে রাখে। মাতাল স্বামীর অত্যাচারে একটু প্রতিবাদ করে না। মারধর সহ্য ক'রে, প্রাণপণ চেষ্টা করে স্বামীকে রক্ষা ক'রতে।

যে গঙ্গার পতন পৃথিবী সইতে পারতো না, ভেঙ্গে চুরে খান খান হ'য়ে যেতো, এমনি প্রবল পরাক্রম মারাত্মক ছিল, সেই গঙ্গা যখন মহাদেবের জটাতে এসে আশ্রয় নেয় তখন অতি সহজ, সরল, শান্ত, সুন্দর হ'য়ে পড়ে। নরনারীর মিলন এমনি মধুর, এমনি সুন্দর, এমনি আশ্চর্য্যজনক ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার! তাই বুঝি নর-নারীর মিলিত গীতে জগৎ স্তব্ধ, মুগ্ধ, হর্ষিত, পুলকশিহরণে মূর্চ্ছিত। জন্ম-দুঃখীর প্রাণে আনন্দ বর্ষিত হয়, নিস্তব্ধ সজীব হয়, কালা-বোবা, অন্ধদেরও অনুভূতিতে অন্তর্দৃষ্টি আসে, মিলনের মধু একভাবেই লাভ করে। যে গঙ্গাবতী গঙ্গার মত ভয়ঙ্কর ছিল, নিয়ম কানুন মানতো না, নিজের জোরে চলতো এবং অপরকে নিজের মতানুযায়ী চালাতো, তার এতবড় পরিবর্ত্তন কি নরনারীর মিলনে? যার অতীত জীবন এমনি ছিল, সে কি ক'রে স্বামীর অত্যাচার, দুঃখ কষ্ট, দারিদ্র্যের কশাঘাত সহ্য ক'রছে, কি ক'রে আদর্শ নারীর মত সংসার ক'রছে? এর কারণ কি—সে নারী? এর কারণ কি—সে মাতৃজাতি? এর কারণ কি—তার বিকশিত মাতৃত্ব?

গঙ্গাবতী অদ্ভুত মেয়ে। দিন যত এগিয়ে যায়, ততই যেন সে আরো আশ্চর্য্যময়ী হয়। সে সুন্দরী, অসীম সুন্দর রূপ-যৌবন তার শতমুখে কেবল বেড়েই চলেছে। এত রূপ, যাকে বলে রূপ যেন চুইয়ে

পড়ছে! বয়স তার একুশ, কি বাইশ! হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, লতিকা নয়, লতিয়ে লতিয়ে চলে না, মোটা নাদুস নুদুস ঢবঢবেও নয়,—উঁচু, লম্বা চওড়া, দীর্ঘ একবোঝা কাল কেশ আহাঁটুচুম্বিত, মুখখানা গোল—অনেকটা যুক্ত প্রদেশের কুলিরমণীদের একচেটিয়া গোল মুখের মত, হাসলে যেন মুক্তা ঝরে; বিস্তৃত নয়ন, বিদ্যুতের মত চঞ্চল দীপ্তিশিখার লুকোচুরির মাধুরিমা সদা-বিরাজিত। এলোকেশে বা এলোমেলো খোঁপায় যখন সে রাস্তায় আপন মনে, পবিত্র মূর্ত্তিতে চলে—রাস্তার প্রত্যেকটি লোক তার পানে চেয়ে থাকে, তার উজ্জ্বল গৌরবর্ণের বিচ্ছুরিত আলোকছটায় মুগ্ধনেত্রে নির্ণিমেষ নয়নে তাকিয়ে ভাবে, এই রূপরাণী কি নন্দন কানন থেকে মানবী সেজে ধরায় এলো? এতো সুন্দর সে, এতো দীপ্তি তার দেহে, এত আকর্ষণ তার সৌন্দর্য্যে যে রূপের পূজারীরা নীরবে সৌন্দর্য্যের প্রেমময় অর্ঘ্য নিবেদন করে, কেউ ভাবতে পারে না সে কুলিরমণী; যারা পরিচিত—তারাও ভুলে যায় তার ইতিহাস, ভুলে যায় তার ভূগোলের স্থান, মনে পড়লেও কষ্ট পায়।···

গঙ্গাবতীকে আর বিশদভাবে বর্ণনা করা যায় না, সে যে বিবাহিতা, সে যে গৃহিণী, সে যে নারীর শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিতে বিকাশিতা, তার কোলে সন্তানের দল। জননী! সে যে জননী! কিন্তু উপায় নেই—তার একটু রূপ বর্ণনা ক'রতে হলো। প্রৌঢ়, যুবক মহলের লোলুপ দৃষ্টি থেকে একটু বের ক'রে না আনলে যে নিতান্ত চলে না, তাই একটু বের ক'রে আনলাম। এক কথায় সে সুন্দরী—খুব বেশি সুন্দরী, সচরাচর এত সুন্দরী যুবতী নারী মিলেনা, এতোই! হোক না চারটি সন্তানের জননী—তবুও।

কুলি বস্তির হাওয়াটা যেন একটু উল্টে গেছে, দিন দিন কেবলই পরিবর্ত্তন হচ্ছে। অশিক্ষিত লোকেরা প্রেমের ধারধারে না, এ অতি

সত্য কথা। এদের প্রেম নেই বলে জেনে এসেছি—সত্যই তো এরা প্রেমের কি বোঝে? দেহ, সেবা, ক্ষমতা এই তো জানে, এ পর্য্যন্তই ত' এদের জ্ঞান। দু'টি কবিতা ব'লতে পারবে—না ভালবাসি কথার বহু রূপরস দিতে পারবে? শিক্ষিত রুচিমার্জ্জিত লোকের প্রেম কবিতার ছন্দে ছন্দে—কিন্তু কুলি মজুরদের তো সাহিত্য নেই, ভাষার ওপর আধিপত্য নেই, পেচিয়ে কথা বলে সৌন্দর্য্যও সৃষ্টি ক'রতে পারেনা, প্রেম ফুটবে কি ক'রে? বিকাশ হ'বে কি ক'রে—যদি বীজ না পায় স্থান—না পায় খাদ্য! দুর্ব্বলের ব্রহ্মচর্য্য নেই, ধর্ম্মেরও ভয় নেই, সহজ, সরল দৈহিক মিলন প্রশ্নের উত্তর 'হাঁ' বা 'না'। অতি সহজ প্রশ্ন, তার উত্তরও অতি সহজ। যাকে সভ্যলোক বলে নগ্নপশুপ্রবৃত্তি। এ অতি নগ্নরূপ—এর আত্ম-গোপনতা নেই উপন্যাসের মাঝে। এখন কুলি মজুরদেরও প্রেমের বহুরূপী ঢেউ বয়; সভ্যতার কাব্যে—নগ্ন রূপ ঢাকা থাকে। তাই গঙ্গাবতীর ভক্তের অভাব নেই, দিন দিন কেবল বেড়েই যাচ্ছে। বহু ভক্ত তার ব্যথার ব্যথী, দরদী ভাষার মার্জ্জিত মাধুর্য্যে প্রেমের অর্ঘ্য নিবেদন করে। ভক্তের মাঝে প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থী দু'দলই আছে। নবীনপন্থীরা গুণ গায়, মেমের সঙ্গে, বড়লোকের সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে, অভিনেত্রীদের সঙ্গে রূপের তুলনা করে—গঙ্গাবতীর রূপের প্রশংসা করে পঞ্চমুখে, চরণ তলে প্রেমের অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে জীবন যৌবন ধন্য করে, নিত্যিকার অপমানেও প্রকৃত প্রেমের বন্যাস্রোত একটু কমে না, হতাশ হ'য়ে সংযত হয় না; অপরদল কানাই'র মুণ্ডপাত করে, টাকা পয়সার লোভ দেখায়, কোন ভনিতা না ক'রে সোজা দেহটা চেয়ে বসে, হাত বাড়াতে কুণ্ঠিত হয় না, ভয় পায় না।

যারা ভণ্ডের মুখোস পরে প্রেমের অভিনয় করে, তাদের গঙ্গাবতী লাঠি, ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করে না, চোদ্দগোষ্ঠীর নাম নিয়ে গালাগাল

করে না এবং যারা কামলালসা প্রকাশ করে—দেহটা ধরবার জন্য এগিয়ে আসে—তাদেরও না। নবীন ও প্রাচীনপন্থী কাউকে সে বাধা দেয়না, রুদ্রমূর্ত্তিতে ঝগড়া বিবাদও করে না। তার নিশ্চেষ্টতা, অবজ্ঞা, দৃঢ়তা, পবিত্রতার নিকট কেউ ঘেঁসতে পারে না। আশ্চর্য্য তার নিশ্চেষ্টতা! সে যেন অসীম, অণু পরমাণুর কথা তার কল্পনার বাইরে; কল্পনায় স্থান দিলে বা গ্রাহ্যের মধ্যে আনলে যেন নিজের বৃহত্তরতাকে অপমান করা হয়, খেলো ক'রে দেওয়া হয়। নীরব তার অবজ্ঞা, অথচ কত কঠিন, কত তীক্ষ্ণ, কত ভয়ঙ্কর! পাষণ্ডরা লজ্জায় মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়, যাদের লজ্জা সরমের বালাই নেই—ওরা ভয়ে সরে পড়তে বাধ্য হয়; বিপ্রকর্ষণে যেমন দুই ধাতুকে দূরে নিক্ষেপ করে বা সরিয়ে রাখে—নিকটে ঘেঁসতে দেয় না—ঠিক তেমনি বিপ্রকর্ষণে পাষণ্ডরা নিকটে ঘেঁসতে পারে না। হিমালয়ের মত তার দৃঢ়তা, পরখ ক'রতে হয় না, অজ্ঞানতাবশতঃ যে পরখ ক'রতে যায় সে নিজেই চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। সবাইকে তার সৌম্য, উন্নত, প্রশান্ত, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখেই দূর হ'তে সরে পড়তে হয়। স্বর্গীয় তার পবিত্রতা, ললাটে লেখা নেই, বায়ুর মত অনুভব করা যায়—না যায় দেখা, না যায় ধরা, মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভূত করায়।

গঙ্গাবতীকে নীরব দেখে পাড়ার মেয়েরা হ'লো সন্দিগ্ধা। অল্প অল্প ক'রে কাণাঘুসা চললো, গঙ্গাবতীর চরিত্রের ওপর কুৎসা রটাতে হ'লো যত্নবান। এখানে বলে রাখি—গঙ্গাবতী কুড়ি বছর বয়সে শেষ সন্তান প্রসব ক'রে আর গর্ভবতী হয় নি; স্বামীর ভালবাসা হারিয়ে, একরূপ স্বামীপরিত্যক্তা হ'য়ে ব্রহ্মচারিণীর মত জীবন চালাচ্ছে; তাই ভাল গঠনের দেহ দিন দিন কেবল সুন্দর ও আকর্ষণীয় হচ্ছে। স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, লাবণ্য, যৌবন-ঐশ্বর্য্য কেবলি সুন্দর হ'তে সুন্দরতর হচ্ছে। গঙ্গাবতীর সৌন্দর্য্য ও ভক্তের প্রশংসাবাদ পাড়াপড়সীর ঈর্ষা ও গাত্র

জ্বালার সৃষ্টি ক'রলো। যে স্বামীপরিত্যক্তা, যে খুব গরিব, যা'র চারটি সন্তান, যে দুঃখিনী—সে দিন দিন কুৎসিত, কদাকার, রুগ্না না হ'য়ে—কি ক'রে সুন্দরী, হৃষ্টপুষ্ট হয়? গঙ্গাবতীর বাড়িতে লোক যাতায়াত করে, সে যদি সতী হ্তো তবে কি ক'রে এ সব চরিত্রহীন লোকেরা এমনি ভাবে ঘোরা-ফেরা করে? কৈ! গঙ্গাবতী ত' কাউকে ঝাঁটা মারে না, অকথ্য গালাগাল করে না, চেঁচামেচি করেনা; উৎপাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে পাড়াপড়সীর নিকট সাহায্যও চায় না? নিশ্চয় সে অসতী, হাড়ে হাড়ে বজ্জাত্, মিনমিনে সয়তান; সোজা মানুষটি সেজে থাকে—যেন কিছু জানেনা, ওপরে সাদাসিধে, ভাল মানুষের আবরণ—অন্তরালে বীভৎসতা। যে ছেলেবেলায় খুব দুষ্ট ছিল, মদ্দা মেয়ে ছিল, যার সঙ্গী ছিল যুবকরা, যার দুরন্তপনায় পাড়ার লোক টটস্থ থাকতো—সে কি ক'রে এমনি শান্ত-শিষ্ট, বোকা মানুষ সাজে? একি ভালোর লক্ষণ? বকধার্ম্মিক সেজে মাছকে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে!

পাড়ায় গঙ্গাবতীর নামে খুব কুৎসা রটলো এবং মেয়ে মহলে বেশ আন্দোলন চললো। এদিকে যারা প্রেম ক'রতে গিয়ে মূক অপমান পাচ্ছে, তারা আঁটতে লাগলো সাফল্যমণ্ডিত হ'বার ফন্দি; যারা দেহ চেয়ে ব্যর্থ হ'য়েছে তারা রটাতে লাগলো দুর্নাম এবং জোর ক'রে অধিকার ক'রবার জন্য ক'রতে লাগলো শক্তিসঞ্চয়। যারা বহুদিন জোর ক'রে অভিলাস পূর্ণ ক'রতে গিয়ে ফিরে এসেছে, তার শৌর্য্যের প্রভাবে বেশি এগোতে পারে নি, তা'রা আক্রোশে কেবলি জ্বলে মরে। নিজেরা সন্দিগ্ধ হ'য়ে ঝগড়া করে, প্রতিযোগিতা করে—যেমনি পশুরা মারামারি করে, তেমনি। হায় পশু-প্রবৃত্তি! কতরূপ তোমার!

এ ত' গেলো বস্তির উৎপাত। এ উৎপাত খুব কঠিন নয়, মারাত্মক নয়—কারণ সে স্বাধীন নারী, তার মনের দৃঢ়তা আছে, শক্তি সামর্থ্য

আছে, বস্তির হালচাল ভাল ক'রেই জানে, বুঝে। পাড়ার বহু মেয়ে ঝগড়া বাধাবার জন্ম, আমোদ ক'রবার জন্ম, শুনিয়ে শুনিয়ে মিথ্যা কুৎসা আলোচনা করে, বিশ্রী কথা ব্যাখ্যা করে—গঙ্গাবতী শুনেনি ভাব ক'রে সরে পড়ে, তুচ্ছ কথার প্রতিবাদ করার দুর্ব্বলতা তার নেই, ভিত্তিহীন কথার মূল্য (importance) দিয়ে মিথ্যা ভিত্তির পথ তৈরি ক'রে দিতে চায় না। বাজে বকবার সময় কৈ, একা যুদ্ধ ক'রবেই বা কতজনের সঙ্গে? পাড়ার চরিত্রহীনা নারীদের কুৎসা স্পষ্ট মুখের ওপর চলে, ওদের মুখ কাঁচা নর্দ্দমার চেয়ে অপরিষ্কার কিন্তু ঝগড়া ক'রবার মত ছোট মন তার নেই, পারবেও না। সে প্রমাণ চায় না, প্রমাণ করেও না। সে জানে, বিশ্বাস করে, যুঝাটা বড় নয়, ভাল নয়, পবিত্রতাই বড়—শ্রেষ্ঠ। কুলি মজুরদের বিশাল বাহুকে, পাশবিক মনোবৃত্তিকে সে ভয় পায় না, গ্রাহ্যই করে না; ওদের চাবকিয়ে রাখবার মত মনোবল, দৈহিকশক্তি তার যথেষ্ট আছে। কিন্তু বাইরের উৎপাতকে উপেক্ষা ক'রতে পারলে না। সেজন্যে সে শঙ্কিতা, ভীতা, তৎপর, সতর্ক। হিসেব ক'রে কথা কয়, হিসেব ক'রে চলে, ভেবেচিন্তে কাজ করে।

কানাই সংসারের কোন ধার ধারে না। নিজে যা রোজগার করে তার এক পয়সাও সংসারে দেয় না। এখন তার মদ না হ'লে একেবারেই চলে না; নিত্যি মদ খাওয়া চাই, কুপল্লীতে গিয়ে হল্লা করা চাই-ই। হাতের টাকা ফুরালে কুপল্লীতে স্থান পায় না, দিন কয়েকের জন্যে ভাল মানুষ সেজে টাকা রোজগার করে—আবার উচ্ছৃঙ্খলতার মাঝে ডুব দেয়। বাড়িতে বেশি আসে না, খাবারের সময় আসে, খেয়ে-দেয়ে চুপ ক'রে সরে পড়ে, যেদিন খাবার না থাকে সেদিন ঝগড়া বিবাদ করে, মারামারি করে। যে সময় চাকরি থাকে না, মজুরী খাটতেও পারে না, বন্ধুবান্ধবের ওপর খাওয়া পরা ক'রতে পারে না—সেদিন

ভাল মানুষ সেজে বাড়ি আসে, ছেলেমেয়েদের নিয়ে কৃত্রিম আদর যত্ন করে। গঙ্গাবতী ভুল বুঝে, স্বামীর প্রতি বিরূপ হ'য়ে থাকতে পারে না, স্বামীকে আদর যত্ন ক'রে খাওয়ায়, সেবা করে। কানাই নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'রে চুপটি ক'রে সরে পড়ে।

কানাই আসুক বা না আসুক—এক পয়সা সংসারে দেয় না, উপরন্তু ছলনা ক'রে টাকা পয়সা নিয়ে যায়, রীতিমত খাওয়া-দাওয়া করে। গঙ্গাবতীকে বাধ্য হ'য়ে মিলে কাজ নিতে হ'য়েছে। গম্ভীরভাবে মিলে কাজ ক'রতে যায়, গম্ভীরভাবে কাজ ক'রে বাড়ি ফেরে। কারো সঙ্গে নিতান্ত দরকার ভিন্ন কথা বলে না, কারো সঙ্গে বন্ধুতাও করে না। সে থাকে আপন মনে!

বাইরের উৎপাতের মধ্যে শ্যামজীর অনুগ্রহটাই হলো মারাত্মক। শ্যামজী মিলের ছোটবাবু, মিলে কিছু অংশও (share) আছে। কুলিমজুর থেকে বড়বাবুরা তার ভয়ে কম্পিত; মুখের কথা খসলে লোকের চাকরি যায় এবং হয়। তিনি ক্রোড়পতি, সমাজে খুব প্রতিপত্তি তাঁর, ক্ষমতাও অসীম; যা সঙ্কল্প করেন তাই ক'রতে পারেন, কোথাও এ পর্য্যন্ত পরাজিত হন নি। দেহটা তাঁর 'ঢাকার জালার' মত, ঘাড় আছে কি নেই বোঝা যায় না; তবে ঘাড় আছে হলপ ক'রে বলা যেতে পারে। মাথাটা দেহের পক্ষে অতি ছোট, ছোট মাথায় মস্ত বড় টাক অর্থাৎ মস্তকবিস্তৃত টাক, ভুঁড়ি ও টাক দু' সুলক্ষণই বর্ত্তমান; অতএব টাকা প্রচুর পরিমাণে যে আছে তা' না বললেই চলে। দেহের বর্ণনা সোজাভাবে ক'রলে এই বল্‌তে হয় যে টাকপড়া ছোট মাথা, বিশাল ভুঁড়ি, মোটা মোটা হাত পা, রক্তবর্ণ গোল আঁখি, দূর থেকে মনে হবে একটি জালার ওপর একটি আস্তো নারকেল বসানো আছে। শ্যামজীর চলাফেরার সময় আধভরা জলের কলসির মত গম্ গম্, ছম্

ছম্‌ শব্দ হয়। ভুঁড়ির বিশেষত্ব আছে; যেমনি মোটা ও ভারি, তেমনি ঘুমের ঘোরে উত্থান পতন হয় বিকট নাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে। ছেলেমেয়েরা সে বিশ্রী শব্দে ও দৃশ্যে ভয় পেয়ে যায়। তিনি ভুঁড়ির জন্যে টেবিলের পাশে বসে লিখতে পারেন না, ভুঁড়ি আটকে যায় টেবিলে, আবার চেয়ার সরা'লে ছোট হাতে লেখা চলে না, টেবিল ছোঁয়া কঠিন হয়, তাই তিনি ডান পাশে টেবিল রেখে কাজ করেন।

ছেলেমেয়েরা এ হেন বিশেষত্বময় দেহ দেখে ভয়ে জড় সড় হ'য়ে পড়ে, পালাতে পথ খুঁজে পায় না; কুলি রমণীরা দাঁতখিঁচুনি ও চরিত্রহীন স্বভাবের জন্যে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত থাকে, কুলি মজুররা তাঁকে বাঘের মত ভয় পায়, পদস্থ কর্ম্মচারীরা অপমান ও চাকরি যাবার ভয়ে মাথা তুলতে সাহস পায় না। যেদিন মদের মাত্রা বেশি হয় এবং মেজাজ খারাপ থাকে—সেদিন মিলের সকল কর্ম্মচারী ও কুলি মজুরদের হৃদ্‌কম্প আরম্ভ হয়।

গঙ্গাবতী দাঁতখিঁচুনি ও গালাগালকে ভয় পায় না, বরঞ্চ অল্প অল্প পেতে ইচ্ছে করে। সে চায় অন্যান্য কুলিরমণীদের প্রতি যেমন ব্যবহার করা হয় ঠিক তেমন তার প্রতি হোক। অনুগ্রহে তার প্রাণ কাঁপে। সে ভয় পায় বড়লোকের মাতলামিকে, ছদ্ম সরলতাকে, ভালমানুষে-স্বভাবকে, অনুগ্রহকে। এ সব সহ্য করা যায় না, অথচ প্রতিকার করাও সহজ নয়। যার টাকা আছে লোককে দয়া ক'রবে, চরিত্র স্খলিতবশতঃ মাতাল হবে, চরিত্রহীন হবে, তার কিছু যায় আসে না তাতে! কিন্তু তার প্রতি অনুগ্রহ, দয়া যে তার পক্ষে মারাত্মক। সে ঠেকে ঠেকে লোক-চরিত্র শিখেছে। এ প্রকার ভাল-মানুষের ব্যবহার—অনুগ্রহই এক সময় তার কাল হয়ে দেখা দেবে, বাইরে ভাল থাকবে, অন্তরালে অদৃশ্য আকর্ষণ টেনে নেবে নরকে—

তখন থাকবে না বাঁচবার উপায়, থাকবে না মুক্তির পথ, নরকের পরশে মনও হয়ে যাবে নরকের দ্বার।

এঁরা শিক্ষিত, ক্ষমতাশালী, প্রভূত অর্থাধিপতি, এঁদেরকে এড়িয়ে চলা যায় না, ভণ্ডামীকে বাহবা দিয়ে উজ্জ্বল ক'রতে হয়, স্বার্থময় সাহায্যে জুতার নীচে লুটিয়ে পড়ে কৃতজ্ঞ জানাতে হয়। এঁরা নাচাতে নাচাতে ক্লান্ত ক'রে দেন, ছলনায় বোকা বানিয়ে রাখেন, মদিরা-রূপ টাকার প্রভাবে মাতাল ক'রে দেন, তারপর নর্ত্তকী আপনি বাহুতে আত্মসমর্পণ করে। এঁরা সাপ, হাড় নেই, এঁকে বেঁকে জড়িয়ে দংশন করেন। শত্রুর সঙ্গে যুঝা যায়, সতর্ক হওয়া যায়, কিন্তু এঁরা যে ধোঁয়ার মত—যুঝা যায় না, প্রতিকার করা যায় না, শুধু অচেতন ক'রে দেয়, ধীরে ধীরে গ্রাস করে।

— সাত —

শ্যামজী এখন ঠেকে শিখেছেন। ব্যবসা-বুদ্ধি সর্ব্বস্থানে খাটে না, বিশেষতঃ প্রণয় ব্যাপারে। তিনি টাকার জোরে, অসীম প্রতিপত্তির জোরে—দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরে বহু নারীকে ভোগ ক'রতে পেরেছেন। যার প্রতি তাঁর কৃপাদৃষ্টি পতিত হ'য়েছে তাকেই তিনি ছলে, বলে, অর্থে বশীভূত ক'রে বাগান বাড়িতে এনে অঙ্কশায়িনী ক'রেছেন। রূপ থাকা সত্ত্বেও পুরাতনের মোহ কাটলে তিনি হতভাগিনীদের কপর্দ্দকহীন ক'রে পথে দাঁড় করাতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হন নি। যাদের পায়ে মাথা নত ক'রেছেন দেহ জয় ক'রবার জন্যে, তাদেরই পদাঘাত ক'রেছেন—বিশ্ব-বিজয়ীর মত নতুনের মাতাল উদ্দীপনায়। এখানে বলে রাখা উচিত যে তিনি ব্যবসায়ী বেশ্যা ও ভদ্রমহিলাদের ওপর বড় বিরূপ ; যদি কোন চরিত্রহীনা মহিলা-মুখোস পরা নারী তাঁর ঐশ্বর্য্যের লোভে এগিয়ে আসে তবে তিনি সমাদরে গ্রহণ করেন, নতুবা তিনি প্রথম এগিয়ে যেতে সাহস পান না। এর কারণ বেশ্যাকে ভোগ ক'রতে হলে টাকার প্রয়োজন, ফাঁকি চলে না, যথেচ্ছাচার চালানো যায় না, ওরা চুষে টাকা নিয়ে যায়। ভদ্রমহিলাদের ওপর লোভ খুব বেশিই ছিল, কারণ অল্প অর্থে স্খলিতা নারীকে যে ভাবে ইচ্ছে চালানোর খুব সুবিধে। ভাগ্য একটু বিরূপ, যৌবনে যে কলঙ্কটিকা ললাটে দিয়েছিল এঁকে—সে আজও মুছে যায়নি। ভদ্রমহিলার ওপর জবরদস্তি ক'রতে গিয়ে জুতার বাড়ী খেয়েছিলেন বহু নরনারীর সম্মুখে।

গরিব, দুঃখী, কুলিমজুর সুন্দরী রমণীদের ওপর লোভ বেশি, টাকার জোরে ও অল্প অর্থ ব্যয়ে অভিলাষ অতি সহজেই পূর্ণ হয়। এ জীবনে তিনি বহু সতীকে অসতী করেছেন, ঘরের কুলবধূকে স্বামীর বক্ষ হ'তে কেড়ে এনে বেশ্যা ক'রেছেন, কপর্দ্দকহীনাকে অর্থশালিনী ক'রেছেন। সর্ব্বত্র জয়ী হ'য়ে তিনি নারীকে নারী বলে ধারণা ক'রতে ভুলে গেছেন। তাঁর ধারণা ছিল নারী পুরুষের জন্য সৃষ্ট হ'য়েছে—তার নেই আপন সত্ত্বা, নেই তার নারীত্ব। হুকুম ক'রলেই নারীরা এগিয়ে আসে ; দু'এক পয়সা দেখালে পোষা কুকুরের মত জুতার নীচে পড়ে লুটিয়ে, জুতার ঠোক্কর খেলে লেজ নাড়ে, পায়ের পাতা চেটে সুড়সুড়ি দেয়। তবে মাঝে মাঝে দু'একজন নারী বের হয়, তাদের লোক-দেখানো লজ্জা, কুসংস্কার, সতীত্বজ্ঞান একটু থাকে—তাই পোষ মানাতে দেরি হয়, কিন্তু টাকার চাক্ষুষ রূপে সবাই লুটিয়ে পড়ে, চাবুক মারলেও নড়ে না। শ্যামজীর ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতাকে বাতিল ক'রে দেয়—প্রথম কিশোরী বাঈ।

কিশোরী বাঈ মিলে আসতো স্বামীর খাবার নিয়ে, অভাবে পড়লে মাঝে মাঝে মিলে দিনমজুরী ক'রতো। কিশোরী বাঈ'র ওপর শ্যামজীর লোভ পড়ে। যেমনি লালসা জাগলো অমনি হুকুম দিলেন, কিশোরী বাঈ প্রস্তাব অতি তুচ্ছভরে প্রত্যাখ্যান ক'রেছিল। ঐশ্বর্য্যের মাদকতায় কিশোরীবাঈ মোহিত হয় নি, একটুকুও এলে পড়ে নি। শ্যামজী শেষ অস্ত্র মেরেছিলেন। অবলা নারী জোর ক'রে, ছল ক'রে, কতক্ষণ পুরুষকামবহ্নির ক্ষমতা থেকে আত্মরক্ষা ক'রতে পারে। মেরে, কামড়িয়ে, খাঁমচিয়ে বহুক্ষণ আত্মরক্ষা ক'রেছিল—শেষটায় প্রকৃতি তাকে আত্ম-সমর্পণ ক'রতে বাধ্য ক'রেছিল।

কিশোরীবাঈকে বশীভূত ক'রবার জন্তে যে সব অলঙ্কার ও টাকাকড়ি শ্যামজী দিয়েছিলেন সেগুলি দরোয়ানকে ঘুস দিয়ে কিশোরী পালিয়ে

যায়। কিশোরী স্বামীর পায়ে পূর্ণ অধিকার পেয়ে, স্বামীর ভালবাসা পূর্ব্বের মতই অকৃত্রিমভাবে পেয়ে শির উচ্চে তুলে' দাঁড়িয়েছিল; বাধা, বিপত্তি, ভয়কে অবজ্ঞা ক'রে নারী-লাঞ্ছনা মোকদ্দমা ক'রেছিল। সে মোকদ্দমায় যদিও শ্যামজী বহু অর্থ ব্যয়ে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন, কিন্তু অপমান ও জঘন্য দুর্ণামের হাত হ'তে রক্ষা পান নি। ভদ্রসমাজ উপেক্ষা করে, ভদ্রমহিলারা তাঁর ত্রিসীমানায় আসে না এবং এত বড় অপমান ও দুর্ণামে শ্যামজীর স্ত্রী ফাঁসে ঝুলে আত্মহত্যা করেন।

প্রবাদ আছে 'মরলেও স্বভাব যায় না।' শ্যামজীর স্বভাবও বদলালো না, ফাঁস লটকিয়ে স্ত্রীকে মরতে দেখে শ্যামজী একটু দমে গিয়েছিলেন, মানে স্ত্রীর প্রেত-আত্মার ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকতেন, এমন কি রক্ষিতাদের বাড়ি গিয়ে রাত কাটানো দূরের কথা, চাকরবাকর নিয়ে নিজের ঘরে শুতে ভয় পেতেন। স্ত্রীর আত্মা স্বপনঘোরে শাসিয়ে যেতো, স্ত্রীর ভয়ে তিনি কিশোরীবাঈকে পুনঃ ধরে আনা ও তার স্বামীকে অত্যাচার ক'রে প্রতিশোধ নেওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ ক'রতে বাধ্য হ'য়েছেন। রোজ তিন বেলা কোনভাবে গায়ত্রী জপতেন সচকিতে চারিদিকে চেয়ে, অবশ্য পূর্ব্বে পৈতে ছিল না, নতুন তৈরি ক'রে নিতে হয়েছিল। ক্রমে মনের বিভীষিকা কেটে গেছে, গায়ত্রী জপবার সময় হ'য়ে ওঠে না, সন্ধ্যা-আহ্নিকের পুঁথিপত্তর, সরঞ্জাম আবার কোণঠাসা হ'য়ে পড়েছে, পৈতেটা এখনো গলায় আছে।

সবাই ভেবেছিল, এমন কি কু-পথের সাহায্যকারী মোসাহেবের দল বিশ্বাস ক'রেছিল যে শ্যামজীর পত্নী-বিয়োগে আমূল পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে। শ্যামজী পত্নীশোকে সত্যই বড় কাতর হ'য়ে পড়েছেন; সতীর আত্ম-ত্যাগে স্বামীর জীবন পুণ্যপথে পরিবর্ত্তিত হলো; ধর্ম্মে মতিগতি হচ্ছে, কোনদিন হয়ত সর্ব্বস্বত্যাগ ক'রে সাধু হ'য়ে যাবেন। যক্ষ্মা-রোগী

যেমন চিকিৎসায় ও স্থানের গুণে সাময়িক ভাল হয়, তেমনি শ্যামজীর মতিগতি হঠাৎ বিশৃঙ্খলতা ও ভীতিতে জড় হ'য়ে পড়েছিল মাত্র।

গঙ্গাবতী চরিত্রহীন পুরুষের উৎপাতে টি'কতে না পেরে শ্যামজীর মিলে এসে চাকরি নিলে। সুন্দরীদের জয় সর্ব্বত্র, সর্ব্ব সময়ে। গঙ্গাবতীর কাজ মেলাতে কোন বেগ পেতে হয়নি; সাদরে তাকে মিলে কাজ দিলে, যদিও সে কুলি রমণী এবং কোন নির্দ্দিষ্ট কাজে দক্ষা বলে খ্যাতিলাভ করে নি।

কয়েক হপ্তা এমনি কাটলো। গঙ্গাবতী কাজে আসে, আপন মনে কাজ করে, হপ্তা শেষে মজুরী নিয়ে বাড়ি ফেরে। হঠাৎ গঙ্গাবতী শ্যামজীর শ্যেন দৃষ্টিতে পড়ে যায়। যেমনি পূর্ণ-যৌবন চারিদিক ছেয়ে ঢেউ খেলে কেবলি আবর্ত্তন ক'রে তোলে রূপ মাধুরিমা—তেমনি তার স্বাচ্ছন্দ্য, সরল, স্বাভাবিক চরিত্র লোককে করে উদ্‌ভ্রান্ত। এত রূপ, এত বড় অসহায়তা লোককে যেমনি মুগ্ধ করে অতিমাত্রায়, তেমনি আবার সাহস-ভীতির মানসিক দ্বন্দ্বে সাহসকে ক'রে দেয় বেপরোয়া। শ্যামজী এত বড় মূল্যবান অথচ সহজ শিকার হাতের কছে পেয়ে নিজেকে সংযত ক'রতে পারলেন না, কামানলে আগুনের হলকার মত হ'লেন চঞ্চল, দিবা-রাত্র মন যেন বলে গঙ্গাবতীর যৌবন, রূপ, নারী দেহ—শুধু তারই জন্ম সৃষ্ট হ'য়েছিল, তাই সে স্বামী অনাদৃতা, তারি নিকট আশ্রয় প্রার্থিনী। গঙ্গাবতী নিরাশ্রয়া ব'লে কাম বাসনাকে আর সংযত ক'রলেন না, চেষ্টাও ক'রলেন না।

একবার নাকালের চূড়ান্ত হ'য়ে এখন সাবধান হ'য়ে গেছেন, কুলিমজুর রমণীদের দেহটা যে মিলের সম্পত্তি নয়, তা বুঝতে পেরেছেন। এবার কাঁচা কাজ ক'রলেন না, পথঘাট বেঁধে লোক লাগিয়ে প্রথম গঙ্গাবতীর খবর নিলেন ভাল ক'রে। তাঁর অনুচররা

গঙ্গাবতীর ইতিহাস জোগাড় ক'রে নিয়ে এলো। গঙ্গাবতী যদিও স্বামী-পরিত্যক্তা, গরিব, সন্তানের আহার যোগাড় ক'রতে পারে না—কিন্তু বড় তেজস্বিনী, সতীত্ব জ্ঞান বড় প্রখর, দু'তিনটে মিলের কাজ ত্যাগ ক'রে চলে এসেছে। সতীত্বে, নারীত্বে একটু ঘা পড়লে এখান থেকেও অতি সহজে চলে যেতে পারে। শ্যামজী এবার অন্য পথ ধরলেন। ধীরে ধীরে বিষ খাইয়ে যেমনি মানুষকে নির্জীব জড় ক'রে শেষটায় মৃত্যুর মুখে ফেলে দেয়, মানুষ নিজের মহা সর্ব্বনাশের কথা বুঝতে পারে না, তেমনি গঙ্গাবতীকে নির্জীব জড় ক'রবার জন্য শ্যামজী প্রেমের অভিনয় আরম্ভ ক'রলেন; গঙ্গাবতীকে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ ক'রাবার জন্য চারিদিকে মায়াজাল ফেলতে লাগলেন।

কুলিবস্তি পরিদর্শন ক'রবার কোন প্রয়োজন পড়ে না, যদিও পুঁথিপুস্তকে নিয়মকানুন আছে—তবু কেউ মেনে চলেন না। কে যেতে চায়—সুখের সময় অপব্যয় ক'রবার জন্যে নোংরা বস্তি পরিদর্শন ক'রতে। স্যাঁৎসেতে ঘরদোর, আলো নেই, নর্দ্দমা পচা, আবর্জ্জনা পচা, দুর্গন্ধময় বিষাক্ত বাতাস, বস্তির ঘরে ঘরে অসুখ বিসুখ। ঘরে ঘরে অশান্তি, দুঃখদুর্দ্দশা, বিশৃঙ্খলা, হাহাকার। মাতাল নরনারীর বীভৎসতা, মাতাল চরিত্রহীন লোকের পাশবিক অত্যাচার অবলা স্ত্রীর ওপর। যার ঘরে সুন্দরী যুবতী তার ওপর চরিত্রহীনদের অত্যাচার, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে কলঙ্ক। সমাজে ভদ্র মুখোস পরে' ভেতরে ভেতরে পাপের ব্যবসায় চালায় নিজের স্ত্রী-কন্যা দিয়ে। অবশ্য সমাজে ভাল লোকও আছে, সে খবর আড়ম্বর ক'রে জানাতে বসি নি, অন্যায়, অত্যাচার, হীনতা, পাপের চিত্রই দেখাবো। কলে টিপ্ টিপ্ ক'রে অল্পক্ষণের জন্য জল পড়ে—তা নিয়ে ছেলে বুড়োদের হৈঁচড়া হেঁচড়ি, ঝগড়া ঝাঁটি রোজই

হয়। মাঝে মাঝে বাক্‌যুদ্ধ থেকে চড়াচড়ি, খাঁমচা-খাঁমচি, চুলাচুলি, ভাল ক'রে মারামারিও হয়। অভাব অনাটন, রোগ শোক, দুঃখ দুর্দ্দশায় একঘেয়ে জীবন চালাতে চালাতে আর পারে না, স্বভাব আপনিই খিটখিটে হ'য়ে যায়। এরা যখন তখন ঝগড়াঝাটি করে—আবার পর-মুহূর্ত্তে সব ভুলে যায়, বিচার-বুদ্ধিহীনতা বশতঃ মনের কোণে সব কিছু পেঁচিয়ে রাখতে পারে না—সরলতার মুখোস পরে' ভয়ঙ্কর হ'তে পারে না।

পানীয় জল এক ফোঁটা মিলাতে পারে না, জলের কারখানা থেকে যে নর্দ্দমা বস্তির গা ঘেঁসে চলে গেছে, তারই অপরিষ্কার জলে সারা গ্রীষ্মকাল সব কাজ চালায়, এমনই জলের অভাব। আবার বর্ষাকালে জলের বন্যা বয়, অজস্র বারিধারা রোধ করা যায় না। ছাদের সর্ব্বাঙ্গ ফাঁক, ফাটা। নর্ত্তকীর মাতাল নৃত্যের মত ঝম্ ঝম্ করে বর্ষার জল পড়ে, সে জল ঝপ্ ঝপ্ ক'রে ছাদের শত ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকে যেন বন্যা বসাতে চায়। বিছানা পাতবার মত ঠাঁই পাওয়া ভাগ্যের কথা, গুটিয়ে রাখবার মত স্থান মেলে না। অবশ্য মিলের বাবুদের (কর্ম্মচারী—Officer) জন্যে যে সব বাড়ি ক'রে কোয়ার্টার করা আছে এবং আড়ম্বরভূষিত ক'রবার জন্যে বাঙ্গলো নাম দেওয়া হ'য়েছে—সেগুলির অধিকাংশই সংস্কারের অভাবে বিশ্রী অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, দাঁড়াচ্ছে। বৃষ্টি নামলে জিনিষপত্তর নিয়ে টানাটানি ক'রতে হয়, রাত্তিরে বিছানা গুটাতে হয়।

কুলিমজুরদের এমনই দুর্দ্দশা! আবেদন, নিবেদন বহুবার হ'য়েছে—কোন ফল হয়নি, আবেদন-পত্র নষ্ট কাগজ-পত্রের সঙ্গে নষ্ট হয়; বিনীত আবেদন, দয়া, অনুগ্রহ, যাচ্ঞা ব্যর্থ হয়। কেউ কোন খোঁজখবর নেয় না—জানালেও কর্ণপাত করে না। বহুদিন যাবৎ এমনি চলছিল, হঠাৎ কর্ত্তৃপক্ষ অনুগ্রহ ক'রলেন, কুলিমজুররা আশা ক'রলে এবার

কর্ত্তৃপক্ষের দয়া হ'য়েছে, কারণ এবার মিলের খুব লাভ হ'য়েছে। শেষ পর্য্যন্ত কেবল দশ নম্বর বাড়ি—যেখানে গঙ্গাবতী বাস ক'রছে, সেটার পুনঃ সংস্কার হলো। এ পাড়ায় জলের খুব অভাব, যদিও অন্য পাড়ায় একই অবস্থা—তবু কেবল এ পাড়াতে দশ নম্বর বাড়ির সম্মুখে কল বসানো হলো। বস্তিতে গঙ্গাবতীর বাড়ির চেয়ে বহু বাড়িই খারাপ, তথাপি কেবল গঙ্গাবতীর বাড়ি মেরামত হলো—কুলিমজুররা বহুবার আবেদন ক'রেছে, এবারও আবেদন ক'রেছিল—তবু তাদের বাড়ি মেরামত হলো না; আর গঙ্গাবতীর বাড়ি বিনা আবেদনে, একটু ভাল থাকা সত্ত্বেও মেরামত হলো দেখে সকল লোক চটে গেলো।

মনের আক্রোশে কুলি পুরুষরমণীরা শ্যামজীর ও গঙ্গাবতীর নামে কুৎসা রটাতে আরম্ভ ক'রলো। কুৎসায় মুখ ভরে, গেয়ে সুখ পাওয়া যায়। কুৎসা অসম্ভব রকম অশ্লীল ক'রে যতই আলোচনা করুক, তৈরি করুক, কিন্তু কোন প্রতিকার ক'রতে পারলো না এরা। শ্যামজীকে মিলের বিধাতাপুরুষ বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না। মিলে চাকরি ক'রতে হলে তাঁর সুখ্যাতি গেয়ে তোষামোদ ক'রতেই হবে, এ ভিন্ন অন্য কোন পথ নেই। এরা ভেতরে ভেতরে খুব জ্বলে পুড়লো, কিন্তু বাইরে পোষা কুকুরের মত পায়ে লুটিয়ে পড়লো। যখন শ্যামজী বল্‌লেন যে দশ নম্বর বাড়িতে একটা খারাপ রোগী মরেছিল অতএব চূণ (white wash) না লাগালে বিষাক্ত বীজ ছড়াতে পারে (আমরা জানি, কুলিরাও জানে যে দশ নম্বর বাড়ির অপর অংশে অর্থাৎ ১০বি বাড়িতে একটি যক্ষ্মা রোগী দু' বছর পূর্ব্বে মারা গিয়েছিল, দু' মাস পূর্ব্বেও দশ নম্বরে লোক বাস ক'রে গেচে); তারপর একটা বড় ডাল ছাদের ওপর এসে বাড়িটা নষ্ট ক'রে দিচ্ছে, বহু খোলা ভেঙ্গে গেছে, সময়মত না সারালে বাড়িটাই নষ্ট হ'য়ে যাবে, তাতে মিলের বহু ক্ষতি হ'বে। বড়বাবু হুকুম দিয়েছিলেন—

পূর্ব্বেই সারাতে, ব্যস্ততায় হ'য়ে উঠেনি। বর্ত্তমানে এ দুর্দ্দিনে মিলের এমন ক্ষমতা নেই যে সকল বাড়ি মেরামত করা যেতে পারে! কর্ত্তৃপক্ষের নজরে পড়েছে, ভবিষ্যতে সমস্ত বাড়িই পুনঃ মেরামত করা হবে।...

শ্যামজী গঙ্গাবতীকে কোন প্রলোভন দেখালেন না, পদস্খলিত ক'রবার জন্য ফুসলাতেও চেষ্টা ক'রলেন না। অদৃশ্য ক্ষমতার মত অলক্ষ্যে থেকে মজুরী বেশি ক'রে দেওয়াতে লাগলেন, ঘরদোর ভাল ক'রে দিলেন, জলের সুবিধে ক'রে দিলেন। মিলের খাটুনিও একটু কমিয়ে দিলেন। বড় আশা ক'রে বস্তি পরিদর্শন ক'রতে কয়েক দিন গিয়েছিলেন; প্রবল ইচ্ছা ছিল—গঙ্গাবতীর সঙ্গে আলাপ-সালাপ ক'রবার, কোন সুবিধে হয়নি। কুলিমজুররা ঘিরে থাকে সর্ব্বদা এবং গঙ্গাবতী কোন গ্রাহ্যই করে না। গঙ্গাবতী এমনই তেজস্বিনী, এমনই স্বাধীন, স্পর্দ্ধিতা রমণী যে চাকরির মায়ায় লোক-দেখানো তোষামোদ পর্য্যন্ত করে না। গঙ্গাবতীর বাড়ি গেলেন, সমস্ত কুলিমজুর যোড়হাতে কম্পমান অবস্থায় স্বার্থের জন্য অপরের অখ্যাতি রটিয়ে নিজের সুখ্যাতি গেয়ে গেয়ে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছিল—ছোটলোকের পক্ষে অপরিচিত ভদ্রলোককে যেটুকু সম্মান দেখানো উচিত, তা পর্য্যন্ত গঙ্গাবতী দেখায়নি, অনুগৃহীতা বলেও একটু বিনয় দেখায়নি। সমস্ত কুলিমজুর শ্যামজীকে পেয়ে জীবন ধন্য মনে ক'রেছিল, আর গঙ্গাবতী পথের লোকের মত নিরপেক্ষ উদাসীন ভাব দেখিয়াছিল, গ্রাহ্যই যেন করেনি।

শ্যামজী যদিও অন্তরে অন্তরে ভীষণ ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন, ধৈর্য্য রাখতে অক্ষম হয়ে পড়লেন, তবু প্রাণপণে নিজেকে সরিয়ে রাখতে লাগলেন। হাতে পাওয়া, মুষ্টিবদ্ধ জিনিষ পেয়েও যেন এখনই খেতে পারছেন না; খেতে অসুবিধা নেই, নিজের কোন আপত্তিও নেই, কোন বাধাও নেই—

তবু যেন কেন খাওয়া হ'য়ে উঠছে না। লোভ, আফ্‌শোষ, সাহস ও ভয়ের মাঝে যে কার্য্য সম্পন্ন ক'রবার শক্তিটা জড় আছে তা বুঝতে পারেন না। কার্য্যকরী শক্তিটা যে জড় আছে তা বুঝবার মত মনের গভীরতা নেই, প্রসারতা নেই। তাই গঙ্গাবতীর স্বেচ্ছাকৃত উপেক্ষায়, অপমানে এক একবার বারুদের মত জ্বলে উঠেন, বুঝতে পারেন যে আশা এখনও পূর্ণ হয় নি, অভাব কেবল তীব্রই হচ্ছে—পূরণের দিকে একটু এগিয়ে যায় নি, তখনি নিজের মনে হুকুম করেন—গঙ্গাবতীকে চুলের মুঠা ধরে টেনে আনবার জন্য। দেয়ালে তাঁর কথার প্রতিধ্বনি হয়, ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি মিলে বিকট স্বর ধরে।

শ্যামজী নাটকীয় ভঙ্গীতে ঘরে পদচারণ ক'রতে ক'রতে ভাবেন, হাত-পা' নেড়ে বলেন যে গঙ্গাবতীর এলো খোঁপার ঝুঁটি ধরে হিঁচড়ে টেনে এনে দেখিয়ে দেবেন যে তিনি বীরপুরুষ—আর সে অবলা নারী, তিনি অসীম ক্ষমতাশালী, ক্রোড়পতি, রাজা—আর সে দুর্ব্বলা ভিখারিণী, প্রজা, দাসী। আভিজাত্যচালে হাত নির্দ্দেশ ক'রে বলেন যে, তার জন্ম হুকুম ক'রবার জন্যে—মনের খেয়াল মেটাবার জন্যে—মনের তীব্র ক্ষুধা মেটাবার জন্যে—আর গঙ্গাবতীর জন্ম—হুকুম নীরবে, সন্তুষ্টচিত্তে পালন ক'রবার জন্যে, সন্তুষ্টচিত্তে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে খেয়াল মেটাবার জন্যে। যতদিন ক্ষুধা মেটাতে পারে ততদিন প্রতিদান পাবে ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি; তারপর পাঁকের ফুল পাঁকে গিয়েই পচবে। গঙ্গাবতীর কত বড় সৌভাগ্য যে শ্যামজী খাটো হ'য়ে তারি দুয়ারে এসে দাঁড়ান; তিনি ইচ্ছে ক'রলেই মুহূর্ত্তে এই স্পর্দ্ধিতা, দুর্ব্বিনীতা, অপরিণামদর্শিনী, বাতুল-তুল্যা নারীকে দাসী ক'রে সাজানো-ঘর আলো ক'রতে পারেন—আর সে কিনা গ্রাহ্য করে না, ভ্রূক্ষেপও করে না!

শ্যামজী জ্বলে উঠে নিজেই দগ্ধ হন, যত সহজ মনে ক'রতেন তত সহজ আর মনে হয় না ; হতাশে ক্রোধানলে বল, কৌশল প্রয়োগ ক'রতে চান, শেষ পর্য্যন্ত আর সাহসে কুলিয়ে উঠতে পারেন না। কিশোরী-বাঈ সে শক্তি চূর্ণ ক'রে দিয়ে নিরুদ্দেশ হ'য়েছে। পশুত্বের কার্য্যকরী উগ্রতা কিশোরীবাঈ বিভ্রান্ত ক'রে দিয়েছে; বড় হুঁসিয়ার ক'রে দিয়েছে ; বড় দুর্ব্বল, সন্দিগ্ধ ক'রে দিয়েছে ; মোসাহেবরা উৎসাহ দেয়, কবিত্বপূর্ণ রূপের বর্ণনা করে, বিশ্রী কথা বলে ক্ষিপ্ত করে, উৎসাহ দেয়, সাহস দেয়, উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ কেউ বের ক'রতে পারে না। বোতলের পর বোতল মদ খায়, কল্পনায় গঙ্গাবতীকে জোর ক'রে ধরে আনে কেউ, কেউ ফুসলিয়ে আনে, কেউ আনে রোমান্স করে, গঙ্গাবতী হাসতে হাসতে আসে, শ্যামজীকে মদ দেয়, নিজে খায়, নাচে, দেহ প্রদর্শন ক'রতে ক'রতে শ্যামজীর কোলে ঢলে পড়ে ইন্দ্রপুরীর অপ্সরার মত। মাতালের যখন ঘুম ভাঙ্গে, নেশার ঘোর কাটে, তখন হাতের পাশে কিছু খুঁজে পায় না, কথার প্যাঁচ আর চলে না। দিনের খোলা স্পষ্ট আলোকে নারীহরণ ভয়টা একটু জটিল হ'য়ে নয়নে ঠেকে। শেষ পর্য্যন্ত আশা থাকে শুধু।

আট

ভো ভো-ভো করে' বিকট নিনাদে কলের বাঁশি গম্ভীরভাবে দীর্ঘক্ষণ ধরে বাজে। শ্রমিকদল অলস শয্যা ছেড়ে উঠে। নিমের ডাল ভেঙ্গে দাঁতন করে, হাত মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি সস্তা নিলামী জামা কাপড় পরে, পাগড়ী বাঁধে বা টুপী পরে, নিলামী জুতা পায় দেয়, মধ্যাহ্ন ভোজনের খাদ্য—লোহার বা পেতলের কৌটায় ভরে হাতে ঝুলায়, দল ক'রে ঊর্দ্ধমুখে মিলে ছুটে যায়। ছুটছে, কেমন ক'রে ছুটছে! ওদের চলার ভঙ্গিমাটাই আলাদা। দুপুর রোদে বা বৃষ্টিতে এরা যখন খাবার জন্যে বাড়ি ফেরে তখন এদের দেখতে খুব আশ্চর্য্য বোধ হয়। কী ভীষণ ভিড়! রাস্তা ভরে যায়, পাশ কেটে বের হওয়া খুব কঠিন। শাঁ-শাঁ বেগে ধেয়ে চলে। ভারত-মহাশ্মশানে যে এত বড় একটা সজীব জাতি জীবিত আছে তা চাক্ষুষ না দেখলে কল্পনা করা যায় না। এরা যখন মিলে কর্ম্মরত থাকে তখন এদের কোন ব্যক্তিত্ব থাকে না, সজীব বলে বুঝা যায় না, কল-কব্জার একটা অঙ্গ বলে মনে হয়; বাইরে, বিশেষতঃ যখন এক ঘণ্টার ছুটীতে বাড়ি যায় তখন এদের দেখে মনে হয় এরা অন্য কিছু, মহা সজীব প্রাণী। এদের সঙ্গে অপর ভারতবাসীর মিল আছে শুধু দেহের কাঠামোতে। এদের গতি যেন দুর্দ্ধর্ষ, অপ্রতিহত, অপরাজেয়। সুপ্ত কামানের গোলাগুলি যেমন উত্তাপ পেলে ভীষণভাবে দুর্দ্ধর্ষ রূপ নিয়ে ছুটে, ঠিক তেমনি। ঝড়ো ঝঞ্ঝা, উত্তপ্ত সূর্য্যভাতি,

সান-ষ্ট্রোক, নির্জীব শীতের ভয় নেই। গট্-গট্-গট্ ক'রে রুদ্র ছন্দে চলে যায়। এদের সজীবতা দেখে নির্জীব, জড়ের প্রাণেও বুঝি সজীব হ'বার স্পৃহা, কর্ম্মস্পৃহা প্রবলভাবে জেগে উঠে।...

শ্রমিকদল মিলের সরু গেটের পাশে এসে দাঁড়ায়; বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, রাস্তার ধারে বসে। সরু দ্বার লোহার পাত দিয়ে দু'ভাগে বিভক্ত করা হ'য়েছে, উদ্দেশ্য কুলি মজুররা যদি কোন জিনিষ লুকিয়ে নেয়—তবে লোহার পাতে লেগে বেজে উঠবে এবং চেক ক'রবার সুবিধে। দ্বারে তিন চার জন নেপালী বা ভুটিয়া দারোয়ান দুর্দ্ধর্ষ ভীষণাকৃতি চেহারা নিয়ে বসে থাকে। শ্রমিকদল এক এক জন ক'রে হাতে বা কোমরে ঝুলানো তাম্রখণ্ডে মিলের ক্রমিক নম্বর দেখিয়ে ভেতরে ঢুকে। দিন-মজুররা রোজ কাজ পায় না, কিন্তু রোজ মিলে এসে হাজিরা দিতে হয়। রোজ হাজিরা না দিলে অন্য দিন কাজ পাবার আশা থাকে না। কে, কবে, কখন কাজ পাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই, তাই বহু দূর থেকেও রোজ দেখা দিয়ে যায়। যদিও জানে যে সে কাজ পাবে না, তবুও আসে যদি দুঃখ, অভাব জানিয়ে কাজ পায়। যারা কাজ পায় তারা ব্যস্তভাবে কাজে লেগে যায়, আর যারা কাজ পায় না গেটের বাইরে হল্লা করে, যাকে খুশি অভিসম্পাত করে, পেটের ক্ষুধায় ক্রোড়পতিদের মুণ্ডপাত করে; অপরকে গালাগাল দিয়ে গায়ের ঝাল মিটায়, তারপর অন্য পথে চলে।

ফেরার পথে এদের আর সজীব জাতি বলে মনে হয় না, আলাদা একটা জাত বলে মনে হয় না—ভারতবাসী বলেই মনে হবে। এদের প্রাণে নেই আশা, নেই ভরসা, হাওয়ার কোলে নিজেকে ছেড়ে দেয়, জানে না পরিণতি, জানেনা কোথায় নিয়ে যাবে ঝড়ো-হাওয়া? শূন্যেই লয় পাবে—না অতল গর্ভে নিমজ্জিত হবে, না কোন উর্ব্বর ক্ষেত্রে শিকড় গাড়বে?

দেহে যেন প্রাণ নেই, মনে বল নেই, বিবেক, বিচারবুদ্ধি জ্ঞান নেই, চরিত্রে দৃঢ়তা নেই; দারিদ্র্যের ভয়ঙ্কর ক্রূর মূর্ত্তিকে দেখে প্রাণ অব্যক্ত ভীতিতে, বেদনায় করে ঢিব্-ঢিব্, মনে হয় অসাড়, জড়; শক্তি যায় হারিয়ে, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হ'য়ে পড়ে শিথিল। এবার চলার পথে জীবন্ত, সজীব মূর্ত্তি ফুটে উঠে না, জুতার ঠক্-ঠক্-ঠক্ একতারায়, রাস্তার নির্জীব লোকদের আর চেতনার সাড়া জাগিয়ে দেয় না; ওদের চলার ভঙ্গীতে শুধু ভেসে উঠে—ব্যর্থতার, অভাবের, অনাচারের মর্ম্মান্তিক চিত্র, চলার শিথিল শব্দে জানায় হাহাকারের করুণ বেদনা। এদের দেখে কে বলবে যে এরাই খানিক আগে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে জানিয়ে গিয়েছিল—ভারত মহাশ্মশান নয়, আজো সব নির্জীব, জড় হ'য়ে পড়ে নি। শ্রমিক দল এখনো ভারতের বুক থেকে মুছে যায় নি, জেগে আছে, এখনো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বুকের রক্ত জল ক'রে যায় অত্যাচারীদের জন্যে। বুকের রক্ত দিচ্ছে কি-না বুঝে না, বুঝলেও কেন দিচ্ছে তা বুঝে না—

যাক্ সে কথা—শ্রমিকদল—যারা কাজ পেলে না—তারা যদিও ঘরের কথা মনে ক'রে মাথায় হাত দিয়ে বসে, তবু আশা রাখে রাত্তিরে হয়ত' কাজ পাবে, তখন এমনি ভাবে চলবে না; আবার চলবে বেগে, আশা ভরসা, কল্পনার উজ্জ্বল ছবি মুখে এঁকে দপ্-দপ্ ক'রে পা ফেলে। যাবে এ পথেই, তখন চলবে না টলতে টলতে, হয়ত' দেহ মন লেপটিয়ে পড়বে না। এদের যাওয়া ও আসার মাঝে কত বড় সমস্যা, কত বড় উত্থান পতন। হয় ত' আপনারা কেউ ভাবতে পারেন এমন কি বড় সমস্যা—বড় উত্থান পতন? নয় একদিন কাজ নাই বা পেলে, এক একটা কুলি মজুর কি কম টাকা রোজগার করে!—আমি বলি—স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—যে, কোন জাতি বা শ্রেণীকে বিচার ক'রতে হলে ওদের মন ও চোখ নিয়ে বিচার করা উচিত। প্রায় প্রত্যেক কুলি মজুর মাসে চল্লিশ, পঞ্চাশ টাকা

রোজগার করে, অবশ্য কেউ পনেরো টাকা, কেউ সত্তর আশী টাকাও রোজগার করে। অবসর, বিশ্রাম, আমোদ, উৎসব—হীন, এক কথায় বৈচিত্র্যহীন জীবনে মিলের অত্যধিক পরিশ্রমের পর যখন কুলি মজুর স্ত্রী-পুরুষরা হপ্তা শেষে মাইনে পায়, তখন ক্ষণিক আমোদের লোভ সম্বরণ ক'রতে পারে না। অশিক্ষিত স্ত্রীপুরুষ মজুররা বোতলের পর বোতল মদ খায়, হল্লা করে। এর চেয়ে বড় উৎসব, ফুর্ত্তি এদের আর জানা নেই। অদৃশ্য দৈহিক দুর্ব্বলতা এমনিভাবে এদের সর্ব্বনাশ করে। তাই এদের রোজ কাজ পাওয়া চাই, নইলে ভুক্ত-অভুক্তর মস্ত বড় প্রশ্ন উঠে।... এরা যে প্রাণ দিতেই জন্মে, অন্যমনস্কের খেয়াল কতক্ষণ থাকতে পারে? তা হ'লে জাগরণের সাড়া জানাবে কে, মরণ মন্ত্র গেয়ে গেয়ে মাতাল হবে কে, ভারী ভারী লোকদের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা মেটাবে কে? এরা জগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, এরাই শ্রোতা, এরাই গায়ক, এরাই জাগায়, এরাই চিরদিনের জন্যে ঘুম পাড়ায়। এরা অপরকে বাঁচিয়ে রাখে, অপরকে জাগায়; নিজেরা কি বাঁচতে শিখবে না, নিজেকে কি জাগাবে না? শুধু কি দেবেই, নিজেরা—নেবে না কিছু সম্পদ? অমৃত বিলায়ে কি শুধু বিষই পান ক'রবে?

ফটকের ভেতর—ধপ্-ধপ্-ধপ্, ঘ্যান্-ঘ্যান্-ঘ্যান্, কড়্-কড়্-কড়্, কত কি বহু স্বরে এন্‌জিন্ চলছে, ছোট, বড়—কত শত যন্ত্রপাতি চলছে। বিরাট ব্যাপার! অনভ্যস্ত চোখ উঠে টাটিয়ে, কাণ যায় বিকল হয়ে।

এক দিকে তুলা দিচ্ছে, অন্য দিক দিয়ে সূতা বের হ'য়ে আসছে। মোটা, সরু, মাঝারি, কত রকম! ঠাস্-ঠাস্-ঠাস্ ক'রে মাকু চলছে; হাজার হাজার কাপড় তৈরি হ'য়ে বেরুচ্ছে। দরজা, জানালা দিয়ে বাতাস ঢুকে সূতা ছিঁড়ে দেবে বলে সব বন্ধ, বাতাসের চলাচল

স্বাভাবিক নেই, লোকের শ্বাসপ্রশ্বাসে, সজীব জীবের চলাচলে ঘরের বাতাস হ'য়ে যায় ভীষণ গরম, বিষাক্ত। শীতের সময় সূতা শক্ত হ'য়ে যায় তাই ক্ষণে ক্ষণে Steam (উত্তপ্ত জলের ভাপ) ছাড়া হয়। মাঘ মাসেও শ্রমিকদের গা থেকে টপ্ টপ্ ক'রে ঘাম পড়ে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না; পা টন্ টন্ করে, শরীর ঝিমিয়ে আসে, বিশ্রামের জন্যে অস্থির হ'য়ে পড়ে। তবু দাঁড়িয়ে থাকে, কাজ করে, বেশি ক'রে কাজ ক'রতে চায়; ঘরের ভাবনা যে হৃদয়ে অত্যাচার করে।...

চামড়ার কারখানা। গাড়ি ভরে ভরে কাঁচা চামড়া, শুকনো দুর্গন্ধময় চামড়া আসে। চামড়াগুলি চুণের জলে পচানো হয়, পচানো চামড়া কাঠের ওপর ফেলে ছুরি দিয়ে ঘসে ঘসে লোম ও মাংস পরিষ্কার করে। যেমনি দুর্গন্ধ, তেমনি নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর। সে চামড়া গাছের ছাল বা রসায়ন দ্রব্য দিয়ে ট্যান্ করা হয় (Vegetable and chrome tanned leather); সে চামড়া থেকে হয় বাক্স, জুতা, মনি-ব্যাগ, কত কি জিনিস। সে সব জিনিস বাক্সে বোঝাই ক'রে দেশ বিদেশে চালান দে'য়া হয়। দু'কথায় ত' চামড়ার কলের কথা শেষ ক'রলাম; তাতে কুলি মজুরের দুর্দ্দশার কথা মোটেই বোঝা যায় না— বরঞ্চ গতর খাটিয়ে ভাল ক'রে জীবন চালাতে পারে। কিন্তু হয় না। মিলের বর্ণনা করা এখানে সুবিধে হবে না এবং উপন্যাস পড়তে গিয়ে অনেকেই পছন্দ ক'রবেন না। তাই একটু বলে রাখি যে চামড়ার কলে কাপড়ের কলের মতই অহরহ দুর্ঘটনা (accident) হয় এবং খুব বলিষ্ঠ লোক (কুলি মজুর) দশ ঘণ্টা কাজ ক'রে দশ আনার বেশি রোজগার ক'রতে পারে না।

লোহার কারখানা—এটা আরো ভয়ঙ্কর। এখানে টাকা উৎপন্ন হয় শ্রমিকের আয়ুর বিনিময়ে। খনিজ লোহা (iron ore) গাড়ি গাড়ি

বোঝাই হ'য়ে আসে, চুল্লীতে (furnace) গলানো হয়, গলিত লোহা নল বেয়ে বেরিয়ে আসে। লোহা গুণ অনুসারে তিন প্রকার হয়, এক এক প্রকার লোহা দিয়ে হাজার হাজার রকম জিনিষ তৈরি হয়। লোহার গুণ বলে শেষ করা যায় না। একজনের স্মরণ শক্তিতে লোহার এতগুলো গুণ একসঙ্গে থাকতে পারে না। লোহা না থাকলে মানুষ ও পশুতে বিশেষ পার্থক্য থাকতো কি-না সন্দেহ। লোহা যদি না থাকতো, হতো না কৃষিকার্য্য, হতো না এন্‌জিনিয়ার, হতো না কর্ম্মকার (লোহার) হতো না সুখশান্তির পথ, হতো না সভ্যতা ; অতি আদি কালের মত মানুষে মানুষ খেতো, ঝগড়াঝাটি বর্ব্বরতা দিয়েই জীবন চালাতো। লোহা যদি না থাকতো, তবে উর্ব্বর মস্তিষ্কের ঘি বৃথাই শুকিয়ে যেতো। এই লোহা - যার গুণ শত শত মুখে গেয়ে শেষ করা যায় না, যার প্রয়োজন নিত্য পদে পদে—অথচ এত শ্রেষ্ঠ অমূল্য লোহা দৈনিক কত সহস্র লোকের রক্ত চুষে নিচ্ছে যে, তা লিখে শেষ করা যায় না।

যদি চিন্তা করা যায় তবে দেখা যায় লোহা কত মহা-উপকারী, অথচ কত সর্ব্বনাশী। লোহা নিজে লাখো লাখো, কোটি কোটি লোকের রক্ত পান করে না। কিন্তু লোহার জন্যেই শ্রমিকদলের রক্ত দিতে হয়। লৌহ কারখানার অনবরত জ্বলন্ত চুল্লীতে কাউকে তিলে তিলে ভাজে, কাউকে আংশিকভাবে, কাউকে সম্পূর্ণ ভেজে দেয়—আবার কাউকে সেদ্ধ ক'রে দেয়। ব্যাপার গুরুতর নয়, দৈব-দুর্ঘটনা (য়্যাক্‌সিডেন্ট)। য়্যাক্‌সিডেন্ট কথাটা ভুলে দিয়ে, স্বাভাবিক কথাটা ব্যবহার ক'রলে অবস্থার সঙ্গে বেশ মিল খাবে।

খনি ও সমুদ্রের তল কি প্রকার জানি নে, নাম শুনলেই পিলে উঠে চম্‌কে, সংক্ষিপ্ত আয়ু যায় আরো কমে। সাপের মাথার মণি নেবার মত। সাত রাজার ধন পাবে না, কিন্তু আন্‌তে হ'বে স্বত-

রাজার ধন, প্রতিদান পাবে যৎসামান্য মজুরী, নয় প্রতিকারহীন সাপের বিষ। সমুদ্র মন্থন ক'রে আনবে চুণি, পান্না, পাবে সামান্য মজুরী—দিতে হ'বে প্রাণ কুমীর, হাঙ্গর কত কি ভয়ঙ্কর জলজন্তুর নিকট। নামতে হ'বে খনিতে, মরতে হ'বে বিষাক্ত গ্যাসে, জ্বলন্ত খনিজ আগুনে, কখন বা নিষ্পেষিত হ'বে ধ্বসে-পড়া পাড়ের নীচে পড়ে। সর্ব্বত্রই দৈব-দুর্ঘটনা। দৈব-দুর্ঘটনার জন্যে কাউকে জবাবদিহি হ'তে হয়না। হ'লেই কি সে প্রাণগুলি ফিরে আসবে—না যাদের মারবার জন্য প্রস্তুত ক'রে রেখেছেন তাদের রক্ষা করা হ'বে। পায়ের নীচে পড়ে পোকা পিঁপড়ে কত মরে, কে তার খোঁজ রাখে, কি-ই বা তার প্রতিকার করা যেতে পারে, কোন জবাব দিতে হয় না কারো নিকট, মনের নিকটও নয়। এরা মানুষ, তাই দৈব-দুর্ঘটনা শব্দ তৈরি হ'য়েছে। প্রথম থেকে কি স্বাভাবিক, অবশ্যম্ভাবী কথাগুলি তৈরি হয় নি? এখনও আছে, চক্ষুলজ্জা আর কেন? সকলেই বুঝি মানেটা এবং চাইচিও—অতএব ব্যবহার ক'রলে কিছু সততার পরিচয়ই দেওয়া হ'বে। কুলিমজুররা অল্পই বুঝে! বুঝলেই বা কি, আসতে বাধ্য। প্রকৃতি তাদের এনে দেবে নিজস্ব-হীন ক'রে দিয়ে।

শ্রমিকদল নয় মরলই, মরবার জন্য যখন সৃষ্ট হ'য়েছে, কিন্তু এরা ভোগ ক'রতে পারবে না কেন? পূর্ব্বকালের দাসদের (slave) চেয়ে এরা কোন্ অংশে ভাল? পূর্ব্বকালে দাস নাম ছিল, এখন তাদেরই নাম হয়েছে শ্রমিক। পার্থক্য কোথায়? এরাই তৈরি করে, উৎপন্ন করে, এরাই হাতে তুলে দেয়, কিন্তু ব্যবহার করে অপরে, ভোগ করে অপরে, টাকা নেয় ক্রোড়পতিরা। এরা থাকে উলঙ্গ, অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় —অনশনে, অর্দ্ধাশনে—অথচ এদের হাতে গড়া জিনিষ ব্যবহার করে, অপব্যবহার করে অপর লোক। কে মানুষ? কে সভ্য? কে

উচ্চ, মহৎ লোক? যদি ভেবে থাক, তবে এর উত্তর দাও, পরখ হোক তোমার ক্ষমতার, তোমার মনুষ্যত্বের, তোমার সভ্যতার, তোমার মহত্বের। কেউ নেই, কেউ নেই; যদি কেউ থাকে—সে বারিবিন্দু মাত্র, শীতের হাঁড়িমুখো আকাশের ঝরে-পড়া মুক্তার মত শিশিরকণা, অরুণালোকে সহজেই শুকিয়ে যায়।

এদের জন্ম ত' অপমৃত্যু, দুঃখ, দুর্দ্দশা, যন্ত্রণা, অপঘাত ও অত্যাচারের সঙ্গে যুঝবার জন্যে; সভ্য দুনিয়ার এমনি মজার লীলা যে এরা চায় বাঁচতে, তাই যুঝে প্রাণপণ মৃত্যুর দুয়ার আশ্রয় ক'রে, অদৃশ্য শত্রুদের (ক্রোড়পতিরা) তৈরি পিছল পথে পা পিছলে মৃত্যুর দিকে যে এগিয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে পারে না, পারলেই বা প্রতিকার কি? গলায় ফাঁস লাগানো আছে, যে দিকে টান পরে সেদিকেই যেতে হয়। এরা জন্মেই ফাঁসির গ্রন্থিতে গলা বাড়িয়ে রাখে, জ্ঞানের সঙ্গে মৃত্যুর করালগ্রাসে ভয় পেয়ে পলাতে চায়, প্রতিকারের জন্যে যুঝে। যুঝাটা মনকে চোখ ঠারার মত।

আশ্চর্য্য হ'বার কিছু নেই, চমকে ওঠবার মত কিছু নেই, ভয় পাবার মতও নয়, ভাবনা চিন্তারও নয়, সভ্য জগতের সমস্যাও নয়। প্রায়ই উঠে চেঁচিয়ে, পাশের লোক ছুটে যায়, ধরাধরি করে মূর্চ্ছিত বা মৃত বা জখমযুক্ত শ্রমিকদের বাইরে নিয়ে আসে। কখনো কখনো কুলিমজুর টুকরো টুকরো হ'য়ে যায়, কখনো হয় নিষ্পেষিত। কী পাষাণভেদী আর্ত্তনাদ! কেউ কেউ আর্ত্তনাদ ক'রবার অবসর পায় না, কেউ কেউ মর্ম্ম পীড়া, জ্বালা অনুভব করে, প্রকাশ ক'রবার শক্তি আর পায় না; কেউ কেউ গোঁঙায়—গোঁ গোঁ ক'রে, কেউ মরণ আর্ত্তনাদ ক'রে অচেতন হয়, কখনো ভাঙ্গে ঘুম—কখনো আর ভাঙ্গে না। কী ভয়াবহ ব্যাপার। শুনলে আঁতকে উঠে প্রাণ, সে দৃশ্য দেখা যে কি, বলা কঠিন; ভাষা হারিয়ে

ফেলতে হয়। বেল্টে জড়িয়ে ঘুরতে লাগলো, বাড়ী খেতে খেতে টুকরো টুকরো হ'য়ে পড়লো, মানুষকে মানুষ বলে চেনা যায় না। পড়ে গিয়ে, মালের চাপায় পড়ে হাড় ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেলো—বিষাক্ত গ্যাসে দলকে দল মরে গেলো, খনির-চাপে জীবন্ত সমাধি পেলে, আগুনে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেলো, সমুদ্রের তলে জন্মের মত আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। বলা সহজ, লেখা সহজ, ধ্বংস করাও সহজ—কিন্তু তারা? যারা অহরহ যাচ্ছে, যাদের লোক যাচ্ছে—তাদের কথা কি সহজ? বড় কঠিন, বড় অভিশাপ!…এতে না আছে অনুতাপ, না আছে শোক, না পড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস, না দেয় আন্তরিক সান্ত্বনা, না দেখায় সহানুভূতি; অবশ্য যমরাজ্যে এরূপ প্রত্যাশা করা অনুচিত। এদের লোক দেখানো 'আহাঃ!' 'উঃ!' করার কি মূল্য আছে? যা'রা ধ্বংস হলো তা'রা কি ফিরে আসবে না তাদের অসহায়, দুর্দ্দশাগ্রস্ত পরিবারের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে? ছলনাময় সহানুভূতি কি মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ অর্থ দানে হয়? আইনে অনেক কিছু লেখা থাকে—কিন্তু ক'টা পরিবার আদালত ঘুরে এসে নিয়মিত মূল্য পায়? যে লোকই য়্যাক্‌সিডেন্টে মারা যায়, সে নিজের দোষে মারা যায় বলে আদালতে প্রমাণ হয় কেন? কারণ এরা অসহায়, গরিব, সাক্ষীর দল চাকরীর মায়ায় সত্য কথা বলতে সাহস পায় না। বড়োর সঙ্গে লড়বার দুঃসাহসই বা কার থাকে!

কী ভয়ঙ্কর অবিচার! কি নির্ম্মম অত্যাচার! এই সহানুভূতি—প্রাণের মূল্যের বদলে যে যৎসামান্য অর্থ দেওয়া হয়—এর চেয়ে ভণ্ডামী, খারাপ কাজ আর কি হ'তে পারে! অর্থ লোভ না দেখালে চলে, এদের ভুলাতে যে অর্থ দিতে হয় তাতে অন্য আমোদ চলতে পারে, এদের টাকা দিলেই কি—না দিলেই কি—আসবে, আসতে বাধ্য। একজন মরে গিয়ে যে স্থান খালি ক'রবে, সে স্থানে শত শত লোক এসে দাঁড়াবে। যাদের

পেট খালি তারা মৃত্যুর কথা কমই ভাবে, ভাবলেই বা প্রতিকার কি! শ্রমিকদের ত' কেউ চাবুক মারেনা, গলা চেপেও ধরেনা। তবু অন্ধকার রাত্রির মত সত্য সত্যই মৃত্যু আসে গুরুশ্রম হেতু; আসে ঝড়ঝঞ্ঝা অকস্মাৎ।

কারখানায় ডাক্তার সাহেব আছেন, ডিস্‌পেন্‌সারি আছে। ডাক্তার সাহেব কাটা-চেরা করেন, ক্ষতস্থান বাঁধেন, হাড় যোড়া লাগাতে চেষ্টা করেন, ওষুধ পত্তর দেন। রোগীরা বস্তির হাসপাতালে আশ্রয় পায়। ব্যাপার গুরুতর নয়; জখম হয়; ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পড়ে, ওষুধ পড়ে হাসপাতালে বিশ্রাম নেয়। দীর্ঘ কঠিন কাজের পর পরিবর্ত্তন— অবসর। ব্যাপার আজগুবি নয়, মারাত্মক নয়, আলোচনা ক'রবার মত নয়, পত্রিকায় লিখবার মত দরকারী খবর নয়। নিত্যি হচ্ছে, আদিকাল থেকে হ'য়ে আসছে, হবেও! যতদিন থেকে একদল লোক সভ্য হ'য়েছে, ততদিন যাবৎ চলে আসছে এবং যতদিন এমনি সভ্য, ক্ষমতাশালী থাকবে ততদিন এমনি চলবে। চিরন্তনী ব্যাপার।···

কারো গেলো হাত ভেঙ্গে, কারো গেলো পা ভেঙ্গে, কারো মাথা ফেটে চৌচির। ছোট খাটো জখম যে নিত্যি কত হ'চ্ছে তা কে খবর রাখতে পারে। অভিশপ্ত শ্রমিক দলও দু'দিন বাদে ভুলে যেতে বাধ্য হয়। অতীতকে মনে রেখে জ্বলবে—মরবে— না বর্ত্তমানকে সামলাবে? অফিসাররা সহানুভূতি দেখিয়ে বলেন, 'জখম গুরুতর নয়। রক্ষে যে প্রাণটা যায় নি! ঈস্ সেদিন যখন তখন টাটকা মানুষটা মরে গেলো!' ব্যাপার গুরুতর নয় তা ত' পূর্ব্বেই বলেচি। কি হ'য়েছে? প্রাণ ত' যায় নি! মাত্র ত' গেলো—এক পা, নয় হাত, নয় চক্ষু, নয় বা শক্তিহীন, জড়, পঙ্গু হ'য়ে পড়লো, মারা যায় নি তো! এই অভিশপ্তের বংশ যখন ধ্বংস হবে না, তখন ভয় কি? শ্রমিকদল সভ্যতার আলোক বহন

ক'রে যুগ যুগ ধরে চলেছিল—চলছে—চলবেও! জড়, চেতনাহীন জাতি নিজে ধ্বংশ হ'য়ে ভোগ' বিলাসের প্রাচুর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করে ধনীদের। মানসিক শ্রমিক অনুপ্রেরণা হেতু বিলিয়ে দেয় আপনাকে সভ্যতার হীন দাসত্বে, তাই প্রতিদানে পায় দুঃখ, অভাব অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে। অবিচারের ওপর ভিত্তি গড়া যে পৃথিবীর সভ্যতা, তা' একদিন মানসিক ও দৈহিক শ্রমিকের অভিশাপে ধ্বংশ হবেই।

কুলি মজুরদের কিন্তু হাসপাতাল আছে! টালির ঘর, নোংরা ছোট ছোট কোঠা, তা'তে নেই আলো, নেই স্বচ্ছ নির্ম্মল হাওয়া, বর্ষাতে পড়ে চুণ ধোয়া জল। রোগীদের শোবার মেলে ঠাঁই, বিনা খরচে ওষুধ পত্তরও মেলে। কুলি মজুরদের জন্যে 'সেবা' কথা সৃষ্টি হয় নি, তাই এদের কোন অবস্থায় শুশ্রূষা ক'রবার প্রয়োজন হয় না। ডাক্তার সাহেব খুশিমত চোখ বুলালেন—কম্পাউণ্ডার সুবিধে মত দেখাশোনা করে! রোগীর পথ্য হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয় না, রোগীর অশিক্ষিত আত্মীয়স্বজন খেয়াল মত লুকিয়ে অপথ্য, কুপথ্য রোগীকে খাওয়ায়!

ছ'টায় আবার কলের বাঁশি বাজে। কুলি মজুররা হুড়মুড় ক'রে গুদামখানা থেকে বের হ'য়ে আসে। গেটে দারোয়ান থাকে, জামার পকেট, কাপড়ের প্যাঁচ অনুসন্ধান ক'রে দেখে—কোন জিনিষ চুরি গেলো কি—না। এবার চলার গতিতে জোর নেই, স্বাচ্ছন্দ্য নেই, সজীবতা নেই, যুঝবার শক্তি নেই, দৃঢ় বিজিগীষা নেই, জীবনেচ্ছুও যেন নয়। টলতে টলতে চলে, কথা বলবার মত শক্তি থাকে না। সর্ব্বাঙ্গে কালিধূলি, এটা সেটা কত কি! অসাড় দেহ, রুক্ষ শুকনো মলিন বদন, স্তিমিত নয়নযুগল। কেউ খুঁড়িয়ে চলে, কেউ জখম স্থান চেপে ধরে চলে। চলে, এমনি ক'রেই চলে, চলুক, কোনভাবে বস্তিতে

পৌছাতে পারলেই হলো। ভাবনা দু'দিকেরই। ঘরে ভাবে স্ত্রী ছেলেমেয়ে, আশায় আশায় আসার পথপানে চেয়ে থাকে; কৈ আসে না ত', অসহ্য হয়, তবু আশা রাখে। মিলে বসে ভাবে শ্রমিক, থামবার উপায় নেই, চালাতে হবে অপ্রতিহত গতিতে মজুরী নিতে হবে, ...থেমে আসে গতি, ঝিমিয়ে আসে নয়ন—ঘরের কথা হঠাৎ এসে চাবুক মারে মনকে, তাই আবার পূর্ণ গতিতে চলে।...

কুলি মজুরদের গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত সকল ঋতুই সমান। দুঃখ, কষ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ক'রে নিয়েছে। রোগ একটা না একটা লেগেই আছে, গ্রীষ্মকালে সান্‌ষ্ট্রোক্ (Sun or heat stroke), মেনইন্‌জাইটিজ (meningitis), কলেরা, প্লেগ; বর্ষাতে কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, বহুরূপী জ্বর; শীত কালটা একটু ভাল যায়—তবে বসন্ত, রক্ত আমাশয় নিষ্কৃতি দেয় না, যক্ষ্মা রোগ ত' ঘরে ঘরেই আছে।

গ্রীষ্মকালে জল নেই, সব পুড়ে যেতে থাকে, ঝাঁ ঝাঁ করা আগুনের হলকা চারদিকে হোলী খেলে। কোন কোন স্থানের রাস্তায় ব্যারোমিটারে ১২০° ডিগ্রি টেম্পারেচার ওঠে, পিচের রাস্তাগুলি যেন উনুন। এই রাস্তার ওপর মানুষই কাজ করে। একদল বদ্ধঘরে বৈদ্যুতিক পাখার নীচে বসে বাতাস খায়, জলসিক্ত খস্‌খসের ভেতরে গরম হাওয়া ঢুকে বাবুদের গায়ে শীতল হাওয়া দেয়, অপর দল উনুন-তুল্য রাস্তায় বোঝা বয়ে চলে। অবিশ্যি কুলি মজুরদের জন্ম এরি জন্যে, ওদের সব সয়ে যায়। কয়লা কাঠের জন্ম ভস্মীভূত হ'বার জন্যে, কাঠের ধীরে ধীরে পুড়ে যাওয়া সয়! কাঠের যদি ভাষা থাকতো তবে বলতো এই সয়ে যাওয়াটা কি? কেন অসহনীয় বাস্তবে সহনীয় হয়! বর্ষাকালটা আরো ভয়ঙ্কর। কুলি-মজুর পাড়ার চারদিকে বন জঙ্গল, অপরিষ্কার ডোবা। কাঁচা রাস্তায় হাঁটু পর্য্যন্ত জলকাদা জমে। বাড়ির ঘর-দোরে,

আশে পাশে যাবতীয় আবর্জ্জনা জমে—পচে' নরকতুল্য ক'রে তোলে। আবাল বৃদ্ধ নর-নারীর পাইখানা নেই; সাঁঝের আঁধারে পুরুষ রমণী খোলা মাঠে, ঝোপের আড়ালে পাইখানার কাজ চালায়। এদের লজ্জা-সরম শুধু অবস্থা বিশেষে। দুর্গন্ধ, অতি দুর্গন্ধ, হাড়-পচা, চামড়া-পচা, জীবজন্তু-পচা—কতো কি পচে ভয়াবহ ক'রে রাখে! মুক্ত স্বাধীন বাতাস সঙ্কুচিত হ'য়ে জমে যায়, থেমে যায়; এখানে সেখানে মরণ বীজাণু; বাতাসের প্রতি স্তরে বিষাক্ত বিষ ছড়িয়ে বেড়ায় রোগ-বীজাণু কুকুর, বেড়াল, গোরু কত কি বস্তির ধারে, বস্তির বুকের ওপর মরে থাকে; শিয়াল গৃধিনী এসে আরো ভয়াবহ বিকট রূপ গড়ে তোলে। খোলার ঘর, মাটির দেয়াল, অবিরাম বর্ষার জল পড়ছে, নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে না, কাপড়-চোপড়, বালিস, কাঁথা, ছেলে-পিলেকে নিয়ে জড় হ'য়ে বসে থাকে; এক কোণ থেকে অন্য কোণে যায়। শীতে কাঁপে, করুণ নয়নে উর্দ্ধে তাকায়। শীতকালে শীতের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না, ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখবার খরচ কি ক'রে যোগাবে! তবে মিলের কুলি বস্তিগুলি একটু ভাল, অত মারাত্মক নয়, যেমন শহরের বাইরের বস্তিগুলি।

— নয় —

রজত সাহিত্য সংক্রান্ত যত কাগজ, খাতা পত্তর ছিল সব পুড়িয়েচে মন শান্ত ক'রবার জন্যে নীরবে জানালার পাশে দাঁড়িয়েছিল—নীলাকাশ তাকে শান্ত ক'রতে পারেনি, ক'রেছিল ভীত—ক'রেছিল উত্তেজিত উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত, দুর্দ্ধর্ষ! প্রেম ও টাকার ওজন ক'রতে ক'রতে ক্ষেপে যায়—এত ক্ষেপে গিয়েছিল যে, ছবির প্রেয়সীকে বিয়ে ক'রে প্রেয়সীর প্রেম পত্তরগুলি দিয়ে চিতার আগুন ধরায় এবং প্রেয়সীকে নিজের সম্পূর্ণ একার ক'রবার জন্যে শ্রেষ্ঠ পথ অবলম্বন ক'রে মৃত্যুকে বরণ ক'রে! চিতার আগুন ধক্-ধক্ ক'রে জ্বলে—সেই সর্ব্বগ্রাসী আগুনে প্রেয়সীকে পুড়িয়ে মারে!

আবার বাতায়ন পথে নীলাকাশ—নিস্তব্ধ, নিথর, জমাট, ভয়ঙ্কর, ভীতিপ্রদ, বিভীষিকাময়! ওই নীল আকাশ অন্তরের ঘুমন্ত কোমল পর্দ্দায় বার বার আঘাত ক'রে রজতকে বিদ্রোহের জীবন ক'রে তোলে। রজত শূন্য আকাশ পানে তাকিয়ে নিঝুমতাকে বরণ ক'রে ভেবেছিল 'আমার আর কি আছে? সাহিত্য গেলো, কবি-প্রিয়া, জীবনের ধ্রুবতারা ডুবে গেলো—অস্ত যাক্ ক্ষতি নেই, বিরহের রোমাঞ্চ দিয়ে যে সম্পদ দিয়ে যায় তার চেয়ে বাড়া সুখ, আনন্দ আর নেই। তাপসী যদি মরে যেতো—তবে আজ কত সৌভাগ্যবান হ'তে পারতাম! তাপসীর মৃত্যু কত বাঞ্চনীয় ছিল! তাপসীর সঙ্গে বিয়ে হয়নি:বলে দুঃখ নয়—দুঃখ

তাপসী অত ছোট বলে !···তাপসী গেলো, স্নেহময়ী মা গেলেন ! মা, মা, মা, অতি ছোট্ট একটি কথা—সমস্ত ভাষা নষ্ট হ'য়ে যাক্ শুধু যদি 'মা' থাকতেন—কেউ থাকে না সত্য, কিন্তু যাবার মত যদি যেতে পারতেন। ইতিহাসের শুভ্র কাগজে আঁচড় কেটে যেতে বলচি নে, বলচি ব্যক্তিগত যাওয়ার মত ক'রে যাওয়া ! মার কত আশা ছিল, কত কাজ ছিল, কত কথা ছিল, কত অনুরোধ, কত আব্দারই-না ছিল—নির্জ্জন বাড়িতে, সহায়হীন হ'য়ে, বাঁচবার অসীম মানসিক বিপ্লব নিয়ে চিরতরে দুনিয়া থেকে বিতাড়িত হলেন ! যখন মৃত্যুর করাল ছায়া এসে তাঁকে গ্রাস ক'রতে থাকে তখন তিনি···উঃ ! (রজত চেঁচিয়ে কেঁদে ফেলেছিল) সবই গেচে—আর কি হবে এই মাটির ঘরের মায়ায় আবদ্ধ হ'য়ে থেকে ! সকলই শত্রুতা ক'রেচে—শত্রুতা ক'রেচে—নারী, শত্রুতা ক'রেচে—সাহিত্যিকের মুখোস পরা ব্যবসায়ীরা, শত্রুতা ক'রেচে—নিয়তি Damn. swine, damn !

রজত আবার ক্ষেপে যায় এবং কাঠের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় ! চিতার আগুন সমস্ত বাড়িটাকে গ্রাস করে !

আপনারা, যারা রজতের প্রতিবেশী ওরা অনেকেই উষাতে ছুটে আসেন আগুন নিভাতে ! ঋতুরাজ বসন্তের শেষ রজনীর মধু মদিরায় মানুষ সহজে ঘুমের মায়া পরশ ছেড়ে আসতে পারে না, রূপসী ষোড়শীর মোহিনী কোল ছেড়ে আসা সম্ভবপর নয়—সেজন্যে রজতের পাড়াপড়সীরা যখন এসেছিলেন তখন আগুন ভাল ক'রে ধ'রে গেচে নিবানোর পথ আর নেই ! পাড়ায় যাতে আগুন না ছড়াতে পারে সেজন্যে পাড়াপড়সীরা বাকি ঘরগুলি ভেঙ্গে ফেলেছিলেন কিন্তু জ্বলন্ত আগুনের মাঝে কোন মানুষের সাড়া শব্দ পায়নি ! সকলেই ধারণা ক'রে নিয়েছিলেন যে রজত বহু পূর্ব্বেই পুড়ে ছাই হ'য়ে গেচে, নতুবা কি মরণ আর্ত্তনাদ শোনা যেতো না?

আগুনের আগুন রঙে রঞ্জিত হ'য়ে চলেছিল কত বিভিন্ন জটলা; নারী জাতির সমবেদনা, দুঃখ, বৃদ্ধের শাস্ত্র ব্যাখ্যা, যুবকদের প্রতিকার ক'রতে না পারায় আফ্‌শোষ! ছেলেমেয়েগুলি রঙ্‌ দেখতে এসে ভীত হ'য়ে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ নয়নে তাকিয়ে থাকে, বৃদ্ধরা চারদিক ঘুরে ক্ষতির পরিমাণ হিসাব করে, কেউ খুঁজে আগুন লাগার কারণ।···

পাড়াপড়সীরা যে ভয় পাননি তা নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না! একটু ভয় কি আর হয়নি। টাটকা মানুষ; বোকা নয়, অসুস্থ নয়, জাজ্বল্যমান সুশ্রী শিক্ষিত যুবক আগুনে পুড়ে মরলো! পুলিস আসবে তদন্ত ক'রতে—বলা যায় কাকে সন্দেহ ক'রে বসে? এই আগুনের পিছনে একটা চক্রান্তও তো থাকতে পারে—যার সঙ্গে মনোমালিন্য ছিল, যাদের টাকা ও জমি সংক্রান্ত স্বার্থ আছে ওদের যদি সন্দেহ বশতঃ ধরে বসে—খুনী আসামী ক'রেও তো ধরতে পারে—লোকটা মরেও সববাইকে মেরে গেলো!···

আপনাদের উপকারার্থে এটুকু বলা চলে যে রজত মারা যায়নি! আগুন যখন লক্‌লক্‌ ক'রে নীলাকাশের শূন্যতা, নিঝুমতা, গুমরতা ভেদ ক'রে উর্দ্ধে—আরো উর্দ্ধে ঐ চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র পানে ধেয়ে উঠে—শূন্যতাকে গ্রাস ক'রবার জন্যে চারি পাশের বায়ু প্রবল বেগে ধেয়ে আসে তখন রজত একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে!···

নিস্তব্ধ রজনী, আঁকা-বাঁকা পথ, পথের দু'পাশে ঘন বন, বনের মধ্যে নিস্তেজ ছায়া—এ ছায়া ভাল লাগে না। পথের ওপরে চাঁদের আলো নিভে গেচে, নক্ষত্র অন্তর্নিবেশিত আকাশ ক্রমশঃ ঘোলাটে হ'য়ে আসচে। বনের মাঝে পড়েচে জাগরণের সাড়া; পূর্ব্ব দিকে তরুণ অরুণের আশু আগমনের লক্ষণ দূরে আরো দূরের দিক্‌চক্রবালে ঈষৎ লালাভায় রঞ্জিত ক'রে জানাচ্ছে।···

রজত ষ্টেসনে আসে, ষ্টেসন থেকে আসে ক'লকাতায়! ক'লকাতা থেকে যায় গয়াতে, গয়ায় গিয়ে মা'র শ্রাদ্ধ করে! মা'র শ্রাদ্ধের পর পথে নামে! তার যাযাবর জীবনের ইতিহাস ভাল জানা নেই, সে সম্বন্ধে না লেখাই ভাল। মানুষ পাঁচটি বছরে কত কি ক'রতে পারে। রজত কত দেশে, কত পাহাড়-পর্ব্বতে, কত বনবনানীতে, কত নির্জ্জনে, কোলাহলে, কত সাধু অসাধুর নিকট, কত বৈচিত্র্যতার মাঝে খামখেয়ালী মন নিয়ে পাঁচটি বছর কাটিয়েচে! ঘুরতে ঘুরতে বম্বে আসে! বম্বে তার এক বন্ধু থাকেন! বন্ধুর বাড়িতে আস্তানা নিলে!

যাযাবর জীবন কেটে যায়; কারণ যাযাবর জীবন মনকে তৃপ্তি দিতে পারে না! ছন্দহীন জীবন, পর নির্ভর ক'রে চলতে হয়, পরের অনুগ্রহে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। আত্মসম্মানে বাধে! বেকার, যাযাবর—বিশ্রী কথা, লোকের বিশ্রী ধারণা! অকর্ম্মণ্য জীবন রজতের প্রিয় নয়, পরের আতিথ্যে, অনুগ্রহে জীবন পাত করা তাকে বড় পীড়া দিচ্চে! দেশ-দেশান্তরে বেদুইনের মত যদি সে ঘুরে বেড়াতে পারে কারো অনুগ্রহে নির্ভর না ক'রে, তবে সত্যই সে সুখ পাবে, আনন্দ পাবে, বৈচিত্র্য দৃশ্যাবলী ও নানা জাতির নানারূপ দেখে শান্তি পাবে!

সে কার ওপর অভিমান ক'রে জীবনটাকে ব্যর্থ ক'রচে? এই যাযাবর জীবনের মূল্য কি, দেনা-পাওনার হিসাব কালে সে কতটুকু পাবে? পরের ওপর নিজের ভার চাপিয়ে অসলগ্ন, অসংযত, ছন্দহীন ব্যর্থ জীবন চালানো ভাল নয়, মন্দ! সংসারে থাকতে হবে, জীবনকে সুন্দর ক'রে গড়ে তুলতে হবে! সে তো সাধু সন্ন্যাসী নয়—সে কী? সুপুরুষ, ক্ষমতাশালী হ'য়ে পরের অনুগ্রহে যাযাবর জীবন চালানো কত হীন, কত তুচ্ছ, নগণ্য! কেন সে এমনি জীবন পাত ক'রবে? মা কারো চিরদিন থাকেন না—তাপসী? তাপসীর কি আসে যায়?

তাপসী এখন পাকা গৃহিণী, স্বামী পুত্র নিয়ে কত দূরে চলে গেচে। আনমনে মনের অন্তরালে একবারের জন্যেও তার কথা উদিত হয় না, হলেই বা কি? তবু প্রাণটা কেন জানি ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠে।

রজত বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীর চেষ্টায় বম্বে স্থায়ী আসন গাড়লো! শ্রীরাম মিলে চাকরি নিলে। বন্ধুর নিকট একমাস থেকে শ্রীরাম মিলের অফিসর কোয়ার্টারে সংসার পাতলে!

সংসার! দীর্ঘ পাঁচ বছর পর তার সংসার! টালির বাড়ি, পাকা দে'য়াল! দু'টি ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি ঘরে জিনিষ পত্তর থাকে ও চাকর থাকে! বাড়ির সুমুখে ছোট খোলা আঙিনা—আঙিনা সবুজ ঘাসে ঢাকা, অঙিনার সীমানা দে'য়া থবুনি হেজে (thorny hedge)। হয়ত' সমুদ্রের ধার পর্য্যন্ত খোলা প্রান্তর, গাছের পর গাছ, কত গাছ, গাছে গাছে কত পাখী! আম, কুল, তেঁতুল, অশ্বত্থ, কদম্ব, বট, খেজুর, নিম, শাল, কৃষ্ণ চূড়া, ইকুইলিপ্‌টাস, বাব্‌লা, বাবুল গাছের ঝোপ; কত—কত গাছ শীতল ছায়া ক'রে দাঁড়িয়ে আছে! নির্জ্জন বাড়িতে উদাস, শ্রান্ত মন নিয়ে যখন রজত মুগ্ধ নেত্রে দূরের পানে তাকায় মনটা কেমন বিমনা হ'য়ে পড়ে। ঐ প্রান্তর—ঐ প্রান্তরে কত কি আছে, ঐ প্রান্তর যে আজও অতিক্রম ক'রতে পারেনি। নির্জ্জনে ঐ প্রান্তর রহস্যময় হ'য়ে উঠে! হয়ত' ওখানে কত পাখী আছে—কত পাখী চোখে পড়েচে—ময়না, টিয়া, বুলবুল, খঞ্জন, পেরু, শালিক, বাবুই, তিতির, কাঠঠোক্‌রা, চক্রবাক্‌, ভরত, ধনেশ, জলপিপি, কোকিল, 'বউ কথা কও' পাখী—কত কি, সব নাম সে জানেনা, চিন্‌তেও পারেনা!

মিলের বেশি খাটুনিতে তার বেশ ভাল লাগে! মনটাকে ভরে রাখে অত্যধিক কাজের চাপ! সকালে আটটায় চা খেয়ে মিলে যায়, দুপুরে বাড়ি আসে চান ক'রতে ও খেতে তার পর ফিরতে ফিরতে রাত

সাতটা আটটা হয়! আফিস থেকে বেরিয়ে শরীর ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে? কোনদিন বাড়ি এসে ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত হ'য়ে পড়ে থাকে কোনদিন নির্জ্জনতাকে এড়াবার জন্যে বন্ধুর বাড়িতে যায়!

শ্রীরাম মিলে তিন মাসের ওপর হ'লো কাজ ক'রচে, এপর্য্যন্ত মিলটা ভাল ক'রে দেখেনি? সময় বাধা নিয়মে যায়, আসে, কোন কিছুর প্রতি কৌতূহল নেই, মায়াদয়া নেই! নীরস, নীরব, কঠিন! কোন লোকের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই, কারো পরিচয় ও বন্ধুত্বে কিছু আসে যায়না, কোন ভ্রূক্ষেপই করেনা! আছে ত' আছেই। মায়াদয়া নেই, স্বার্থ নেই, ভালমন্দের দ্বন্দ্ব নেই, বাঁচবার, সাফল্যমণ্ডিত হ'বার কোন ভাবনা চিন্তা নেই—সময় অতিবাহিত ক'রবার জন্যে কাজের ওপর প্রবল ঝোঁক! শুধু কাজ, কাজ, কাজ—যেন একটা যন্ত্র!

নির্জ্জন বাড়িতে, মায়াময়ী প্রকৃতি দেবীর বৈচিত্র্যময় যৌবন তরঙ্গে গা ভাসিয়ে দিয়ে কবিতা লেখে নাকি? ব্যর্থ প্রেমিক, বিদেশের নির্জ্জনতা, খেয়ালী জীবনধারা, অকূল সংসার সমুদ্রে নিমজ্জিত জীর্ণ ভেলায় একা পথিক! কবিতা লেখাই বাঞ্চনীয়, স্বাভাবিক! চরিত্র কলুসিত ক'রে ব্যর্থ প্রেমের ওপর প্রতিশোধ নেয়নি, মদে মাতাল হ'য়ে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে থাকে না—এমন কি ভগবৎ চিন্তায় বা কাব্য চর্চ্চায় বা গান বাজনায় আত্ম বিস্মৃত হ'তে চেষ্টা করেনা! রজত কবিতা লেখে না—লিখলে ভাল হতো।

একদিন এমনি তাঁতের বিভাগ দিয়ে আসছিল, অহেতুক ভাবেই আসছিল হঠাৎ তাঁতিদের কাজ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে! এরাত' খুব পরিশ্রম করে—কত মাইনে পায়? নিশ্চয়ই বেশি মাইনে বা মজুরি পায়! রজত দাঁড়িয়ে থেকে বহুক্ষণ তাঁতিদের কাজ দেখলো! তাঁত বিভাগের পাশেই spinning department (তুঁলা পেঁজা

ও সূতা বোনার বিভাগ)। রাজত স্পিনিঙ্ বিভাগে এসে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলো! মিলে অতগুলি মেয়ে কি করে? মিলে মেয়েরাও কাজ করে তা বহুবার শুনেছিল কিন্তু কোনদিন প্রত্যক্ষ দেখেনি, ৫০।৬০ জন মেয়েকে দেখতে পেয়ে রীতিমত আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলো!

অতগুলি মেয়ে কাজ ক'রচে দেখে আশ্চর্য্য হ'লো, কৌতুহলও হ'লো! স্পিনিঙ্ বিভাগের মাঝখান দিয়ে চলতে লাগলে—কোন প্রয়োজন নেই, অনাবশ্যক! পুরুষরা মাঝে মাঝে এখানে আসে, অকারণে আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে, গলার শব্দ করে। যারা বড় কাজ করে ও সাহসী ওরা মেয়েদের কাজ দেখতে এসে ছল ক'রে দাঁড়ায়! ওপর কর্ত্তারা নিকটে না থাকলে পুরুষরা আসেই! রজতের সুন্দর চেহারা, কৌতূহলী নয়ন মেয়েদের চক্ষু এড়ালো না! মেয়েদের চোখে, মুখে কৌতুক, মুচকি হাসি! অল্পবয়সের মেয়েরা একটু হাসেই। যে মেয়েদের যৌবন প্রশংসনীয়, যারা পুরুষের আগমনে খুশি হয় ওরা হাসবে না তো হাসবে কে! হাসলেই বা ক্ষতি কি! হাসির দু'টো মানে আছে! কেউ হাসচে বিজয়িনী বলে, কেউ হাসচে আকৃষ্ট ক'রবার জন্যে। কেন আকৃষ্ট ক'রবেনা; দুঃখের সংসার, অচল সংসার—যদি একটু সচল হয়, পুরুষের সঙ্গটা কি যৌবনে আকাঙ্ক্ষণীয় নয়?

রজত হঠাৎ চমকে উঠলো একটি মেয়ের মুখ দেখে! আশ্চর্য্য! কী ক'রে সম্ভবপর হতে পারে? সে কি স্বপ্ন দেখচে? তাপসী এখানে কি ক'রে এলো? তাপসী শ্রীরাম মিলে চাকরি করে? অসম্ভব! ০ ০ ০

মেয়েটিকে ভাল ক'রে দেখতে পায়নি! মেয়েটি পাশের ঘরে চলে গেলো। মানুষে মানুষে এত সাদৃশ্য থাকতে পারে! রজত অন্যমনস্ক-ভাবে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলো!

পরদিন। রজত কিছুতেই কৌতূহল চাপতে পারলোনা। স্পিনিঙ্

বিভাগে আকর্ষণ করলো! রজত দুয়ারে এসে দাঁড়লে; সেই মেয়েটি গম্ভীর মুখে কাজ ক'রে যাচ্চে! তাপসীর সঙ্গে চেহারার সাদৃশ্য আছে কিন্তু চেহারার আলোতে মিল নেই! মেয়েটির নারীত্ব, সতীত্ব, তেজস্বীতার দীপ্তি মুখের আলোতে মেখে রেখেচে! বিস্তৃত, টানা টানা করুণ আঁখিতে কি এক ভাষা লেপে রেখেচে—তা জটিল, পীড়াদায়ক ও ব্যথিত ক'রে তুলে, মনকে আকর্ষণ করে! মেয়েটি আর কেউ নয়—গঙ্গাবতী! রজতেব মর্ম্মে একটি আঁচড় পড়লো! ০ ০ ০

রজতের ভারি ইচ্ছা হ'লো গঙ্গাবতীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে। তিন চার দিন চেষ্টাও ক'রলো, কোন অজুহাতে আলাপ ক'রবার স্থবিধে পেলোনা! কি ক'রেই বা আলাপ করে, এক সমাজের নয়, এক প্রদেশের লোক নয়—একজন সুন্দর যুবা অপর জন সুন্দরী, অতি সুন্দরী যুবতী! লোকেই বা বলবে কি, মেয়েটির প্রতি নজর রেখেচে বহু লোক।

একদিন রজত গাঁয়ের খোলা মাঠে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরচে। সন্ধ্যা উত্তির্ণ হ'য়ে গেচে, পাখীর কলরব থেমে গেচে, আকাশে উঠেচে পরিস্ফুট শুভ্র জ্যোৎস্না নিয়ে শরদিন্দু। স্বচ্ছ কাচের আলো খোলা মাঠে ও গাছের পাতা-শাখার ফাঁকে ফাঁকে আলগোছা খসে পড়ে মিষ্ট মায়া ছড়িয়ে দেয়। খোলা মাঠের ধারে কুলি বস্তি, কুলি বস্তির পাশে মিলের অফিসরদের বস্তি, অফিসরদের বস্তির পর বড়বাবুদের বাংলো। রজত গেঁয়ো রাস্তা ধরে আসচে, আঁকা বাঁকা পথ, পথের দু'পাশে বড় ছোট নানাবিধ গাছ, গাছের ফাঁকে অনন্ত আকাশ। হঠাৎ একটি নারীর আকুলিত মিনতি শুনে থমকে দাঁড়ালো। শব্দানুসরণ ক'রে দ্রুত হেঁটে গেলো। একটা তমাল গাছের নীচে গঙ্গাবতী ও অপরিচিত দুষ্ট প্রকৃতির এক দুর্ব্বৃত্ত। দুর্ব্বৃত্তটি আর কেউ নয়—গঙ্গাবতীর স্বামী, পাষণ্ড কানাই। রজত কানাইকে চিনেনা, কানাইকে গঙ্গাবতীর পাশে

এমনি ভাবে দেখে রাগ সামলাতে পারলেনা। নারীর ওপর অত্যাচার কি ক'রেই বা যুবক সহ্য ক'রতে পারে। কানাই গঙ্গাবতীকে কুপথে নামাবার জন্যে প্ররোচিত ক'রচে, বড় লোকের টাকার পরিমাণ দেখিয়ে প্রলুব্ধ ক'রচে। হঠাৎ কানাইর মুখে শ্যামজীর নাম শুনে রজত চমকে উঠলো। শ্যামজী এত কুচরিত্রের, এত নীচ যে একটি মেয়ের সর্ব্বনাশ ক'রবার জন্যে চর নিযুক্ত ক'রেছেন। শ্যামজীর স্বভাব চরিত্র ভাল নয় তা' সে জানতো, কিন্তু এত জঘন্য যে ভাবতে পারেনি। গঙ্গাবতী রাজি হয়না, জোর প্রতিবাদ করে, স্বামীকে ভাল হ'বার জন্যে অনুরোধ করে, পাষণ্ড কানাই ক্রমশঃ রেগে উঠে। শেষটায় কানাই'র পুরুষত্ব প্রয়োগ হ'লো। রজত রেগে আগুন হ'য়ে দু'জনের মাঝে পড়লো, কানাইকে দু'ঘুসি মেরে ভূপতিত ক'রে গঙ্গাবতীকে বললে—রাত্রে একা একা বেরোনা উচিৎ নয়, আমি না থাকলে আজ কি দুর্দ্দশা হতো।'

রজত আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখলে গঙ্গাবতী তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে, কোন কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে কানাইকে মাটি থেকে সযত্নে তুলে বসালো এবং আহত স্থানে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। এ দৃশ্য দেখে রজত রীতিমত ভড়কে গেলো। আশ্চর্য্য এ নারী চরিত্র! যে পাষণ্ড খানিক পূর্ব্বে তার সর্ব্বনাশ ক'রতে চেষ্টা ক'রেছিল, তার কবল থেকে রক্ষা পেয়ে সেই দুর্ব্বৃত্তেরই শুশ্রূষা করে! তবে কি গঙ্গাবতী চরিত্রহীনা। তা' সম্ভবপর হয় কি করে? ঐ পবিত্র মূর্ত্তি, নিষ্পাপ চক্ষু, সমস্যায় পীড়িত, শঙ্কিত কালশিরা, দুর্দ্দশায় শ্রান্ত মলিন বদন কি ক'রে জঘন্যতাপূর্ণ হ'তে পারে—খানিকপূর্ব্বে যা' সে লক্ষ্য ক'রেচে তা কক্ষণো ভুল হ'তে পারে না, অসম্ভব!

কানাই রজতের প্রতি হিংস্র শ্বাপদের মত একবার তাকিয়ে গঙ্গাবতীকে অতি হীন স্বরে প্রশ্ন করলে 'এই বাবুটি আবার কবে থেকে

জুটেচে? (নিম্নস্বরে জিজ্ঞেস করলে) টাকাকড়ি আছে তো? বেশ বেশ, আমি যেন ভাগ পাই।' কানাই রজতকে সুবিধে দিবার জন্যে পা টিপে টিপে সরতে লাগলো। রজত কানাই'র সকল কথা শুনতে পেয়েচে, গোপন উদ্দেশ্য বুঝতে পারলো! এ হেন উক্তি ও উদ্দেশ্য শুনে রজত আর নিজেকে সামলাতে পারলো না, খপ্ ক'রে কানাই'র ঘাড় ধরে এক ঝুঁকি দিয়ে বল্‌লে—you bloody swine! তোকে আমি মারতে মারতে হাড় চুর ক'রে দেবো, পুলিশে দেবো।'

গঙ্গাবতী মাঝখানে পড়ে মিনতির স্বরে বল্‌লে 'ওকে ছেড়ে দিন, দয়া ক'রে ছেড়ে দিন!'

'তুমি ছেড়ে দিতে বলচো! যে নরাধম অত বড় অত্যাচার ক'রতে চেষ্টা ক'রেচে, অতি জঘন্য কথা বলেচে তাকে ছেড়ে দিতে কি ক'রে বলতে পেরেচো! আমি ওকে ছাড়চিনে। স্ত্রীলোকের ওপর অত্যাচার করা—' রজত আর বলতে পারলো না, জোরে এক ঝাঁকানি মারলো।

'ছেড়ে দিন, মিনতি করচি, ও আমার স্বামী—'

'স্বামী!' রজত আঁৎকে উঠলো—ঘৃণায় শরীর কুঞ্চিত হ'লো।

কানাই ছাড়া পেয়ে একটু সরে গিয়ে গর্জ্জে উঠে বল্‌লে—'দেখে নেবো ব্যাটা, আমার সুমুখে আমারি বিয়ে করা স্ত্রীর ওপর অত্যাচার—আমাকে খুন করার চেষ্টা! আমি থানায় যাবো, মোকদ্দমা করবো।'

রজত শাসিয়ে বললে—তোমার বহু ভাগ্যি যে আমার হাত থেকে নিস্কৃতি পেয়েচো। স্ত্রী! লজ্জা করে না স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে! স্ত্রীর ওপর মারধর করিস, স্ত্রীকে চরিত্রহীনা ক'রে টাকা রোজগার ক'রবার চেষ্টায় আচিস—মেরে যে খুন করিনি এই বেশি! আর কখনো যদি শুনতে পাই তবে ঐ মুখ পাথরে ঘসে চেপ্‌টা ক'রে দেবো।'

কানাই কি বলতে চেষ্টা ক'রছিল, রজতের ধমকে অকথ্য ভাষায়

গালাগাল দিয়ে, গঙ্গাবতীর সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র গেঁথে যা' তা বলতে বলতে পালিয়ে গেলো।

গঙ্গাবতী কুণ্ঠিত, ব্যথিত চিত্তে রজতের পাশে এসে ভীরু কণ্ঠে বল্‌লে —আপনাকে দেখেই বুঝেচি যে, আপনার দ্বারা কোন নারীর ক্ষতি হবেনা; আপনি অতি মহৎ, দয়ালু—আমাকে ক্ষমা ক'রবেন।

'তোমার তো কোন দোষ নেই, মিছিমিছি কেন কুণ্ঠিত হচ্চো!'

'আমাকে রক্ষা ক'রতে এসে আপনি অকথ্য গালাগাল শুন্‌লেন, ওর হ'য়ে আমি ক্ষমা চাইচি!'

'গালাগালি শোনা আমাদের প্রাপ্য। মাতাল, চরিত্রহীন গালাগালি দিয়েই থাকে; কিন্তু তুমি ওর হ'য়ে ক্ষমা চাইতে পাবে না, চাইলেও আমি ক্ষমা ক'রতে পারিনে!···না, না, তুমি অত মিনতি ক'রোনা, এ তোমাদের অন্যায়, অন্ধ পতিব্রত ধর্ম্ম! যে স্ত্রীকে হীনপথে নামাবার জন্যে প্রলোভন দেখায়, অত্যাচার করে, মিথ্যা কলঙ্ক রটায় তার হ'য়ে তুমি ক্ষমা চাইতে পার না—আর যাই ক'র অত নিম্নস্তরের পতিব্রতা দেখিও না। এ স্থানটা ভাল নয়, তা আমি এসেই শুনেচি—রাতে এখানে থাকা নিরাপদ নয়, তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও।'

গঙ্গাবতী ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরে গেলো, রজত রাস্তা থেকে দৃষ্টি রাখলে গঙ্গাবতীর ওপর! মেয়েটীর প্রতি কেন জানি একটু মায়া পড়ে।

কিছুকাল পরের কথা! এই কিছুকালের মধ্যে রজতের বেশ পরিবর্ত্তন এসে গেচে! কালের যে বিশ্রী কাল-শিরাগুলি তার মুখের ভয়ঙ্করতা বাড়িয়ে চলছিল, স্বভাবকে ক'রেছিল রুক্ষ, কর্কশ, জংলী, অসামাজিক, তা' ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হ'তে লাগলো! কিছুকাল পূর্ব্বেও কাজের গুরুচাপে জীবনের সজীবতা ও শক্তিকে অস্বীকার ক'রে প্রাণহীন যন্ত্রের মত ধ্বংশের পথে এগিয়ে চলেছিল! পাড়াপড়সী,

পরিচিত লোক, সহ-কর্ম্মী কারো সান্নিধ্য সহ্য ক'রতে পারতো না; কেউ এলে বিরক্ত হ'তো, এমন কি বাল্যের বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীর আগমন সকল সময়ে খুশি মনে সহ্য ক'রতে পারেনি। সকলের নিকট সে অদ্ভুত, আজগুবি, আধ-পাগলা বলে পরিচিত!

গঙ্গাবতীর সঙ্গে তার বেশ আলাপ-পরিচয় হ'য়ে গেচে! গঙ্গাবতীর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়, কথাবার্ত্তা হয়! গঙ্গাবতী রজতকে আপন দাদার মত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে! রজতের সাহায্য নিতে গঙ্গাবতী এখন আর তেমন কুণ্ঠিত হয় না! রজত গঙ্গাবতীকে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করে। রজত অল্প মাইনে পায়—যে মাইনে পায় তা'তে যাবতীয় খরচ বাদে বিশেষ বাঁচে না, কোন কোন মাসে ধার হ'য়ে পড়ে।

রজত যে বাড়িতে থাকে তার অর্দ্ধেক অংশে অপর এক ভদ্রলোক সপরিবারে বাস করেন! বাড়ির আঙিনার মাঝখানে রাঙ্‌চিতার বেড়া দিয়ে পৃথক করা আছে! ভদ্রলোকটি রজতের সঙ্গে একই বিভাগে কাজ করেন, আগে রজত পরিচয় করেনি, এখন দু'জনের মধ্যে বেশ সৌহৃদ্য জন্মেছে! এই সৌহৃদ্য উদ্দেশ্য-মূলক বলে যদি আপনারা সন্দেহ করেন তবে দোষ দে'য়া চলবে না! পূর্ব্বে রজত একই বিভাগে কাজ ক'রে, একই বাড়িতে বাস ক'রে ভদ্রলোকের স্বতঃপ্রবৃত্ত পরিচয় ক'রবার চেষ্টাকে পাত্তাই দেয়নি আর এখন নিজে সেধে কেন অত ঘনিষ্ট হ'লো? এর মূলে কি গঙ্গাবতী নয়? গঙ্গাবতী রজতের বাড়িতে আসতে পারে না কারণ রজত বাঙ্গালী, অবিবাহিত যুবক—এমন কোন অজুহাত নেই যা'তে গঙ্গাবতী রজতের বাড়ি এসে রজতের সঙ্গে গল্প-গুজব ক'রতে পারে! এরা তো পাশ্চাত্য সভ্যতায় দীক্ষিত হ'য়ে সভ্য বনে যায়নি যে নির্জ্জন বাড়িতে দিনরাত্রি আলাপ-সালাপ, খেলা-ধূলা, হাসি-ঠাট্টা ক'রবে!

গঙ্গাবতী পাশের বাড়িতে আসে—সেখানেই রজতের সঙ্গে আলাপ হয়! রজতকে তার খুব ভাল লাগে! এমন লোককে ভালবেসে, ভক্তিভরে পূজা ক'রে শান্তি মিলে—বিশ্বাস ক'রে শান্তি মিলে! রজতের মত পরোপকারি আরও মিলতে পারে, মিলেও হয়ত' কিন্তু রজতের প্রতি পক্ষপাতিত্ব তার বেশি! যে শ্রমিকদের কল্যাণে জীবন নিয়োজিত ক'রেচে, আসন্ন অত্যাচার, পীড়ন বরণ ক'রতে রাজি হয়, যে অকাতরে নিজের মুখের গ্রাস অভুক্তকে দেবার জন্যে ব্যাকুল হয়, সে অনেক বড়! রজতকে সে বিশ্বাস ক'রতে কেন যে পারে এর কোন সঙ্গত কারণ নেই—তবু পারে!

রজতের মনে প্রাণে একটা নতুন জাগরণের সাড়া পড়েচে, এখন সে বেহুইন জীবনের দিন গুণেনা, বিরহের কাব্য সৃজন করে না! সে তার ভুল বুঝতে পেরেচে! সাহিত্য-সেবা ক'রবে না বলে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, পুঁথি পুস্তক রাগের মাথায় পুড়িয়েচে, ওতে কার কি এলো-গেলো! কে তার জন্যে কেয়ার করে; ওর রাগের মাথায়, মানসিক পাগলামিতে, বিদ্রোহে—কি উপকার সাধিত হ'য়েছে? যেই সমস্যা, তেমনিই র'য়ে গেচে, থাকবেও! খাতা-পত্তর, দোয়াত-কলম পুড়ে কিছু হবেনা, ক'রতে হবে প্রতিকার, ক'রতে হবে আন্দোলন, ন্যায্য পাওনা কড়ায় গণ্ডায় হিসেব ক'রে ছিনিয়ে নিতে হবে। রজত সংগ্রাম ক'রতে নামতে পারেনি, কারণ তার টাকা নেই, ক্ষমতা নেই! অক্ষমের থাকে উর্বর মস্তিষ্ক আর সক্ষমের থাকে নিরেট মস্তিষ্ক। রজত চাকরি ক'রে টাকা জমাবে, তারপর নামবে সংগ্রামে!

উদ্দেশ্য ছিল এই, হয়তো কঠোর শ্রম ক'রে কৃপণের মত টাকা জমিয়ে কিছু ক'রে যেতে পারতো কিন্তু কুলি মজুরদের দুঃখ দুর্দ্দশা, অভাব অভিযোগ তাকে চঞ্চল ক'রে তুললো, অন্যায় অবিচার তাকে ক্রমশঃ ক্ষিপ্ত ক'রতে লাগলো!...

গঙ্গাবতী মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে 'কিসের আশায় আপনি আমাদের জন্যে এমনি বিপদ বরণ ক'রচেন? আমাদের কোন উপকার ত' ক'রতে পারবেন না'ই, নিজের বিপদ বরণ ক'রে আনা!'

রজত হেসে বলে—'কারো উপকার ক'রবার মত মহৎ গুণ মোটেই নেই, স্বভাবটা ভাল নয় তাই হৈ-চৈ করি ঝগড়া ক'রবার জন্যে!'

গঙ্গাবতীও হেসে উত্তর দেয় 'এমনি খারাপ স্বভাব যদি আরও দশ বিশজনের হ'তো তবে দেশটার মহাকল্যাণ সাধিত হতো!'

'বুদ্ধিমান লোকেরা বলেন তোষামোদ শুন্‌তে হলে পুরুষ চাই আর ফাঁকির ওপর প্রশংসা পেতে হলে, বিখ্যাত হ'তে হলে বোকা নারী চাই। মেয়েদের মত অত সস্তা প্রশংসা আর কেউ ক'রতে পারে না।'

'আমি কিন্তু দাদা দুর্ম্মুখ, পাড়াপড়সী, মিলের শ্রমিক, এমন কি কর্ত্তৃপক্ষ পর্য্যন্ত আমার স্পষ্ট কথায় খাপ্পা! আমার প্রশংসা পাওয়া অত সোজা নয়!'

'মেয়ে মানুষের অত দর্প ভাল নয়!'

'আপনিও তো কম ন্যাকামো করেন নি! সে কথা থাক্, আমি শুনতে পেলাম আপনার নামে বহু নালিশ গেচে, কর্ত্তৃপক্ষ নাকি চটে গেচেন, শ্যামজী আপনার বিরুদ্ধে লেগেচেন তাড়াবার জন্যে।'

'যে দুর্ব্বলের হ'য়ে শক্তিশালীর বিপক্ষে লড়াই করে ভগবান তাকে অশেষ দুঃখ কষ্ট দিয়ে থাকেন, কিন্তু যুঝতে গিয়ে সে যে আনন্দ ও মানসিক শক্তি পায়, তা লোভনীয়। আমি যদি শ্রমিকদের একটু উপকার ক'রতে পারি তবে আমার সকল দুঃখ কষ্ট সার্থক হবে; শ্যামজীর চক্রান্তে যদি কারাবাসও হয় তবু দুঃখ পাবো না!'

'কারাবাস হ'তে পারে?'

'কারাবাসের নামে তুমি অত চমকালে কেন ?'

'কারাবাস।—সেত' ভয়ঙ্কর স্থান—!'

'তোমাকে অত সাধারণ নারীরূপে পাওয়া দুঃখের কথা! যিশুখ্রীষ্টের ক্রুশ-বিদ্ধ ছবি দেখেচো ?—না! আমার নিকট আছে, অমন মূল্যবান মূর্ত্তি পৃথিবীতে কমই আছে! আমি রোজ দু'বেলা তাঁকে পূজা করি।' ...'হুঁ কানাই এখন কোথায় আছে ? আমি বহু চেষ্টা ক'রেচি, ওকে পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব! আমি মাঝে মাঝে ভাবি তোমার স্বামী কি ক'রে এত নীচে নামতে পারে! অতি আশ্চর্য্যের কথা—তোমার ছোঁয়ায় যে লোহা সোণা হয়।'

'ছোট বোনকে ঠাট্টা করা কিন্তু অন্যায়! বলে যখন ফেলেচেন তখন আমি এটুকু বলতে পারি যে, সে লোহা নয় রক্ত মাংসের মানুষ। লোহাকে সোণা করা যায় কিন্তু রক্ত মাংসের মানুষকে সোণা করা যায় না!'

গঙ্গাবতী মাঝে মাঝে বড় বড় কথা কয়, বড় আলোচনায় যোগ দেয়। গঙ্গাবতী কিন্তু অতি সাধারণ, সংস্কার বর্জ্জিতা নয়, অশিক্ষিতা! যার মধ্যে জিনিষ থাকে তাকে বুঝালে বোঝানো যায়! রজত চেষ্টা ক'রতে লাগলো একটা দল ক'রবার জন্যে। গঙ্গাবতীকে প্রকাশ্যে নামাতে পারে না কারণ গঙ্গাবতী একা নয়—বন্দিনী সংসারের কঠিন পাঁকে আবদ্ধ! ০ ০ ০

গঙ্গাবতী কখনো প্রশ্ন করে 'দাদা! সত্যি কি আপনার আর কেউ নেই ? একটি আত্মীয়ও কি নেই ?'

'একটি আত্মীয়া আছে।'

'কে ?"

'আমার একটি বোন—মেড়ো বোন—শ্রীরাম মিলে কাজ করে!'

'মেড়ো বোনটি কে ?'

'একটি ভীষণ নারী, মদ্দা মেয়ে—কাউকে তোয়াক্কা করে না। একটি গুণ্ডা বল্‌লেও চলে, পুরুষদের সঙ্গে সমানে সমানে লড়তে পারে। এত সুন্দর, সুসংযত চরিত্রবতী নারী এ শহরে আর নেই !'

'থাক্, থাক আর সস্তা দরের মাল চালিয়ে লোক ঠকাতে হবে না! আচ্ছা, আপনি বিয়ে করেন না কেন ?'

'বিয়ে···হুঁ, কি বল্‌লে—বিয়ে ? বিয়ে তো আমি ক'রেচি !'

গঙ্গাবতী ছেলেমানুষের মত হেসে বল্‌লে—'বউ বুঝি মরে গেচে ?

আহাঃ ! কি হ'য়ে ম'লো দাদা ?'

'বিশ্বাস করচো না—সত্যি মরে গেচে।'

গঙ্গাবতীর সন্দেহ ঘনীভূত হয়।

রজত কঠিন হাসি দিয়ে বলে—যার কথা বলচি তিনি আমার নিকট মৃত, তার নগণ্য, তুচ্ছ দেহটা আশ্রয় ক'রে আছে নিম্নস্তরের এক প্রাণ। তার সত্যিকারের রূপ, রস, শক্তি ও জীবনের বিলোপ হ'য়েচে !'

—'আপনার কথা আমি সকল সময় বুঝতে পারি নে !'

'আমি একজনকে ভালবাসতাম, সেও আমাকে ভালবাসতো ; বিয়ের পাকাপাকি কথাও হ'য়েছিল—একদিন সন্ধ্যাবেলায় মা মারা গেলেন—মা'কে যে আগুনে পুড়িয়েছিলাম সে আগুনে আমার বাড়ি পুড়ে যায়—আমার ভাবী স্ত্রীও সে আগুনে পুড়ে মরে !'

'অর্থাৎ মেয়েটি আপনাকে বিয়ে ক'রলেন না ?' রজত সহজ পরিহাস ভেবে আর এগোতে পারলে না, গম্ভীরভাবে চুপ ক'রে গেলে; গঙ্গাবতী খানিক চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে, 'আপনার অতটা দুঃখ ক'রবার কি আছে ! ভগবান মানুষের ভালবাসা অপূর্ণ রেখে খেলা করেন ! অপূর্ণতাই নাকি ওঁর বিশেষত্ব !'

গঙ্গাবতী কথাগুলি গুছিয়ে বলতে পারলে না; যা' বলবার তা' প্রকাশ ক'রে বলবার ভাষাও পেলে না! গঙ্গাবতীও যে প্রেমের রাজ্যে বিচরণ ক'রেছিল। তার জীবনে কি কম উত্থান পতন হ'য়ে গেচে! সে কি উপলব্ধি ক'রতে পারে না তার অনন্ত বিস্তৃত প্রেমের হাহাকার! সে বুঝতে পেরেচে প্রেমকে কখনও সীমাবদ্ধ ক'রতে নেই, মিলনের রেখায় যেস্থানে প্রেমকে সীমানা এঁকে দে'য়া যায় সেস্থানে হয় প্রেমের অকাল জড়তা, স্থবীরতা, বদ্ধতা! প্রেমের স্রোতকে সীমানায় বদ্ধ ক'রলে অবিচার করা হয় সত্য, কিন্তু তার একটা প্রশস্তি আছে যা সাংসারিক জীবনের জন্যে প্রয়োজন, যা দেউলেকে ছোট্ট সীমায় রেখেও স্বত-স্ফূর্তিযুক্ত ক'রে রাখে! গঙ্গাবতীর জীবনে সীমানাটা পড়ে যে অকালে মেরে রেখেচে! কানাইকে ভালবাসতো—আজ সে ভালবাসার কথা মনে হ'লে ব্যথা পায়, ব্যর্থতা কত বড় কঠিন হয়; একদিন ভালবেসেছিল, সে স্মৃতির জোরেই কি জীবন চলতে পারে—পারে না। বিরহ যদি আসতো তবে তার প্রেমময় জীবন সুন্দর হ'য়ে ফুটতো! গঙ্গাবতী কি বাতায়ন পথে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে ভাবতে পারে প্রেমময় জীবনের সুন্দরতাকে? দেহ কি তার রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠে? ···প্রেম অবলম্বন ভিন্ন অনন্ত বিস্তৃত হ'তে পারে না, কিন্তু অবলম্বন যদি মিথ্যা হয়, ভুল হয়, যদি হয় ছলনা, যদি হয় অতি কুৎসিত তবে প্রেম করে আত্মহত্যা! অবলম্বন ভিন্ন প্রেম জন্মাতে পারে না, প্রেমের জন্মের পর যদি অবলম্বনের মৃত্যুও হয় তবে প্রেম পায় মুক্তি, মোক্ষ, তার সীমা বাড়ে অসীমের পরপারে!

গঙ্গাবতী ও রজতের প্রেম ট্র্যাজিডি দিয়ে মোক্ষ লাভ করে নি, অসীমের পরপারে তার অবাধ গতি নয়!···

গঙ্গাবতী মাঝে মাঝে রজতের বিয়ের কথা তোলে, অনুরোধ করে

বিয়েতে মত ক'রাবার জন্যে! রজত অন্যমনস্ক হয়, গঙ্গাবতী একটু কেমন অসুবিধা বোধ করে! বিয়ের প্রসঙ্গে কেউ খোলাখুলি ভাবে কথা কইতে পারে না! বিয়ের প্রসঙ্গে দু'জনেই যেন ভাই-বোনের সম্পর্ককে প্রখর ক'রে তুলতে চায়? হয়ত' বা দুর্ব্বলতা, হয়ত' বা ব্যর্থ জীবনের ব্যথা! রজত বিয়ে করুক, স্ত্রীকে ভালবেসে প্রথম প্রেমের গ্লানি মুছে ফেলুক, দাম্পত্য সৌরভে বিমোহিত হ'য়ে আলাদা স্তরে সরে যাক্ এবং বোনের প্রতি ভালবাসা ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে দূরে চ'লে যাক্—এই কি গঙ্গাবতী চায়? বিয়ের প্রতি জোর দে'য়া কি দুর্ব্বলতা গোপন করা নয়—বড় ট্র্যাজিডি নয়? তা'তে রজত কি ভীত হয় না—হয়; হয় বলেই চুপ্ ক'রে যায়, বোনকে বোনের স্থানে উৎসাহভরে, আড়ম্বরে প্রতিষ্ঠিত করে!

— দশ —

রজতের স্বরূপ হঠাৎ সকলের নিকট তীক্ষ্ণভাবে ধরা দিলো! কুলি বস্তিতে ও শ্যামজীর বাগান বাড়িতে রজত ও গঙ্গাবতী সম্পর্কিত বহু গবেষণা, আলোচনা প্রকটভাবে প্রকাশিত হ'য়েচে। মুখরোচক কথা বাতাসের আগে প্রচারিত হয়! রজত কাউকে তোয়াক্কা ক'রে চলে না; যাকে তাকে শাসন ক'রে ভয় দেখায়! রজত যেন গঙ্গাবতীর অভিভাবক। গঙ্গাবতীর নামে কেউ কিছু বলতে পারে না, রজত কুলিমজুরদের চাবকাতে পশ্চাৎপদ নয়! কুলি বস্তির সকলেই রজতকে তোয়াক্কা ক'রে চলে—তবে কলঙ্ক রটাতে কেউ কম নয়!

শ্যামজী প্রথম প্রথম রজতকে কোন পাত্তাই দেননি। যেখানে তাঁর মত লোক প্রণয়প্রার্থী সেখানে দাঁড়াবে রজত! শ্যামজী অনুচরদের নিকট রজত সম্পর্কিত অর্থাঙ্কর কথা শুনে হেসেচেন! তাঁর অধীনে, তাঁর মিলে যে সামান্য মাইনেতে চাকরি করে, সে ক'রবে তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতা! মেয়েদের বয়স যত কমই হোক; চরিত্র যত ভালই হোক টাকাকে ওরা ভাল ক'রেই চিনে! রজতের সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত ছিলেন! নিশ্চিত ছিলেন বলেই ধীরে ধীরে মায়াজাল বিস্তার ক'রতে-ছিলেন গঙ্গাবতীর ওপর! রজত আসবে প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে! শ্যামজী নিজে নিজেই হো-হো ক'রে হেসে উঠেন! ভাবেন—পারবে রজত গঙ্গাবতীকে সোনারূপায় পরিমণ্ডিত ক'রে দাসদাসী দ্বারা পরিবৃত ক'রে

রাখতে? পারবে বাগান বাড়িতে অধিষ্ঠিত ক'রে মিনার্‌ভা, রোলস্‌ রয়েস গাড়ি চড়াতে? পারবে সে প্রতিদান না পেয়েই বাড়ি মেরামত ক'রে দিতে, পারবে—বাড়ির সুমুখে জলের কল বসাতে, পারবে রজত মাইনে বাড়িয়ে দিতে?'

রজতকে শ্যামজী বরাবর তুচ্ছ ক'রে গেছেন, তবে মনে মনে রজতের ওপর বিরূপ ছিলেন, ভয়ও যে একটু না ছিল তা' নয়—রাইভ্যাল্‌ কথাটা মানুষকে পীড়া দেয়, সন্দিগ্ধ করে! ক্রমে তাঁর চোখে পড়লো রজতকে গঙ্গাবতীর পাশে; ঘনিষ্ঠভাবে এরা আলাপ করে, হাসে, অভিমানও যেন করে—ব্যাপার কি? অত খাতির কেন?

কানাই রজতের নিকট টাকা আদায় ক'রতে না পেরে শ্যামজীর নিকট কল্পিত রোমাঞ্চকর বিবৃতি প্রদান ক'রলো! গঙ্গাবতীকে রজতই রাখুক বা শ্যামজীই রাখুন তাতে বড় বেশি কানাই'র মাথা ব্যথা নেই, তার টাকা পেলেই হ'লো! কানাই রজতকে পুলিসের ভয়, শ্যামজীর ভয় দেখিয়ে গিয়েছিল টাকা আদায় ক'রতে, রজত কানাইকে চাবুক মারতে মারতে বাড়ি থেকে বের ক'রে দেয়! কানাই পুরস্কারের আশায় এবং অপমানের প্রতিশোধ তুলবার জন্যে কল্পিত কাহিনী চাক্ষুষ প্রমাণ ব'লে শ্যামজীর নিকট নালিশ ক'রলো! শ্যামজী এর পর আর নিশ্চেষ্ট থাকতে পারলেন না! কত বড় স্পর্দ্ধা যে তার মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় সেদিনকার এক অজ্ঞাত, চালচুলাহীন বাঙালী ছোঁড়া! ভাবখানা এই যে—মেষশাবক কেড়ে নেবে ব্যাঘ্রের মুখের গ্রাস! তবে এক বিষয়ে তিনি উৎফুল্ল হ'লেন! গঙ্গাবতীর উৎকট সতীত্বে তিনি কোন সুবিধা ক'রতে পারেন নি, রীতিমত ভয় ছিল, গঙ্গাবতীকে হাত করার প্রতি যথেষ্ট সন্দেহ ছিল! কানাই গঙ্গাবতীর স্বামী, সে যখন চাক্ষুষ প্রমাণ দিয়েচে তবে নিশ্চয়ই

গঙ্গাবতী অসতী। রজত তার ভালমানুষি, নবযৌবন ও সৌন্দর্য্য নিয়ে গঙ্গাবতীকে হাত ক'রতে পেরেচে! একবার যখন গঙ্গাবতী গোপন অভিসারে নাম লিখিয়েচে তখন সে স্বেচ্ছায় ছুটে আসবে! গঙ্গাবতী যখন শ্যামজী ও রজতের ঐশ্বর্য্যের ওজন ক'রবে তখন রজত অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শিত হ'য়ে বিতাড়িত হবে! তা হোক, সে আশায় কেউ চুপ ক'রে থাকতে পারে না! অদিশায় শ্যামজী রজতকে বিপদে ফেলবার জন্যে সুযোগ খুঁজতে লাগলেন!

রজত শ্রমিক সমিতি ক'রবার চেষ্টায় আছে! লোকের অভাব, দলের মধ্যে ত' সে নিজে, গঙ্গাবতী, পাশের বাড়ির বন্ধু লাল সিং, লাল সিংহের স্ত্রী, চার পাঁচজন কুলি যুবক! রজত নিজের বাড়িতে শ্রমিক সমিতির অফিস ক'রলো। শ্রমিক নেতা শ্রীযুক্ত জয়কে করলো সভাপতি, নিজে হলো সম্পাদক; সহ-সম্পাদক করলো একটি কুলি যুবককে! রোজ রবিবার বিকাল বেলা সভা হয়! সভা মানে—পাঁচ ছ' জনে মিলে শ্রমিকদের উন্নতির, সুবিধা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে! শ্রমিক সংক্রান্ত বক্তৃতা, দেশী ও বিদেশী গ্রন্থ পাঠ ক'রে শোনানো হয়! প্রায় রোজ রাত্রে কুলি যুবকেরা আসে; রজত ওদের পত্রিকা পড়ে শোনায়, লেখাপড়া শেখায়! ধীরে ধীরে একটি দু'টি ক'রে সভ্য বাড়তে লাগলো!

সন্ধ্যা হ'য়ে আসচে। অস্তরাগের সিন্দুরগোলা পশ্চিমাকাশের জমাট ধোঁয়ার মত জলস্ফটিকের ওপর বিচ্ছুরিত হ'য়ে লালে লাল ক'রে দিয়েচে! রঙের দীপালি ওই পশ্চিম নীলাকাশে! স্নেহময়ী জগৎমাতার আশীর্ব্বাদের মত পবিত্র, শুভ্র, মধুমাখা বিবস্বানদেবের রক্তাভা সুউচ্চ নারিকেল, তমাল, বট, অশ্বত্থ, সুপারি বৃক্ষের শিরে! মৃদুমন্দ মলয়-পবনে ওরা বিদায় অভিনন্দন জানাচ্চে। ওই রঙের মাঝে, প্রকৃতির সোহাগভরা মোহিনীরূপে মনটাকে আনমনা ক'রে দেয়!

রজত আরাম-কেদারায় শুয়ে বিশ্বপ্রকৃতির রূপ হেরে' ভাবে তন্ময় হ'য়ে যায়! ওই সুন্দর অস্তরাগের নীলাকাশ; পাখীর কলতান; মৃদু-মন্দবায় হিল্লোল—লতাপল্লবের যৌবন-শাখা-প্রশাখায়, বালক-বালিকার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর মনকে গৃহমুখী ক'রে তোলে, কাব্যের স্ফুরণ এনে দেয়!···এই তো নিশুতি রাত, মৃত্যুর মত নিশ্চল, বিভীষিকার মত রহস্যময়ী, দৈত্যের মত ভয়ঙ্কর—এর মাঝেও ফোটে ফুল, নবধারে হয় আনন্দ বরিষণ, যুগ যুগ ধ'রে শাশ্বত হ'য়ে থাকে প্রিয়ার অভিসার।··· ওই শোনা যায় সমুদ্রের গর্জ্জন, কত আন্দোলন ঐ বিশাল, অসীম বুকের পরতে পরতে! ওর ছোঁয়া কি মানুষের লাগে নি?··· চাঁদিনী রাতে মাঠের প্রান্তরে, হয়ত' তেপান্তরের ধারে বসে কে বাঁশি বাজায়—বিরহের অশ্রু শিশিরকণার মত ঝরে পড়ে! রজত সন্ধ্যার কোলে গা এলিয়ে হয়ত' বাড়ির কথা ভাবচে! বাড়ি ত' তার নেই, বাড়িতে তার প্রিয় অপ্রিয় কোন লোকই নেই—দুনিয়াতে সে ত' একা! হোক সে একা, হোক না সে ব্যথার দাগায় বিপর্য্যস্ত তবু জন্মভূমিকে ভুলতে পারে না, জন্ম ভূমির কথা দুর্ব্বলমুহূর্ত্তে মনকে ভারাক্রান্ত ক'রে তোলে, চক্ষু সজল হয়, দেহের চলৎশক্তি শিথিল হয়, ধীরে ধীরে বড় নিশ্বাস পড়ে। ° ° °

'কি ভাবচেন অত গম্ভীর মনে?'

'কে?' রজত গা মোচড়ে বল্‌লে 'ও-তুমি! বোস্ বোন বোস্!'

গঙ্গাবতী বল্‌লে 'আমাদের সভার কি হ'লো?'

রজত বল্‌লে 'আসচে রোববার ঐ খোলা মাঠটাতে মিটিং করা যাবে। ক্যালিকো, জয়ন্তী, যুগল কিশোরী প্রভৃতি মিলে লোক পাঠিয়েচি—বেশ বড় রকম মিটিং হবে আশা করা যায়! শ্রমিকদের যদি একত্রী করানো যায় তবে আমাদের শ্রম, প্রচেষ্টা, উদ্দেশ্য সার্থক হবে!

যত ক্ষুদ্রই হোক না আমাদের শক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি—যদি আমরা একটু উপকার ক'রতে পারি তবু জীবন কৃতার্থ! আমি এখন খুব বড় কিছু আশা করিনে—যদি শ্রমিকদের জাগ্রত ক'রবার প্রবলশক্তি ছড়িয়ে দিয়ে যেতে পারি তবেই কাজ হবে! কেউ কাউকে সব কিছু হাতে তুলে দেয় না, দিলেও সহজ লভ্য দান অনুপযুক্ত লোক রাখতে পারে না! শ্রমিকরা যদি নিজের ত্যাগ, কষ্ট, পীড়ন সহ্য ক'রে অর্জ্জন ক'রতে পারে তবে কেউ কেড়ে নিয়ে দু'দিনের বেশি আটকিয়ে রাখতে পারবে না! একথা সত্য যে শ্রমিকদের ষোল আনা প্রাপ্য শ্রমিকদেরই নিতে হবে! শ্রমিকদের যদি বুঝাতে পারি যে ওরা শ্রমিক, ওরা সভ্যতার প্রাণশক্তি, চিনাতে যদি পারি ওদের নগ্নরূপ তবে কারো সাধ্য নেই যে ওদের আটকিয়ে রাখতে পারে, কারো সাধ্য থাকবে না—ওদের ন্যায্য পাওনা থেকে আর বঞ্চিত ক'রে রাখতে পারে!'

'শুনেচি এই আন্দোলনে যোগ দিলে জেল হবার ভয় নাকি আছে। যদি আপনার জেল হয়, তবে কি উপায় হবে?'

'আমার যদি জেলই হয় তবে কোন দুঃখ থাকবে না। দুনিয়াতে আমার ওপর কেউ নির্ভর ক'রে নেই, কারো মুখ পানে চেয়ে আমাকে চলতে হয় না। আমি তো মুক্ত, আমি বন্ধনহীন, আমার জেলই কি ঘরই কি যে সংযত হ'য়ে চলতে হবে! আমি হাসি মুখে জেলে যেতে পারি যদি জানতে পারি যে আমি অন্যায় করিনি, শ্রমিকদের একটু উপকার ক'রেচি!'

'জেলে যে বড় কষ্ট—যক্ষ্মা রোগ, টি-বি নাকি হয়!'

রজত হেসে বল্‌লে—রোগ, দুঃখ, কষ্ট জেলের অন্তরায় নয়! আগুন যখন লাগে তখন সে দমকলের কথা মনে ক'রতে পারে না! অন্যায় না ক'রলে জেল হয় না, শান্তি ভঙ্গ ক'রলে জেল হ'তে পারে অতএব জেলের

কোন আশঙ্কা নেই। অবশ্যি কেউ যদি শত্রুতা না করে। আচ্ছা—আমি যদি সত্য সত্যই জেলে যাই তবে তোমার সব চেয়ে বেশি দুঃখ হবে—না ?'

শ্রেষ্ঠ রঙের পরশ লাগলো গঙ্গাবতীর গালে !

গঙ্গাবতী বল্‌লে—অত ভীতু ভাব্‌বেন না আমাকে। আমাদেরই পূর্ব্ব পুরুষরা স্বামী, পুত্র, ভাইকে রণ শয্যায় সাজিয়ে দিতো ! ছোট বোনটির শরীরে আর্য্য রক্ত একটু হলেও আছে দাদা !

চাকর চা দিয়ে গেলো ! রজত চায়ের সজল ধোঁয়ার মাঝে মুখখানি রেখে একটু একটু ক'রে চা পান ক'রতে লাগলো। খানিক নিঃশব্দের পরশ দু'জনের মনের কোমল পরতে সুড়সুড়ি কেটে গেলো।

গঙ্গাবতী বল্‌লে—আজ কি ছাত্র পড়াবেন, না বেড়াতে বেরোবেন ?'

'কোথায় আর বেড়াতে যাবো—এই নীল আকাশ, হীরক টুকরায় রচিত নক্ষত্রপুঞ্জ, গলিত রূপার মসৃণ চাঁদ, বিস্তৃত খোলা মাঠ, সমুদ্রের জলোহাওয়া আমার অতি প্রিয় ! শহরের হট্ট গোলের চেয়ে এই নির্জ্জন স্থান আমার অনেক প্রিয়, অনেক ভাল ! শহরে গিয়ে পরনিন্দা, কুৎসা, বাজে বকাবকি করার চেয়ে এখানে বসে অশিক্ষিত লোকদের লেখা পড়া শেখানো, পত্রিকা পড়ে দেশের অবস্থা জানানো ঢের-ঢের ভাল ! তোমাদেরও লেখাপড়া শেখা উচিৎ, দেশের খবর রীতিমত জানা কর্ত্তব্য। আমাদের যে মিটিং হবে না, ওতে তোমার বক্তৃতা ক'রতে হবে কিন্তু !'

'ওরে বাবা ! আমি ক'রবো বক্তৃতা তবেই হ'য়েচে। মুখ থেকে কথাই সরবে না ; তারপর বলবোই বা কি ছাই ! কিছু জ্ঞান থাকাও তো চাই !'

'বাঃ! কুলিদের দুঃখ দুর্দ্দশা, কুলি রমণীদের প্রতি অত্যাচার অবিচার, শ্রমিকদের সমবায় সমিতি, শ্রমিক ও ধনিকদের মধ্যে কি ক'রে যোগাযোগ হওয়া সম্ভবপর—কত কথা আছে বলবার!'

'একে তো আমি বলতেই পারবো না, তারপর আজ আমি বক্তৃতা দিই কাল আমার জেল হোক। জেলে আমি পচতে পারবো না!'

'জেলকে অত ভয় কেন?'

'আপনার মত তো আমি মুক্ত নই, স্বাধীনা নই যে, যা' খুশি তাই ক'রলাম! আপনার পথ চেয়ে কেউ বসে নেই, কিন্তু আমার পথ চেয়ে বসে থাকে সন্তানের দল! আমি যদি জেলে যাই তবে আমার ছেলে মেয়েদের কি উপায় হবে?'

'আমি ওদের দেখা শোনা ক'রবো! দাদাকে অতটুকু বিশ্বাস ক'রতে পারো!'

'বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয়! স্ত্রীর স্বামীর চেয়ে বড় কিছু নেই, অথচ আমার জীবন এমনি অভিশপ্ত যে—' গঙ্গাবতী চুপ ক'রে গেলো, হয়ত' যা' মনে জেগেচে তা' বলবার মত ভাষা পাচ্ছে না, হয়ত' বা বিরাট ব্যথাটা তাকে আক্রমণ ক'রেচে, ব্যথার কথা বলবার মত আর শক্তি নেই, দুর্ব্বলতা তাকে মুহ্যমান ক'রে দিয়েচে। গঙ্গাবতী একটু চুপ্ ক'রে থেকে বল্‌তে লাগলে 'আপনার সঙ্গে যদিও আমার রক্তের সম্পর্ক নেই, মাতৃভাষা এক নয়, আচার ব্যবহারেরও পার্থক্য আছে তবু আপনাকে আমি সকলের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করি, শ্রদ্ধা করি! আপনার অন্তর-দেবতা জগত পূজ্য—তাঁকে যে ভালবাসতে না পারবে, শ্রদ্ধা না ক'রতে পারবে তার দুর্ভাগ্য কম বড় নয়!'

'এতই যদি তোমার বিশ্বাস, এতই যদি প্রিয় তবে দেশেরও দশের কল্যাণের জন্যে জেল খাটতে তোমার আপত্তি কি?'

'আমি যদি জেলে যাই তবে কি আমাদের দল-নেতা বাদ পড়বে মনে করেন ?'

'দল-নেতা বাদও পড়তে পারেন, আইনের ধারা সমঝে চল্‌লে বিপদ নেই—অবশ্যি শত্রু পক্ষ বিপদে ফেলতে ত্রুটি ক'রবে না ! যদি জেলেই যাই তবে তুমি নিশ্চিত থেকো যে তোমার ছেলেমেয়ে কালের স্রোতে ভেসে যাবে না ওদের আমি সুবন্দোবস্ত ক'রেই যাবো !'

'আমি আপনাকে ভিন্ন আর কাউকে বিশ্বাস ক'রতে পারিনে ! ছেলেমেয়েকে অন্যের নিকট রেখে আমি একদিনও বাঁচতে পারবো না !'

রজত হেসে বল্‌লে 'তুমি ছেলেমেয়ের ব্যাপারে আমাকেও বিশ্বাস ক'রতে পারবে না—তা' আমি বুঝতে পারি ! মাথা ঝুঁকলে কি হবে, এতটুকু মনস্তত্ব জ্ঞান আমার আছে ! তোমাকে আমি চিনতে পেরেচি। এইটুকু ভবিষ্যৎ বাণী ক'রে রাখচি, যদি কোনদিন ফলে, আমার কথা মনে ক'রো ! তুমি সন্তানকে ছেড়ে বৈকুণ্ঠে গিয়েও বাস ক'রতে পারবে না, পুত্রের জন্যে তুমি সম্ভব অসম্ভব অনেক কিছু ক'রতে পারো—যা তুমি এখন ভাবতেও শিউরে উঠবে। জেল তো জেল অতি নিম্ন পথও অবলম্বন ক'রতে পারো সন্তানের জন্যে।'

রাত্রির জড় অন্ধকার পৃথিবীর সৌন্দর্য্যকে কালো যবনিকাবৃত ক'রে দিতে লাগলো ! পাখীর ঝাপটা-ঝাপটি ক্রমশ থেমে আসচে, থেমে গেচে ওদের গৃহমুখী কলতান !

ভৃত্য ঘরের বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে চায়ের কাপ তুলে নিয়ে গেলো !

গঙ্গাবতী উঠি উঠি ক'রে বল্‌লে—রাত হ'য়ে গেচে, এবার উঠি ! গত মাসে পাঁচ টাকা ধার নিয়েছিলাম, এই নিন্ আপনার টাকা !'

'অসুবিধে হলে টাকা নিয়ে যেতে পারো, আমার এখন প্রয়োজন নেই, পরে সুবিধে মত দিলেই হবে !'

'এখন আমার হাতে টাকা আছে, বিপদে আপদে তো নিয়েই থাকি। আপনি না থাকলে যে আমার কি দশা হ'ত ভগবান জানেন!'

গঙ্গাবতী রজতের হাতে পাঁচটি টাকা রেখে উঠে দাঁড়ালো! হঠাৎ দু'টি লোক পেছন থেকে এসে সুমুখে দাঁড়ালে। গঙ্গাবতী ও রজত আচম্বিত হ'য়ে দেখলে কানাই ও শ্যামজীকে! দরজা দিয়ে ঠিকরে পড়া বৈদ্যুতিক আলোয় রজত দেখতে পেলে শ্যামজীর মুখে ক্রূর হাসি, কানাইর মুখে বীভৎসতা! কানাই ও শ্যামজী মাতাল হ'য়ে এসেচেন, দেহ একটু একটু টলচে, চক্ষু লাল!

কানাই টলতে টলতে হাত পা নেড়ে কাঁদ কাঁদ স্বরে বল্‌লে—এই দেখুন হুজুর! আপনি আমাদের মা বাপ, আপনি যদি এর বিহিত না করেন তবে আমরা গরিব লোক মাগ পুত্র নিয়ে ঘর করি কি ক'রে? এই ব্যাটা আমার কুললক্ষ্মী, সতী সাধ্বী স্ত্রীকে মজিয়েছে, ওনাকে একদণ্ড ঘরে রাখতে পারি না! দোর দিয়ে ঘরে—'

রজত ধমকে বল্‌লে—চুপ্‌ রাও শূয়র কা বাচ্চা, মাতলামির আর জায়গা পাওনি! বের হ বলচি বের হ—!

কানাই চেঁচিয়ে বল্‌লে—বের হ' বল্‌লেই বের হই আর কি। মাগী চোর, বউ চোর। হুজুর! আপনি মা-বাপ, দয়াবতার, আপনি এর বিহিত করুন।'

শ্যামজী নবাবী মেজাজে গঙ্গাবতীকে জিজ্ঞেস ক'রলেন—এই মাগি। অন্ধকারে তোরা কি ক'রছিলি?'

কানাই বল্‌লে—ওকে আবার জিজ্ঞেস ক'রচেন কি। ধরে নিয়ে চলুন। আপনার বাগান বাড়িতে ধ'রে নিয়ে যান নতুবা এই ব্যাটার জন্যে আমার সতী স্ত্রীকে রক্ষা ক'রতে পারবো না। আমায় কলঙ্ক

থেকে রক্ষা করুন হুজুর—।' কানাই শ্যামজীর চরণ ধরে ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে ফেল্‌লো।

মাতালদের বীভৎস মাতলামিতে রজতের ধৈর্য্যের বাঁধন বহু পূর্ব্বেই শিথিল হ'য়ে গেছে, শ্যামজী যেমনি চলন্ত গঙ্গাবতীর বেগ আটকে ধরলেন হাত ধরে', রজত 'স্কাউন্‌ড্রেল' বলে আস্তিন গুটিয়ে শ্যামজীর দিকে এগিয়ে গেলো।

কানাই লাফিয়ে রজতের স্মুখে গিয়ে বাধা দিয়ে অশ্লীল ভঙ্গিমায় বল্‌লে—তুমি শালা কে যে আমার সতী পরিবারকে ছুঁতে দেবে না? আম্মার মাল, আমি যাকে খুশি বিলিয়ে দেবো, তুমি বাপু কে হে?'

রজত বারুদের মত জ্বলে উঠে কানাইকে হঠাৎ এমনি একটা ধাক্কা মারলে যে কানাই আর্ত্তনাদ ক'রে মেঝের ওপর পড়ে গেলো। রজত কানাই'র প্রতি ভ্রূক্ষেপ না ক'রে শ্যামজীকে ভয়ঙ্কর স্বরে বল্‌লে—'You drunkard scoundrel! off your hands! (মাতাল দুর্ব্বৃত্ত হাত সরাও) মাতলামির আর জায়গা পাওনা! Get out—out (বেরিয়ে যাও) or'—ঘুসি বাগিয়ে ধরলো।

'কি বল্‌লি?' শ্যামজী রজতের স্মুখে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—'আমায় বলচিস স্কাউনড্রেল, মাতাল। আমার বাড়িতে বাস ক'রে আমায় বলিস বেরিয়ে যাও। তোকে আমি শেষ ক'রে দেবো। কার মিলে চাকরি করিস তা' জানিস?'

'Damn your job! চাকরিকে রজত থোড়াই কেয়ার করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এ বাড়ি আমার possession-এ (অধীনে) আছে ততক্ষণ আমার অনুমতি ভিন্ন এ বাড়িতে প্রবেশ ক'রবার কারো ক্ষমতা নেই। I can have legal suit for trespass. (অনধিকার প্রবেশের জন্য মোকদ্দমা ক'রতে পারি)।

শ্যামজী রজতের প্রতি মারমুখো হ'য়ে আস্ফালন ক'রে বল্‌লেন 'আমার নামে case ক'রবে! আমার খেয়ে আমার ওপর চোখরাঙানো! অতদিন কিছু বলিনি, শেখাচ্চি মজা! পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রকাশ্যে ব্যভিচার করা; ব্যাটা বদমাইস, চরিত্রহীন, নচ্ছার!'

রজত হো-হো-হো ক'রে বিকট হাসি দিয়ে বল্‌লে 'শতাধীক নারীকে জোর জুলুম ক'রে অসতী ক'রে, মদের বোতল শেষ ক'রে এসে বলে কি না আমি চরিত্রহীন, বদমাইস! বলে রাখচি—আমি যতদিন এ শহরে আছি ততদিন এই অবলা নারীর কোন ক্ষতি ক'রতে পারবেন না! একটি নারীর সতীত্বের বিনিময়ে আমি অকাতরে প্রাণ দিতে পারি! আমি আপনাকে সহজে নিষ্কৃতি দেবো না!'

শ্যামজী মুখ বিকৃত ক'রে বল্‌লেন—কত হাতী ঘোড়া আমার হাতে অক্কা পেয়ে গেলো এখন চামচিকা বলে 'কত বল?' (গঙ্গাবতীকে লক্ষ্য ক'রে) এই মাগি! অন্ধকারে এই বদমাইস ছোঁড়ার নিকট অতক্ষণ ধরে কি ক'রছিলি? আমার মিলে চাকরি ক'রে, আমার জায়গায় থেকে দিন দুপুরে স্বেচ্ছাচারিতা ক'রচিস!'

শ্যামজী গঙ্গাবতীর হাত চেপে ধরলেন! রজত নিমেষে গঙ্গাবতীকে মুক্ত ক'রে বল্‌লে—তুমি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি যাও বোন! ভাই বোনকে প্রাণ দিয়েও রক্ষা ক'রবে!'

গঙ্গাবতী ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলো; শ্যামজী রজতের বলিষ্ঠ দেহের ভয়ে বাধা দিতে সাহস পেলেন না; অপমানে, রাগে, মনের আক্রোশে কানাই'র ঝুটি ধরে তুলে গর্জ্জে বল্‌লেন—ব্যাটা দিব্যি পড়ে পড়ে ঘুম দিয়েচে, এদিকে মাগী পালিয়েচে!'

কানাই 'এ্যাঁ' বলে লাফিয়ে উঠে রজতের সুমুখে পড়ে গিয়ে ভয়ে সরে দাঁড়ালো! রজতের ভয়ে মাথা তুলতে পারচেনা, শরীর কাঁপচে!

শ্যামজী বললেন—চল্ থানাতে! এক্ষুণি গিয়ে ব্যভিচারের মামলা লাগাবি, খরচ দেবো আমি।

কানাই আরো তফাতে সরে দাঁড়িয়ে বল্‌লে 'চলুন হুজুর! আমার বিয়ে করা স্ত্রীকে একেবারে অপবিত্র, একেবারে যাচ্ছেতাই নষ্ট ক'রে দিয়েচে। ব্যাটা বাঙ্গাল দেশের ভূত! এবার জেলে গিয়ে পচো। চলুন হুজুর!' একটু এগিয়ে গিয়ে নিম্ন স্বরে বল্‌লে 'বাঙ্গাল বাবুকে তাড়াতে পারলে হুজুরের আর কোন বেগ পেতে হবে না!'

রজত স্তব্ধ হ'য়ে শ্যামজী ও কানাই'র গতির পথে তাকিয়ে রইলে। ক্ষণিকের মধ্যে মোটর গাড়ি ভো-ভো ক'রে সহরের দিকে বেরিয়ে গেলো! রজতের মনে প্রশ্ন উঠলে 'মানুষ কি অত বড় জঘন্য প্রকৃতির হ'তে পারে? মানুষ চোর হ'তে পারে, ডাকাত হ'তে পারে, খুনী হ'তে পারে, মাতাল চরিত্রহীন হ'তে পারে কিন্তু দেবীতুল্যা সতীসাধ্বীর, অপূর্ব্ব সুন্দরী স্ত্রীর স্বামী কি ক'রে অত হীন নারকীয় কীট হ'তে পারে? ভগবান! এ তোমার কি রহস্য—স্বর্গের বক্ষে জীবন্ত নরক সৃষ্টি ক'রে? এই কি তোমার আকাশ-পাতাল? ০ ০ ০

শ্যামজী রজতকে যথেষ্ট ভয় করেন, বিশেষতঃ রজতের দুর্দ্ধর্ষ দলটাকে! রজতের নামে ব্যভিচার মামলা লাগাতে সাহস পেলেন না, কম্যুনিষ্ট, রাজদ্রোহী বলে পুলিশে রিপোর্ট দিলেন! বস্তির বহু সর্দ্দার, মিলের বিশিষ্ট লোক সাক্ষ্য দিলো যে রজত রাজদ্রোহী, সে একটা গুপ্ত দল ক'রেচে, গোপনে ওদের সভাসমিতি হয়।

রজতের বিপক্ষে যে মিথ্যা ষড়যন্ত্র চলচে তা' রজত জান্‌তে না পারলেও বুঝতে পেরেচে! শ্যামজী যখন শত্রু হ'য়ে দাঁড়িয়েচেন তখন তিনি টাকার প্রভাবে যা' খুশি সম্ভব ক'রে তুলে অজাতশত্রু হ'বেন! গোপনে যে ভয়ঙ্কর একটা ষড়যন্ত্র চলচে তা রজত কানাই ও শ্যামজীর মোকদ্দমা

না করা ও শ্যামজীর হাসিমুখে ভাল ব্যবহার হ'তে বুঝতে পেরেচে! শ্যামজী যদি হাসিমুখে তার কুশল, উন্নতি কামনা না ক'রে গম্ভীর মুখে খারাপ ব্যবহার ক'রতেন তবে, রজত অত ভয় ক'রতো না! রজত নিজের জন্যে ভাবে না, তার বড় ভাবনা গঙ্গাবতীর জন্যে, শিগ্‌গীরই একটা বন্দোবস্ত করা অবশ্য প্রয়োজন।

এক ভরসা লাল সিং! লাল সিং অল্প মাইনে পায়, স্ত্রী, পুত্রের খরচ চালিয়ে বিশেষ বাঁচাতে পারে না? আর্থিক সুবিধা বিশেষ কিছু হবে না, লাল সিংহের স্ত্রী অতি ভাল, অতএব দেখাশোনার বিশেষ অসুবিধে হবেনা! তবে শ্যামজী যখন পেছনে লেগেচেন তাকেই কি নিষ্কৃতি দেবেন! ০ ০ ০

গঙ্গাবতী চিন্তিত, ভীতভাবে প্রবেশ ক'রে রজতকে চিন্তাকুল দেখে একটু চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে 'কি উপায় হবে? আমি শুনেচি আপনাকে নাকি রাজদ্রোহী, মিলের শান্তিভঙ্গকারি বলে পুলিশে ধরিয়ে দেবে! আপনি আজই দেশে পালিয়ে যান।'

'আমি পালাতে পারিনা, মিথ্যা ষড়যন্ত্রের ভয়ে পালাবো—অসম্ভব! আমার জন্যে কোন দুঃখ ক'রোনা! আমার আর কোন চিন্তা নেই, চিন্তা শুধু তোমার জন্যে। তোমাকে যদি নিরাপদ ক'রতে পারতাম তবে আমি আমরণ কারাবাস ক'রতে ভয় পাইনে। একটি কথা মনে রেখো—কানাই বিয়ের-মন্ত্র বলে তোমার যত বড় দেবতাই হোক, তার সকল পাপ ক্ষমা করা যত বড়ই তোমার সতীধর্ম্ম হোক, ওকে কোন সময়ে বিশ্বাস করোনা। কানাই যে প্রকৃতির, তার দ্বারা কোন কিছুই অসম্ভব নয়। দাদার এ কথা বিশ্বাস ক'রো—অমন স্বামীকে ত্যাগ ক'রলে ভগবান খুশিই হবেন; নারী জাতির আশীর্ব্বাদ পাবেই! সংস্কারে হয়ত' তোমার বাঁধচে, অতবড় বিদ্রোহ ধাতে সয় না কিন্তু যে স্বামী অত্যাচারের

'পর অত্যাচারে জর্জ্জরিত ক'রে সতী স্ত্রীকে কুপথে নাবিয়ে নিজের কুকার্য্য ভাল ক'রে ক'রবার জন্যে টাকা রোজগার ক'রতে চায়, তাকে ক্ষমা করা যায় না। চরিত্রহীন, মাতাল, চোর, খুনীকে ক্ষমা করা চলে কিন্তু কানাইকে ক্ষমা করা যায় না। অনিচ্ছাকৃত পাপ ক্ষমার্হ, কিন্তু স্বেচ্ছাকৃত পাপের ওপর পাপ যে ক্ষমা করে, সে অন্যায়কে সমর্থন করে।' রজত একটু ভেবে মনিব্যাগ থেকে ন'টা দশ টাকার নোট বের ক'রে বল্‌লে "এই নাও নব্বই টাকা, আপদে বিপদে কাজ দেবে! হয়ত' দাদার এই শেষ সাহায্য। আমাকে যে কোন মুহূর্ত্তে পুলিশ ধরতে পারে। টাকা নিতে কোন আপত্তি ক'রোনা, তুমি না নিলে টাকাগুলি জলে যাবে।'

গঙ্গাবতী করুণ স্বরে বল্‌লে 'মুক্তির কি কোন পথ নেই?'

'থাকলেও আমি পাবোনা কারণ শত্রুপক্ষ আমাকে সরাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা ক'রবে!' ০ ০ ০

হঠাৎ রজতকে আচম্বিত ও গঙ্গাবতীকে ভীত ক'রে একদল পুলিশ এসে হানা দিলো! পরোয়ানা দেখিয়ে পুলিশ রজতকে হাতকড়া লাগালো। গঙ্গাবতী 'ও মাগো' বলে ক্ষীণ আর্ত্তনাদ ক'রে মুখ ঢাকলো।

রজতের বাক্স, বিছানা, খাতা পত্তর সব অনুসন্ধান ক'রে পুলিশ রজতকে নিয়ে গাড়িতে তুল্‌লো!

'বিদায় বোন! বিদায়! যাবার বেলায় এইটুকু বলতে পারি যে বিবেক, বুদ্ধি ঠিক রেখে চলো কোন বিপদ কাবু ক'রতে পারবে না! দুঃখ রইলো কোন পথ ক'রে যেতে পারিনি, অত শিগ্‌গীর যে বন্দী হবো তা' ভাবতে পারিনি! দাদার আশীর্ব্বাদ রইলো—সত্যপথে চলো!'

মোটর লরী ভো-ভো-ঘর্‌-ঘর্‌ ক'রে গঙ্গাবতীর ভীত, কম্পিত, উদ্বেলিত কান্নার বেগকে দলিত ক'রে নিমেষে অদৃশ্য হলো!

রজত রাজবন্দী হ'য়ে বক্সার গেলো। ০ ০ ০

— এগারো —

কানাই মিলের কাজ একেবারে ছেড়ে দিয়ে গঙ্গাবতীর বাড়িতে এসে স্থান নিলে। কোথায়ও মজুরী খাটে না, গঙ্গাবতীর রোজগারের ওপর জীবন চালাতে আরম্ভ ক'রলে। গতর খাটাবার প্রবৃত্তি আর নেই। জানে, ভাল ক'রেই বুঝে যে গঙ্গাবতী নিজের জন্যে না হোক অন্ততঃ সন্তানের জন্যে গতর খেটে রোজগার ক'রবে, অতএব তার বিনা পরিশ্রমে দু'বেলা আহার যুটবেই। এত অধঃপতনে গিয়েছে যে কারো উপদেশ মানবে না, শুনবে না, চটে উঠে পাঁচ কথা শুনিয়ে দেয়! স্ত্রী যদি কোন কথা বলে তবে ভীষণ ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠে, এমনি ভাবে দাঁত খিঁচিয়ে বকাবকি করে যে ভয় হয়—আর একটি কথার প্রতিবাদ ক'রলেই মারধর আরম্ভ ক'রবে। দারিদ্র্যের কশাঘাতে গঙ্গাবতী চুপ ক'রে থাকতে পারে না, স্বামীকে বোঝাতে চায়, চোখে আঙ্গুল দিয়ে অভাব অভিযোগ দেখিয়ে দেয়, বোঝাতে চেষ্টা করে—স্বামী বুঝতে চায় না, স্বামিত্বের দাবিতে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ায়, আস্ফালন করে। গঙ্গাবতী থামে না স্ত্রীর কর্ত্তব্য হ'তে ; প্রাণপণে অতীত সুখের ইতিহাস নয়নের পাশে এনে স্তরে স্তরে সাজায়, হৃদয়ের দুর্ব্বল তন্ত্রীতে মৃদু ঘা দিয়ে মূর্চ্ছনা জাগাতে চায়, দেখিয়ে দিতে চায় অতীত ও বর্ত্তমানের ব্যবধান, পরিবর্ত্তন, ভবিষ্যতের বিভীষিকা—দৃষ্টিহীন নয়ন দেখতে পারে না, পাষাণে গড়া হৃদয়-দোর খুলে না।

এমনি ভাবে বেশিদিন চললো না। সংসার অচল, আর জোর জবরদস্তি করেও সংসারের খরচ চলে না। এখন রজত নেই যে, বিপদে সাহায্য ক'রবে। অনাহারে, অখাদ্যে ছেলেপিলেগুলি সব রুগ্ন হ'য়ে যাচ্ছে, ক্রমাগত অসুখবিসুখে সব জীর্ণশীর্ণ হ'য়ে গেছে; অসুখবিসুখ বাড়িতে লেগেই আছে। ছেলেপিলেগুলি মরণ-পথে এগিয়ে চলেছে; কানাই'র কোন চৈতন্য নেই। সে সংসারের কোন ধার ধারে না। আসে, যায়, ছু'বেলা পেট ভরে খায়, আপন মনে ঘুমায়, ঝগড়াঝাটি করে, রাগের মাথায় সবাইকে মারধর করে, জোর ক'রে গঙ্গাবতীর রোজগারের টাকা নিয়ে মদ খায়, কুপল্লীতে গিয়ে আমোদ করে। বেকার হ'য়ে স্ত্রীর কষ্টার্জ্জিত টাকায় জীবন চালিয়ে, জোর জবরদস্তি ক'রে—টাকা ছিনিয়ে নিয়ে কুপল্লীতে কুৎসিত আমোদ আহ্লাদ ক'রতে একটকুও দ্বিধাবোধ করে না, লজ্জা-বোধ করে না। অভুক্ত ছেলেমেয়ের, স্ত্রীর মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে বলে একটুও সঙ্কোচ বোধ করে না। চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছে যে, স্ত্রী প্রাণপণ খেটে সংসার চালাচ্ছে, এত পরিশ্রম ক'রছে শুধু সন্তানদের বাঁচাবার জন্যে—আর সে পুরুষ হ'য়ে, পিতা হ'য়ে, স্বামী হ'য়ে, সক্ষম, বলিষ্ঠ যুবক হ'য়ে—সন্তানদের ওপর ক'রছে অত্যাচার, স্ত্রীর ওপর ক'রছে নির্ম্মম অত্যাচার অবিচার! এতে তার পুরুষত্বে ঘা পড়ে না; মনুষত্বে বাজে না, বরঞ্চ আনন্দিত হয়। গঙ্গাবতী পারে না, নারী দেহ ও মন নিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না, দেহ গুরু-পরিশ্রমে এলে পড়ে, বুকে ব্যথা বাজে, পারে না সময় মত সন্তানদের মুখে খাবার দিতে, যা'ও দেয় তাতে সন্তানদের পেট ভরে না—তাই মাথা ঠুকে স্বামী-দেবতার চরণে—মিনতি করে চোখ-ফাটা অশ্রুজলে। কানাই লাথি মেরে সরে যায়, এতেও প্রতিদান দেওয়া হয় না, একটি একটি ক'রে ছিনিয়ে নেয় স্ত্রীর শরীরের যৎসামান্য অলঙ্কার।

একটি একটি ক'রে তিনটি সন্তান মারা গেলো—অনাহারে, দুর্ব্বলতায়। কঠিন রোগে মারা গেলে সান্ত্বনা থাকে, মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়, অদৃশ্য দেবতার ওপর দোষারোপ ক'রে মনের রুচি অনুসারে অভিযোগ, গালাগাল দিয়ে পাগলা মনকে শান্ত করা যায়। কিন্তু এমন অপমৃত্যুর সান্ত্বনা খুঁজবে কি ক'রে, কোন যুক্তিতে, কোন স্পর্দ্ধায়? জননীর চোখের ওপর একটি নয়, দু'টি নয়, তিনটি সন্তান না খেতে পেয়ে মারা গেলো—দড়ির মত শুকিয়ে শুকিয়ে। মাংস ছিল কি-না বুঝা যেতো না, মলিন চামড়ায় ঢাকা কতকগুলি শুধু ছিল হাড়। উঃ! কী ভীষণ সে দৃশ্য! বলেছিল 'ওগো! বাঁচাও আমি যাবো না, থাকবো এই সুন্দর ধরণীর কোলে, থাকবো আমি করুণাময় ভগবানের সাম্যের শ্রেষ্ঠ রাজ্যে। ভগবান এত সুন্দর, এত ঐশ্বর্য্য দিয়ে পৃথিবী তৈরি ক'রেছেন, জগৎপিতা হ'য়ে সব্বাইকে প্রীতির চোখে দেখছেন, পালন ক'রছেন, এদেশ ছেড়ে যাবো না'—তারপর চেঁচালে খাবারের জন্যে। কে খাবার দিয়েছিল এই অভুক্ত, মৃত্যুমুখী সন্তানদের মুখে। জননী? জননী তখন জীবন উৎসর্গ ক'রে গতর খাটাচ্ছে অর্থের জন্যে। পিতা? পিতা তখন কু-পল্লীতে। কেউ দেয় নি, করুণাময় ভগবানও দেন নি, জগতের অসভ্য স্বার্থপর পাষণ্ডগুলিও দেয় নি। কিন্তু গঙ্গাবতী জননী হ'য়ে কি ক'রে পারলে? জীর্ণ, শীর্ণ, রুগ্ন ছেলেকে আফিম্-গোলা বিষাক্ত দুধ পান করিয়ে এমনি ঘুম পাড়ালে যে, সে ঘুম আর ভাঙ্গলো না। কাজ থেকে মজুরী নিয়ে ফিরে এলো, সন্ধ্যায় খাবার হাতে ছুটে গিয়ে জাগাতে চাইলে সন্তানের ঘুম, অভিমানী আর জাগলো না, আর খেলে না। অভিমানী চিরকালের ঘুম ঘুমিয়ে মা'র গতর খাটাবার সুবিধে ক'রে দিলে! অপর দু'টি সন্তান দুর্ব্বল, রুগ্ন শরীরে রীতিমত খাদ্য খেতে না পেয়ে, আফিম্ সেবনে ধীরে ধীরে জীবনীশক্তি হারিয়ে

ফেলে, তারপর একদিন করুণাময় ভগবানের মহত্ব বুঝতে পেরে—তাঁর শ্রেষ্ঠ জগত থেকে বিদায় নিলে, শ্রেষ্ঠ জীব মানব জাতিকে অভিশাপ দিতে দিতে। আমি জানি—ওরা প্রাণপণ চেষ্টা ক'রবে—মৃত্যুর পর যদি অন্য কোথাও আশ্রয় নিতে হয়, তবে ভগবানের অধীন রাজ্যের ত্রিসীমানার ধার দিয়েও যাবে না। আপনাদের যদি হৃদয় থাকে তবে আপনারা অন্তত দুঃখ করুন বা না করুন—ওদের উপদেশ দেবেন না, ভগবানের রাজ্যে আশ্রয় নিতে—এ আমার বিশ্বাস আছে; বিশেষতঃ যেখানে ভগবানের অন্ধবিশ্বাস ভিন্ন অস্তিত্ব নেই এবং সভ্য ও অসভ্য, অমানব ও মহামানবের বাস।···

হায় জননী! এর পরও কি তুমি বাঁচবে, হাসি কান্না নিয়ে সংসার ক'রবে? তোমার হৃদয় কি ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যায় নি? তোমার মাথা কি এখনো ঠিক আছে, মাথার কল কি এত বড় আঘাতেও বিকল হ'য়ে যায় নি? তোমার বুকে যে অগ্নিগিরি সৃষ্টি হ'য়েছে—তারপরও বাঁচবে কি ক'রে? আরও একটি মেয়ে আছে, শেষ সম্বলকেও কি মহাপ্রস্থানের পথে এগিয়ে দেবার জন্যে তৈরি কচ্ছো?

কানাই'র হলো মহাস্ফূর্ত্তি? একটি একটি ক'রে সন্তান মরে—আর কানাই'র আনন্দ যায় আরো বেড়ে। সংসারের খরচ কমে যাবে, অতএব তার স্বেচ্ছাচারিতা ক'রবার পক্ষে মহা-সুযোগ। যে আয়ে ছ'জনের খরচ চলতো সেখানে মাত্র বাকি আছে তিনজন, রোগীর পথ্যও যোগাতে হবে না, তারপর আর একটিও যাবার মুখে, এটি গেলেই সব শেষ। তখন স্বামী স্ত্রী। গঙ্গাবতী যা রোজগার ক'রবে, তা'তে বেশ দিন চলে যাবে। বাকি সন্তানটা গেলেই হয়, আপদ মরেও না! কানাই শেষ সন্তানটির শীঘ্র মরণ কামনা করে। এদিকে গঙ্গাবতী তিনটি সন্তান হারিয়ে বড় কঠিন হ'য়ে গেছে। স্বামীর সঙ্গে

একটি কথার আদান-প্রদান করে না, স্বামী আসে যায় কোন ভ্রূক্ষেপ করে না, নীরবে কাঁদে, অশ্রু দর্ দর্ বেগে ঝরে, মলিন আঁচলে অতি দুঃখের অশ্রুগুলি মুছে ফেলে। অশ্রু মুছে মুছে হয়রাণ হ'য়ে পড়ে, অশ্রুর ওপর হাত দেয় না, ছেড়ে দেয় আপন মনে বইতে। স্বামী আসে, খাবার চাইলে খেতে দেয়, যদি খাবার না থাকে তবে চুপ ক'রে থাকে, স্বামীর নির্ম্মম গালাগালি ও অত্যাচারের কোন প্রতিবাদ করে না; এখন আর পূর্ব্বের মত পাড়াপড়শীর নিকট ধার করে আটা, ছাতু এনে স্বামীদেবতাকে ভোজন করিয়ে পুণ্য করে না। খাবার থাকলে খেতে দেয়, না থাকলে দেয় না; নির্জীবের মত কোলের শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকে। দিন-মজুরের মত যে দিন ইচ্ছা কাজে যায়, মজুরী আনে; হাতে পয়সা থাকলে কাজে যায় না, দিনরাত সন্তানকে কোলে নিয়ে ভাবে—ভাবতে ভাবতে কখনো কাঁদে, কখনো শিউরে উঠে, কখনো রোষ বহ্নিতে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠে। দিন দিন যেন অশ্রু শুকিয়ে যাচ্ছে, ভাবনায় প্রাণ হাঁপিয়ে উঠে, নির্ম্মম জ্বালা প্রকাশ ক'রতে পারে না, পুরুষের মত জ্বালা, হাহাকার বুকে চেপে গাম্ভীর্য্যের মুখোস পরে অস্থির হ'য়ে পড়ে, প্রাণভরে অভিশাপ দিতে পারে না, চেঁচিয়ে কাঁদতে পারে না, কান্না পায়, খুব বেশিই কান্না পায়, কিন্তু কাঁদতে পারে না। দিন কারো বসে থাকে না, কেউ বসেও থাকতে পারে না। দিনের জন্যে—একদিন, দু'দিন—কিছুদিন চলতে পারে, বেশি দিন চলে না। থেমে থাকা যায় না, চলতেই হয় চলতি-জগতে। গঙ্গাবতীকে আবার উঠতে হ'লো, আবার রীতিমত সংসারে নামতে হ'লো, নিয়ম মত মিলে যেতে হ'লো। টাকা রোজগার ক'রতে হবে, ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রেখে সাবধানে চলতে হবে। একটি মাত্র অবশিষ্ট সন্তান—তাকে সুখী ক'রতে হবে, বাঁচাতে হবে, ঝড়োঝঞ্ঝার

হাত থেকে রক্ষা ক'রতে হবে। গঙ্গাবতী নিজের দেহের প্রতি বেশি দিন অত্যাচার ক'রতে পারলে না, নিজেকে জোর ক'রে খাওয়াতে হচ্ছে—মুখে খাবার উঠতে চায় না, মুখের গ্রাস পড়ে যায়, হু হু ক'রে অশ্রু আসে মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দেখে, তবু সয়ে সয়ে খেতে হচ্ছে। কর্ম্ম-প্রেরণা জাগাতে হচ্ছে জড় মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ক'রে। এ অনন্ত ব্যাপি বিপদে রজত নেই, কে বুঝবে তার মর্ম্মন্তুদ ব্যথা, কে দেবে দ্বন্দ্ব মিটিয়ে।

সন্তানগুলির মৃত্যুতে কানাই মহা প্রফুল্ল হ'য়েছিল। কিন্তু গঙ্গাবতীর হিমালয় সদৃশ উদাসীনতায় রীতিমত ভড়কে গেলো। তার আশা যে নির্ম্মূল হয়—গঙ্গাবতী পুত্রশোকে দিন কতক কান্না-কাটি ক'রে আবার সকলের মত সংসার করুক, শেষ সন্তানকে নিয়ে আমোদ করুক, পাড়া-পড়সীর সঙ্গে গল্প-গুজব ক'রে বেড়াক; খুসি হোক বা না হোক, আমোদ আহ্লাদ করুক বা না করুক, কানাই'র তাতে কিছু মাত্র আসে যায় না। কিন্তু গঙ্গাবতীর গতর খাটাতে না যাওয়া যে ভীষণ ব্যাপার। গঙ্গাবতী রোজগার না ক'রলে যে তার মহা ক্ষতি; অনুনয় বিনয় ক'রে প্রেমের ভাণ ক'রে টাকা না আদায় ক'রতে পারুক, জোর ক'রে ছলনা ক'রে ত' টাকা নিতে পারতো! পূর্ব্বে যদিও স্ত্রীর অনুরোধে, কাতর প্রার্থনায় চটে উঠে বলতো—টাকা নেই, আটা ছাতু কেনা যাচ্ছে না, আমি ক'রবো কি? সাধ ক'রে গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলে জন্মিয়েছো, এখন পার তো খাওয়াও, না পারো গলা টিপে শেষ করে দাও। আপদ মরলেই তো বাঁচা যায়। সন্তান কে চায়? আটকানো যায় না—হ'য়ে পড়ে। রাক্ষসগুলি খেয়ে খেয়ে সব শেষ ক'রে দিলে। তবু গঙ্গাবতীর রোজগারের টাকা ছল, চাতুরী জোর ক'রে নিতে পারতো; এখন যে ছেলে-পিলেগুলি মরে গিয়ে মহা সর্ব্বনাশ ক'রে ফেলেছে, খরচ যদিও ক'মেছে কিন্তু টাকা যে আর আসে না। এদের শোকে গঙ্গাবতী মিলে

যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। মিলের লোকগুলি সাধারণতঃ খুব খারাপ—কিন্তু গঙ্গাবতীকে চাকরী যাবার ভয় দেখিয়ে শাসালে না, মিলে যেতে আদেশ দিলে না! দরদ দেখে কানাই'র হাড় জ্বলে। কানাই গঙ্গাবতীর বিসদৃশ হাবভাবে বড় বিপন্ন হ'য়ে পড়লে—যদিও সে গঙ্গাবতীর জন্যে একটুও দরদের, প্রেমের, অতীত দাম্পত্য প্রেমের কিঞ্চিৎ আকর্ষণ অনুভব ক'রে না—তবু এবার ক'রতে হ'লো। সত্যিকার আকর্ষণ নয়, প্রাণের অনুভূতি নয়, গঙ্গাবতীর রূপ, যৌবন, নারী দেহের জন্যেও নয়, ছলনা—বদমাইসী। কানাই'র গঙ্গাবতীর দেহের ওপর লোভ নেই, যদি একটু থাকতো তবে অত অত্যাচার ক'রতে পারতো না, স্বার্থের জন্যে অন্ততঃ তোষামোদ ক'রতো। চরিত্রহীন, মাতাল পুরুষ মানুষ অতি সুন্দরী স্ত্রীর আকর্ষণে ভুলে না, বিশেষতঃ যে স্ত্রী নিরীহ, সাধ্বী, সতী। তারা বুঝতে পারে, কার্য্যক্ষেত্রে দেখতে পায় যে, স্ত্রীর দেহ পেতে কোন বাধা আসে না, জোর অত্যাচার চলতে পারে, যে ভাবে ইচ্ছা চালানো যায়, ইচ্ছে ক'রলেই পাওয়া যায়, অপেক্ষা ক'রতে হয় না; কষ্ট ক'রতে হয় না। অবলা নারী! পুরুষ যে ভাবে চালায় সেই ভাবে চলতেই বাধ্য। প্রগতি যুগের নারীরা আপত্তি ক'রতে পারেন যে গঙ্গাবতীর মত স্বাবলম্বিনী, তেজস্বিনী, স্বাধীনা নারীকে দুর্বৃত্ত, হীন মাতাল কানাই কি ক'রে শুধু নারী-দেহ নিয়ে ইন্দ্রিয়লালসা পূরণ করে। হয়, হচ্ছেও অনাদি কাল থেকে। শরৎ চট্টোপাধ্যায় যতদিন থেকে কলম ধরেছেন তারপর থেকে এ সব কথা আর না লিখলেও চলে। নারীর বন্ধু, হিতাকাঙ্ক্ষী, পথ-প্রদর্শক—তাঁর মত আর কেউ আছেন কিনা আমার জানা নেই। 'নারীর মূল্য' পুস্তকখানি যে কত মূল্যবান এবং নারীদের নিকট যে একটি শ্রেষ্ঠ পুস্তক—তা কি অস্বীকার করা চলে?

কানাই স্বার্থের খাতিরে দরদী হ'লো, কৃত অপরাধের জন্যে পাপের জন্যে অনুতপ্ত হ'লো। কাঁদার ভাণ ক'রে স্ত্রীর চোখের জল মুছিয়ে দিলে। গঙ্গাবতী দুর্ব্বৃত্তের ছলনায় ভুলে গেলো, অনুতপ্ত স্বামীকে ক্ষমা ক'রে পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে চোখের জলে হৃদয়ের ভারী বোঝা নামালে।...গঙ্গাবতী বড় আশা ক'রে আবার ভাঙ্গা ঘর যোড়া দিলে। যদিও সে যোড়া দিতে বাধ্য হতো, মাতৃত্ব তাকে সংসারে নামাতে বাধ্য ক'রতো; কি ক'রে যে সে পাকা সংসারী হ'য়ে যেতো তা বুঝতেও পারতো না; কিন্তু স্বামীকে লাভ ক'রে নিজেই আবার সংসারে নামলে। চির-বিষাদ-করুণ মুখে যদিও হাসি আর ফুটে না, তবু যেন একটু আশার ছায়াপাতে বিষাদ-করুণ মুখখানাকে বেশ সুন্দর ক'রে তুললে। ধীরে ধীরে মৃত সন্তানের পিছে দিয়ে দেওয়া জীবনীশক্তি, মনের সজীবতা, কার্য্য-ক্ষমতা, জিজীবিষা ফিরিয়ে আনতে লাগলে, জড়তা, ক্লীবত্ব দূর হ'তে লাগলো। রীতিমত সংসারী হ'লো; দৈব ঘাত-প্রতিঘাতের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে, ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলো। তাকে বাঁচতে হবে, স্বামীকে আবার মানুষ ক'রতে হবে, মেয়েকে রক্ষা ক'রতে হবে, মাতা পিতার স্নেহে বড় ক'রে ভাল ঘরে বিয়ে দিতে হবে, তবে না তার ছুটি, মুক্তি, বিদায় নেবার সময় হবে। দুনিয়াতে যে তার মস্ত বড় কাজ র'য়ে গেছে। স্ত্রী সে, বিধবা নয়, কুমারী নয়, কন্যার জননী; স্বামী ফিরে এসেছে, মস্ত বড় বোঝা তার মাথায়! সে জননী! মাতৃত্ব ত' ছেলে-খেলা নয়, মেয়ে বড় হবে—আসন্ন যুবতী মেয়েকে কুলোকের হাত থেকে, কুনজর থেকে রক্ষা ক'রতে হবে, ভাল ঘরে বিয়ে দিতে হবে, একি সহজ কথা যারা চলে গেছে—যে অবস্থায়ই যাক—বাস্তবপক্ষে যখন চলে গেছে, তাদের শোকে ত' যে আছে তাকে মারতে পারে না, যেমনি হোক

সংস্কার-বদ্ধ; কানাই চূড়ান্ত মাতাল, শক্তিশালী পুরুষ, স্বামীর দাবি লালসার দিক থেকে পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখতে ভাল ক'রে জানে। নরবলি দিয়ে পুজো দেবে? একটি নয়, তিনটি সন্তানকে দিয়েছে নিজেকে উৎসর্গ ক'রবে ফাঁসির গ্রন্থিতে? নিজের উত্তপ্ত, জ্বালাপোড়া রক্তের ফোয়ারায় স্নাত ক'রে দেবে? তাই দেবে! স্বামীর কল্যাণে আত্মহত্যা! তাই ক'রবে। না-না-না? সে ত পারে না, শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। সে যে জননী। বক্ষে জড়িয়ে আছে যে সন্তান। বারেবারে কেঁদে উঠে 'মা! মা!' বলে।...

গঙ্গাবতী ভাল ক'রেই বুঝতে পারলে—বৃথা তার জীবন-যৌবন, আশা ভরসা, সুখশান্তি, ব্যর্থ হলো মনুষ্য জীবন। মনুষ্য-জন্ম না হলে হয়তো ভালই হতো, কে জানে, কে বুঝে পশুপক্ষীর ভাষা, ওরা শাসন করে না অপর জাতকে,—সর্দ্দারী করে না ঠিক, কিন্তু আত্মদাহ যে না আছে কে বলতে পারে? সন্তান-সুখ কে ছিনাতে পারে—ওদের সমাজ নেই, কিন্তু মাতা-সন্তানের সম্পর্ক কত সুন্দর, কত বড় অচ্ছেদ্য! হোক না ক্ষণস্থায়ী, মানুষের মত ত' মানুষের বুক থেকে সন্তান ছিনিয়ে নেয় না, স্বামী ত' স্ত্রীর বুকে কাঁটা হ'য়ে সারা জীবন জ্বালায় না। গঙ্গাবতী জীবতত্ত্ব জানে না, তাই অন্য জীব হ'তে চায়। কেন চাইবে না—চাওয়াটাই ত' স্বাভাবিক। চিন্তিত মুখে যখন ঐ বিশাল বট গাছটায় তাকায়—দেখে কত পাখীর নীড়। যে যার মত আছে। স্ত্রীপাখী সংসার দেখে, সন্তানকে রক্ষা করে, পুরুষ পাখী রোজগার ক'রতে বের হয়। ঐ গাছটায় কত পাখীর নীড় ডালে ডালে, কৈ পাড়া-পড়্‌সীর সঙ্গে ত' দ্বন্দ্ব হয় না; সামাজিক ব্যভিচার নেই, দারিদ্র্যে কেউ সাহায্য করে বলে মনে হয় না, কিন্তু শত্রু এলে সব্বাই দল বেঁধে শত্রুর সঙ্গে যুঝে। না, অনেক পাখী ত' অপরকে খাদ্য দেয়, যেখানে খাবার

প্রচুর পরিমাণ থাকে পাখীর দলকে সংবাদ দেয়! মানুষ এমন করে না কেন? গঙ্গাবতী ভাবে, রাজ্যের কথা ভাবে, যুক্তি তর্কে বিচার ক'রতে চায়, অবশেষে মনুষ্যজন্মের জন্যে ধিক্কার দেয়। নিজের কথা ভাবতে ভাবতে অপরের কথায় যায়, বিভ্রান্ত হয়, ঘুরে ফিরে আবার নিজের কথায় আসে। তার জীবনে আর চাঁদ হাসবে না, জ্যোছনার স্নিগ্ধ আলো তার গায়ের ওপর এলিয়ে পড়বে না, রজনীর হাস্নাহানা, রজনীগন্ধা গভীর রাতে বিকসিত হ'য়ে চুপি চুপি প্রিয়াকে ডেকে অভিসারের কথা মনে করিয়ে দেবে না, যৌবন মধুমাস কোকিলের কুহুধ্বনি সনে জড়িত হ'য়ে মাতাল মূর্চ্ছনা জাগাবে না; সেকাল ফুরিয়ে গেছে তার, অকালে ঝরে গেছে। সে যে নারী, দাম্পত্য জীবনটাকে স্বর্গীয়, দেবতার আশীর্ব্বাদ বলে জেনে এসেছে—বাস্তবে অভিশাপ বলে মানবে কেন? যদিও মানতে বাধ্য হচ্ছে তবু স্বীকার ক'রবে কি নিয়মে, বিদ্রোহ যে জাগে? না মানতে চায়, না মানুক, কিন্তু বিদ্রোহ যখন পদে পদে জাগে—সকলি ব্যর্থ, শুধু জ্বালা, কল্পনার মরুমায়া বলে—তখন, তখন কি বলে ভাবতে পারে যে সেও মানুষ; সেও জীবশ্রেষ্ঠ নর-নারীর একজন?···মুমূর্ষু রোগী যখন আশা পায় যে সে বাঁচবে, নিশ্চিত মৃত্যুতে একটু সন্দেহ জাগে—তখন তার মুখে হাসি না ফুটলেও, অন্তরালে আশার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ফুটন্ত হাসির চেয়ে পাণ্ডুর মুখখানা উজ্জ্বল ক'রে তোলে। কানাই'র প্রত্যাবর্ত্তন গঙ্গাবতীর সারাদেহ, মনপ্রাণ আশার আলোকে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছিল; আসন্ন বিবাহের বাঁধনে বাঁধা পড়বার মুখে যেমনি যুবতী নারী উত্তেজিত হয় তেমনি উত্তেজিত হ'য়েছিল—মুহূর্ত্তে, অতি সংক্ষেপে, সূচনাতেই আবার মিলিয়ে গেলো। বাতি নিভবার পূর্ব্বে যে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে!

গঙ্গাবতী মিলে কাজ ক'রতে যায়, রোজগারের টাকা হাতে রাখে

না, বাজার সওদা ক'রে বাড়িতে আনে। কানাই টাকা চায়, গঙ্গাবতী কোন উত্তর দেয় না; কানাই চুপি চুপি সারা ঘর দোর, আনাচ-কানাচ খুঁজে, জিনিষ পত্তর হাতড়ায়, কোথাও একটি পয়সা বের ক'রতে পারে না। ছল চাতুরী ক'রে, ভয় দেখিয়ে, জোর জবরদস্তি ক'রে, কখনো টাকা ছিনিয়ে নিতে সমর্থ হয় না। গঙ্গাবতী কানাই'র ভয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা সত্ত্বেও কানাই পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে যায় গঙ্গাবতীর দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে। গঙ্গাবতী নারী মাত্র! তাই কানাই যখন কাকুতি মিনতি করে, টাকার জন্যে নিত্য হত্যে দিয়ে পড়ে, 'আজ শেষ, কাল থেকে যদি বদ খেয়াল না ছাড়ি' এই বলে কঠিন প্রতিজ্ঞা করে যে, সে মানুষের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেনি, সে কুকুর, গাধা—যা' খুশি বলে বসে, তখন গঙ্গাবতী নিজেকে আর সামলাতে পারে না, মদের টাকা কানাইকে দেয়। এমনি ভাবে রোজ প্রতিজ্ঞা করে—আবার পরদিন কি দু'দিন বাদে আবার টাকা চায়, প্রতিজ্ঞা করে। গঙ্গাবতী বাধ্য হ'য়ে দৃঢ় হলো, কানাই'র কথায় কর্ণপাতও করে না। কানাই গঙ্গাবতীর ওপর অত্যাচার আরম্ভ ক'রলো, টাকা চেয়ে যখন পায় না তখন ঘুসি, লাথি, চাবুক, লাঠি যা হাতে যুটে তাই দিয়েই মার চালায়। গঙ্গাবতী নিশ্চল, নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে থেকে অত্যাচার সহ্য করে, একটি কথাও বলে না, একটি পয়সাও দেয় না।

কানাই এতদিন শুধু মদ, বন্ধু, গণিকা নিয়ে মত্ত ছিল, এখন একেবারে নিম্নে নামলো। স্ত্রীর ওপর অত্যাচার, জুলুম, ছল চাতুরী ক'রে সুবিধে হচ্ছে না। গঙ্গাবতী রোজগার করে অল্প, তা দিয়ে কায়ক্লেশে সংসার খরচ চালায়, তার ওপর পুত্রশোকে এবং ঠেকে ঠেকে হ'য়েছে বড় চতুর, ধূর্ত্ত যেন রসশূন্য শুকনো ইক্ষু—হাজার নিষ্পেষিত ক'রলেও এক তিল রস বের হ'তে চায় না। কানাই হতাশ হলো না, দমলো না—বন্ধুদের পরামর্শে,

শ্যামজীর অনুচরের ইঙ্গিতে ঠিক ক'রলে—স্ত্রীর সুন্দর দেহ দিয়ে রোজগার ক'রবে। মোটা হাতে টাকা নিয়ে শ্যামজীর সঙ্গে ক'রলে এক চুক্তি। এমন মহাসুযোগ, সৌভাগ্য হাতে পেয়ে কানাই উঠে পড়ে লাগলো স্ত্রীকে উপঢৌকন দেবার জন্যে। শ্যামজীর টাকায় কানাই মদ খায় আর মতলব আঁটে, জল্পনা করে—ঈস্—রাজি করাতে পারলেই পাঁচ শত টাকা নগদ, তার ওপর গঙ্গাবতী শত শত টাকা রোজগার ক'রবে—তখন ত' বড়লোক হ'য়ে পড়বো। ভয় দেখিয়ে নানা ছলে শ্যামজীর নিকট থেকে কত টাকা আমিই বের ক'রবো!... শ্যামজী বড় কঞ্জুস, প্রথম প্রথম বেশ টাকা দেয়, অলঙ্কার দেয়—তার পর রূপ হারালে অলঙ্কারগুলো কেড়ে রেখে' তাড়িয়ে দেয়। শালা—এ চলেছে না—আমি বাবা পেছনে আছি, গঙ্গাবতী আমার স্ত্রী, আমার চেয়ে পাকা খেলোয়াড়, টাকাটি হাতে দেবে ত' গা ছুঁতে পারবে।...' হঠাৎ ভয় হয়, চম্‌কে উঠে গঙ্গাবতী রাজি হবে কি না; জোর করে—স্বার্থের খাতিরে বলে—রাজি হবে না, রাজরাণী হওয়ার কথা শুনলে কেন রাজি হবে না? ওর গোষ্ঠীশুদ্ধ রাজি হবে। যা মুখে আসে বলে, কিন্তু মাতালের মনেও দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, গঙ্গাবতী প্রাণ গেলেও রাজি হবে না।

কানাই গঙ্গাবতীকে মারধর করে না, বাড়ি থেকে বেশি বের হয় না, ঘুরে ঘুরে গঙ্গাবতীর সঙ্গে সেধে আলাপ করে।• শ্যামজীর নিকট যে টাকা আগামী পেয়েছিল তা' থেকে ভাল ভাল খাবার কিনে এনে গঙ্গাবতীকে দেয়, প্রেমের খেলা খেলে জোর ক'রে গঙ্গাবতীকে খাওয়ায়, মেয়ের জন্যে খেলনা কিনে এনে আদর যত্ন করে। গঙ্গাবতীর দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে নানা বিষয় বক্তৃতা দেয় যে—কেউ কারো নয়, বোঝাতে চায় সতীত্ব কিছু নয়, সমাজের ফাঁকি, গলদ—ঈশ্বর বলে কেউ নেই। থাকলে তাঁকে অস্বীকার ক'রলে মানুষের কিছু যায় আসে না। গঙ্গাবতী যে

সতীত্বের দোহাই দিয়ে অযাচিত সৌভাগ্য পায়ে ঠেলে চলে এলো, কি লাভ হলো? কোন পুণ্য হলো কি, না ঈশ্বর সন্তুষ্ট হ'য়েছেন? যদি হ'তেন—তবে তার এত দুঃখ, দুর্দ্দশা, লাঞ্ছনা কেন? তিনটি সন্তানকে অনাহারে শুকিয়ে মারা কি ভালর লক্ষণ?··গঙ্গাবতী কানাই'র হাবভাবে, কথায় প্যাঁচে বেশ বুঝতে পারলে যে এবার একটা মস্ত বড় দুর্দ্দশার সৃষ্টি হবে, কানাই'র মনে একটা ভয়ঙ্কর দুষ্ট অভিসন্ধি আছে। বাহিরের প্রলোভনে পড়ে এবার একটা মারাত্মক খেলা খেলবে। গঙ্গাবতী ভবিষ্যতের ভয়ে কানাইকে এড়িয়ে চলে, সর্ব্বদা গম্ভীর ভাবে থাকে, কোন কথায় হাঁ বা না বলে না, যেন সে কিছু বুঝেও না, শুনেও না, ভালবাসেও না। কানাই অর্থের মোহে নাছোড়বান্দা হ'য়ে পিছু ধরে রইলো। গঙ্গাবতীকে সে ভাল ক'রেই জানে, চিনে, তাই আর ছলনা চাতুরীতে রইতে পারলো না, ধৈর্য্যও নাই—সোজা পথে নামলো।

স্বামীর কুপ্রস্তাবে গঙ্গাবতী শিউরে উঠে, ভয়ে জড় সড় হ'য়ে যায়। নারীত্বের উজ্জ্বল দীপ্তি মলিন হয়, নির্জ্জীব হয়, অচেতন হয়, দাম্পত্য-ছবি ভয়াবহ হয়, দেহ মন শিথিল হ'য়ে পড়ে। গঙ্গাবতী জড় মনে এই কথাটাই ভাবে—মানুষ কি নিজের স্ত্রীকে লম্পটের কাম অনলে আহুতি দিতে পারে? মানুষের কি এত শক্তি থাকতে পারে?

কানাই পাতালপুরীর মত ভয়ঙ্কর নীরবতায় জ্বলে উঠে, রুক্ষস্বরে বলে 'হ'য়েছে, রাখ্ বাবা! সতীপণা আমার নিকট মারতে হবে না। লোকে চলে পাতায় পাতায়, আমি চলি শিরায় শিরায়, বাতাসে বাতাসে। কোন্ শালীকে আমি চিনি নে, বলুক ত' এসে আমার সামনে, দিন ক্ষণ শুদ্ধ বলে দিতে পারি।'

'সকলেই তোমাদের মত চরিত্রহীন নয়, আর হলেই যে আমাকে হ'তে হবে—'

· 'রাখ্ রাখ্, আর বক্তিমের কাজ নেই। আমি সব মাগীকে চিনি। বলবো—বলবো নাকি? পাড়ার কোন লোকটা বাকি রেখেছে—' 'চুপ্। নিজেকে দিয়ে সবাইকে বিচার ক'রো না। তুমি চরিত্রহীন, মাতাল, নির্দ্দয়, কিন্তু স্বামী। স্বামী হ'য়ে অত বড় মিথ্যা কথা বলতে একটু দ্বিধা হয় না!'

'রাখ্ রাখ্ বাবা! বহু সতী দেখেচি! সতী নিয়েই আমাদের কারবার, এখন হাড়ে ঘুন ধরে গেছে। প্রকাশ্যে গেলে চক্ষুলজ্জা হয়, রাত্তিরে গেলেই হয়। যেমনি ক'রে আমায় ফাঁকি দিয়ে রাতে মজা করো। এ পাড়ার যত সব সতী দেখো—সব্বাই রাত্তিরে অভিসারে গিয়েছেন, এখন তোমার পালা। তুমি বর্ত্তমানে বন্ধ্যা কি না—রূপ যৌবন উছলে পড়ছে শ্যামজী বলেন; তাই রোজগার খুব বেশি হবে। টাকাকড়ি, দাসদাসী, বাড়ি, অলঙ্কার কত কি? ঈস্—!'

গঙ্গাবতীর গায় আগুন জ্বলে উঠে। উপায় নেই. প্রতিকার নেই। কথা কাটাকাটিতে শুধু জঞ্জাল বেড়েই চলে—নোংরা হয় বেশি, নারীত্ব বুকে চেপে ভয়ে ভয়ে সরে পড়ে, টল্‌তে টল্‌তে যায় বহু দূর। কানাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে—'বাবা! আমার চোখে ধূলো! চোখ দেখলে নাড়ী নক্ষত্র পর্য্যন্ত টের পাই। ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছে। শ্যামজী বাড়ি মেরামত ক'রে দেয়, এটা সেটা পাঠায়, অতদিন রজত ব্যাটা গোপনে টাকা দিয়েছে, কাপড় চোপড় কিনে দিয়েছে। ও ছোঁড়ার কেউ ছিল না, রোজগারের সব টাকাই তো তোর জন্যে হাসিমুখে খরচা ক'রেছিল; আমি অত বোকা নই যে সুন্দরীর মুখে 'না' শুনে বিশ্বাস ক'রবো। সব খবর রাখি, সবই বুঝি। মিছে কেন সাধুগিরি মারা হচ্ছে।'

গঙ্গবতীর নামে কুৎসা বহুদিন রটেছিল, দিন দিন আরো খারাপ রূপে প্রকাশ্যে ভাসতে লাগলো। পূর্ব্বে অলক্ষ্যে নানা গুজব আলোচনা

হতো, এখন প্রকাশ্যে সর্ব্বত্র, সর্ব্বস্থানে আলোচনা হয়। এমনি ভাবে এরা কুৎসা আলোচনা করে যে—গঙ্গাবতী যেন বস্তির কলঙ্ক, বস্তির বুকে বসে ব্যভিচার ক'রছে, তার ব্যভিচারে ঘরের মেয়েছেলেরা নষ্ট হ'য়ে যাবে। অতএব এর প্রতিকারের প্রয়োজন। এরা এমনি ভাবে গঙ্গাবতীকে কথা শোনায়—যেন এরা সকলই অতি সৎ, চরিত্রবান—এ বস্তিতে একটিও অসতী মেয়ে নেই, যারা প্রলোভনে পড়ে পা বাড়িয়েছিল মাত্র বা পা বাড়াতে যাচ্ছিল, সমাজের মাতব্বর নরনারীদের কঠিন শাসনে অসতী হ'তে পারে নি। মাঝে মাঝে ভয় দেখায় যে শ্যামজীকে ওরা আর মানবে না, চুলের মুঠি ধরে গঙ্গাবতীকে বস্তি থেকে তাড়িয়ে দেবে, বস্তির মজ্জায় বাসা বেঁধে পাপ ব্যবসা ক'রতে দেবে না।

গঙ্গাবতীর নামে কুৎসা এত অশ্লীল হতো না, বস্তির দুষ্টলোকদের ও অসতী নারীদের মনেপ্রাণে গঙ্গাবতী জীবন মরণ সমস্যার মত হ'য়ে উঠতো না। একে বস্তির অসতী নারীরা নিজের কলঙ্ক পুরাণো ক'রবার জন্যে অপরের কলঙ্ক খোঁজে, তার ওপর গঙ্গাবতীর ওপর শ্যামজীর মত টাকাওয়ালা লোকের নজর পড়াতে হিংসা হলো খুব বেশি; এতদিন আত্মদাহের জ্বালায় গোপনে বলাবলি ক'রতো—এখন কানাই'র সাহায্য পেয়ে বেশ সুযোগ ও জোর পেলো। এসবের একটা মজা যে, গুজব খুব ভাল ক'রে রটে, লোকে এমনি ভাবে বলাবলি করে যেন বক্তা প্রত্যক্ষদর্শী, কিন্তু যখনি জিজ্ঞাসা করা হয়—সে নিজে দেখেছে কি-না বা শুনেছে কি-না—তখনি বলবে যে সে অমুকের নিকট শুনেছে; ওমুককে জিজ্ঞেস ক'রলে সেও অপর একজনের নাম বলে, কেউ প্রত্যক্ষদর্শী হয় না, বিশেষত যেখানে একটু ভয়ের কারণ থাকে। আরো একটু মজা যে চালাকচতুর লোকেরা বোকা লোকদের মুখ দিয়ে এসব কুৎসা রটায়,এরাও তোষামোদে সন্দেহকে নিশ্চয় সত্য বলে লোকের নিকট বলে।

কানাই গম্ভীরভাবে লোকের নিকট বলে বেড়ায় যে, সে নিজে গঙ্গাবতীকে শ্যামজীর বাগান-বাড়িতে দেখেছে। প্রায় রাত্তিরে শ্যামজীর মোটর আসে, গঙ্গাবতী পালিয়ে যায়, আবার শেষ-রাত্তিরে বাড়ি ফেরে! যেদিন সে বাড়ি থাকে না, শেষ রাত্রের দিকে ঘরে ফিরে' দেখেছে— তার শয্যায় শ্যামজী ও গঙ্গাবতীকে আমোদে নিশি কাটাতে, এই নিয়েই তো এত ঝগড়া। শ্যামজী এর জন্যে তাকে টাকা দিয়েছিলেন। সে বাধা দেয় বলেই তার সঙ্গে গঙ্গাবতীর রাত্তির দিন ঝগড়া বিবাদ হয়। গঙ্গাবতী নাকি শিগ্‌গীরই শ্যামজীর কেনা নতুন বাড়িতে চলে যাবে, একটা মোটর গাড়ি পাবে, টাকা পয়সার ত' কথাই নেই।···

কানাই দুর্ণাম করে—মাতাল হ'য়ে, ক্রুদ্ধ হ'য়ে, পাষণ্ড চরিত্রহীন বলে নয় শুধু, তার একটা গূঢ় কূট অভিসন্ধি আছে। অসতী বলতে বলতে, সমস্ত লোকের নিকট থেকে নির্য্যাতন, অপমান পেতে পেতে একদিন আপনি বাধ্য হবে—মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রকাশ ক'রতে। পাগল করা জ্বালাতনে কতদিন সতী রইতে পারবে, ধিক্কারে স্বেচ্ছায় অসতীর পথ নেবে—আত্ম-সমর্পণ ক'রতেই হবে। আত্ম-সমর্পণ ক'রে যে প্রতিশোধ নিতেই হবে। মানুষ যখন শ্রেষ্ঠ, সৎ, ভাল জিনিষে আত্মোৎসর্গ ক'রে চলতে পারে না বা ধরে রাখতে পারে না—অদৃশ্য শত্রুর অক্লান্ত আঘাতে, তখন ঠিক তার উল্টোটাকে আশ্রয় করে। কানাইও ঠিক বুঝেছে যে গঙ্গাবতীকে ক্ষিপ্তা ক'রতে হবে, তার মনে ধিক্কার জন্মাতে হবে, তা'হলেই তার অভিষ্ট সিদ্ধ হবে। গঙ্গাবতীর মত নারীকে যদি একবার আসরে নামাতে পারে—তবে সে মনের সুখে রাজার হালে গণিকা, মদ ও বন্ধু নিয়ে দিন কাটাতে পারবে।

গঙ্গাবতী অচল, অটল, মূক, বধির, চেতনাবিহীন। যেন সে হিমালয়—প্রাণও নেই, চেতনাও নেই। ঘরে ও বাইরের কোন দুষ্ট

হাওয়া তাকে কাবু ক'রতে পারে না, পারলে না। আপন মনে কাজে যায়, গম্ভীরভাবে কাজ করে, সন্ধ্যার সময় দ্রুত হেঁটে বাড়ি আসে। রাস্তায় কারো সঙ্গে বাক্যালাপও সহজে করে না। গেটের নিকট কানাই লুকিয়ে থাকে, হঠাৎ গঙ্গাবতীকে আক্রমণ করে, গঙ্গাবতীর মজুরী কেড়ে নিয়ে ছুটে পালায়। কাকুতি মিনতি শোনে না, কোলের শিশু ভয়ে চেঁচিয়ে উঠে, শিশুর জন্মে ভিক্ষে চায় কিছু স্বার্জ্জিত পয়সা, কানাই দাঁত খিঁচিয়ে বকে, ছুটে যায় বন্ধুদের সঙ্গে কুপল্লীতে। এ সকল দুর্ব্বৃত্তরা রাস্তায় হিসেব করে—কোন বন্ধু কত ছিনিয়ে আনতে পারলে। এ প্রকার নির্য্যাতিতা নারীরা ভয়ে মজুরীর পয়সা সঙ্গে আনে না, সঙ্গীদের নিকট রেখে দেয়। ওদের পাষণ্ড স্বামীরা যেদিন স্ত্রীর নিকট মজুরী পায় না, সেদিন নির্দ্দয়ভাবে মারধর করে, রাস্তার মাঝে বিবস্ত্রা ক'রে পয়সা অনুসন্ধান করে। কুলি রমণীরা যত চতুর হয় দৈহিক অত্যাচার তত আরো বাড়ে। রাস্তার লোক দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখে। পুলিস বা ভাল লোকের নজরে পড়লে এসব হতভাগা নারী রক্ষা পায়, অবশ্য এরাই আবার স্বামীকে পুলিসের হাত থেকে বাঁচায়, অন্য কোনদিন এমন কাজ ক'রবে না বলে নিজেরাই জামীন হয়।

— বারো —

গঙ্গাবতীর ঘয়ের উৎপাত ক'মলো কিন্তু বাইরের উৎপাত চ'ললো আরও ভয়াবহভাবে বেড়ে'। স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হ'য়ে মজুরী সঙ্গে আনা ছেড়ে দিয়েছে, সঙ্গীদের নিকট রেখে দেয়, গোপনে বাজার সওদা করে—আটা, ছাতু, ডাল, তরকারি নিয়ে বাড়ি আসে, স্বামীর ভয়ে একটি পয়সা বাড়িতে রাখতে চায় না। কানাই অত্যাচারের মাত্রা দিলো বাড়িয়ে; সকল ব্যাপারেরই একটা সীমা থাকে—গঙ্গাবতী এতদিন সব সয়েছে, স্বামীর সুমতির জন্যে নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন ক'রে ভগবানের নিকট প্রার্থনা ক'রেছে। পাষাণ দেবতা শুনলে না, তাই নিরুপায় হ'য়ে দাঁড়াতে হলো মাথা তুলে'। দৈহিক অত্যাচার কত সইতে পারে! সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে যায়, হাত পা শিথিল হ'য়ে পড়ে, কাজ ক'রবার শক্তি, ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলে। কাজ ক'রতে পারে না, মাথা ঘুরে, শরীর ঝিমিয়ে আসে। তাই সেও মাথা তুলে দাঁড়ালো। কানাই যখন আসে মারধর ক'রতে—সেও রুখে দাঁড়ায়। চরিত্রহীন, লম্পট, দুর্বৃত্ত কানাই'র সে শক্তি নেই, গঙ্গাবতীর মত শক্তিশালিনী রমণীর সঙ্গে মুহূর্ত্তের জন্যে শক্তিতে টিঁকে থাকতে পারে না, ভয়ে পালিয়ে যায়। কখনো কখনো দূর থেকে ঢিল ছুড়ে পালায়। স্ত্রীর নিকট টাকা পায় না তাই আরম্ভ ক'রলো চুরি, একদিন ধরা পড়ে গেলো জেলে। ঘরের শত্রু নিষ্কৃতি দিলো।

কানাই জেলে যাবার পর থেকে পাড়া পড়সী ও শ্যামজীর উৎপাত আরও বেড়ে গেলো। যাদের টাকা আছে তারা দেখায় টাকার লোভ, যাদের যৌবন আছে তারা দেখায় প্রেমের ছলনা; বয়সে ছোট এমন যুবকও বহু ভক্ত জুটে গেছে! এদের প্রেম আরও মারাত্মক; যাদের টাকাকড়ি নেই, রূপযৌবনও নেই—তারা খাটাতে চায় শক্তি। তাই নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে না, এরা মাঝে মাঝে রাত্তিরে হানা দেয়, তখন গঙ্গাবতীকে লাঠি ধরতে হয়, দুর্বৃত্তদের শাসন ক'রতে হয়। এরা পুরুষ, আস্ফালন করে বিশ্ব-বিজয়ীর মত, নিজেদের জটলার মাঝে গঙ্গাবতীকে খেলার পুতুলের মত ক'রে নাচায়, কিন্তু গঙ্গাবতীর শৌর্য্যে বীর্য্যে মাথা তুলতে পারে না। গঙ্গাবতীর তীব্র শ্লেষপূর্ণ দৃষ্টির নিকট দাঁড়াতে পারে না, গায়ের জোরে কুলিয়ে উঠবার মত শক্তি অল্প লোকেরই আছে।

পাড়াপড়সীদের গঙ্গাবতী বেশি ভয় পায় না। সে বেশ বুঝতে পারে যতদিন তার দৃঢ়তা, শক্তি, সামর্থ্য থাকবে ততদিন এরা নিকটে ঘেঁসতে সাহস পাবে না। যত ভয় শ্যামজীকে। আগে ধরতে ক'রতে পাওয়া যেতো না অথচ গলার কাঁটার মত জড়িয়ে থাকতেন, এখন প্রকাশ্যে আরম্ভ ক'রেছেন! মিলের কাজ-কর্ম্ম ত' ছেড়েই দিয়েছেন, কেবল কুলি-মজুর ঠেঙ্গানো। আফিস ঘরে যাওয়া এক রূপ ছেড়ে দিয়েছেন, সর্ব্বদা কুলি-মজুরদের নিকট দাঁড়িয়ে থাকা—বিশেষতঃ যেখানে গঙ্গাবতী কাজ করে। গঙ্গাবতী যখন ছেলেকে দুধ খাওয়াতে যায় তখন শ্যামজী নির্জ্জনে পেলে কুপ্রস্তাব করেন। ফাঁক বুঝে কখনো হাত চেপে ধরেন। দশ বিশ টাকা হাতে গুঁজে দেন। গঙ্গাবতী নোট ছুঁড়ে ফেলে দেয়, চেঁচাবে বলে ভয় দেখায়। শ্যামজী গঙ্গাবতীকে দেখলেই মুচকি হাসেন, চোখ ঈসারা করেন। চক্ষুলজ্জাও দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

মিলের কর্ত্তৃপক্ষ মিলের শিশু-রক্ষাগার উঠিয়ে দিলেন কারণ কাজ

বেড়েছে, জিনিষ পত্তর রাখবার অসুবিধে। কুলিমেয়েরা প্রতিবাদ ক'রলে, কর্ত্তৃপক্ষ কোন ভ্রূক্ষেপ ক'রলেন না, কুলিরমণীদের অসুবিধে কেউ গ্রাহ্য ক'রলেন না। অনেক কুলিরমণী কাজ ছেড়ে দিলো, অন্য সকল কুলি ও কুলিরমণীরা ধর্ম্মঘট ক'রলো। মিল কয়েকদিন বন্ধ রইলো। মিলের চার-দিকে পুলিশ এলো পাহারা দিতে, বিদ্রোহী কুলিদের দমন ক'রতে। গরিব কুলিরা পেটের দায়ে প্রথম সর্ত্ত অনুযায়ী আপোষ ক'রতে রাজি হলো, কর্ত্তৃপক্ষ এদের আবেদনে কর্ণপাত ক'রলেন না। কুলি মজুররা নিরুপায় হ'য়ে আবার ধীরে ধীরে শান্ত শিষ্ট হ'য়ে মিলে ঢুকলো। ধর্ম্মঘট ভাঙ্গলো, কোন লাভ সুবিধে হ'লো না, নির্য্যাতন আরও বেড়ে গেলো। ধর্ম্মঘট করার দরুণ সর্দ্দাররা জেলে গেলো, অনেকে চাকরি হারালো।

ধর্ম্মঘট ক'রে সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা হ'য়েছিল গঙ্গাবতীর। মেয়ের অসুখ, টাকা পয়সা নেই, মিলের ডাক্তার রোগী দেখবেন না; ওষুধ পত্তর বন্ধ। কেউ এক পয়সা সাহায্য ক'রবে না; নিরুপায় হ'য়ে গঙ্গাবতী রোজই কাজ ক'রতে যেতে চাইত', পাড়াপড়সীরা জোর ক'রে ধরে রাখে, শ্যামজীর উল্লেখ ক'রে অশ্লীল শ্লেষ বিদ্রূপ করে। যে দিন ধর্ম্মঘট ভাঙ্গলো সে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। রুগ্ন মেয়েকে আফিম্ গোলা দুধ খাইয়ে মিলে গেলো কাজ ক'রতে। গিয়ে শুনলো তার চাকরি গিয়েছে—কারণ সে নাকি এ ধর্ম্মঘটের একজন নেতা ছিল উপায় নেই, দু'তিন দিন যাবৎ সে দু'বেলা খেতে পায় নি, ছেলেকে রীতিমত ওষুধ পথ্য দিতে পারে নি। অপমান সয়েও ছেলেকে বাঁচাতে হবে, তাই উন্মাদের মত শ্যামজীর শরণাপন্ন হলো—না হ'লে অন্য কেউ চাকরি দিতে পারবেন না। যদিও সে বুঝেছিল যে, এ একটা ফাঁদ, শ্যামজীর চাল, চাতুরী, তবু ফাঁদে পা দিতে হলো। যেমন ক'রে হোক সন্তানকে বাঁচাতে হ'বে!

গঙ্গাবতীর বশ্যতায় শ্যামজীর সাহস গেলো বেড়ে, অচল মুখ হলো সচল, কাম হলো প্রেম, সঙ্গে এলো যুক্তিতর্ক। গঙ্গাবতী যখন দোষীর মত নতমস্তকে চাকরির জন্যে দীনকণ্ঠে প্রার্থনা ক'রলে, তিনি ক'রলেন অভিনয়। প্রথম শাসালেন, তারপর বল্‌লেন—যার রূপ যৌবন আছে সে কোন দুঃখে, কোন যুক্তিতে অমন কষ্ট ক'রে কুলির কাজ করে! সে মুখের কথাটি খসালে যে অমন বহু দাসদাসী রাখতে পারে—তিনটি সন্তানকে না খাইয়ে মেরেছে, যা একটি এখনও আছে তাকেও শেষ ক'রবার যোগাড় ক'রেছে, নিজেও মরতে চলছে—কেন? এতগুলি নরহত্যায় কি পাপ হয় না, এর চেয়ে বড় পাপ কি দুনিয়ায় আর আছে! যে সৌভাগ্যকে পদদলিত ক'রে নিজেও ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যায় অপরকেও ধ্বংস করে, সে কি নরকেও স্থান পাবে? কানাই চরিত্রহীন, মাতাল, চোর, ডাকাত, নরকের কীটের মত ভয়ঙ্কর—তার আশাও বৃথা—অতএব আর কেন গোঁড়ামীর দোষে মহাসর্ব্বনাশ, মহাপাপ বৃদ্ধি করা? এখনো সময় আছে, যদি সুমতি হয়, একতিল বুদ্ধি থাকে তবে চলে এস, চিরজীবন রাজরাণীর হালে মাথায় তুলে রাখবো। তোমায় আমি বড় ভালবাসি, বিশ্বাস ক'র, এ ভালবাসায় ছলনা নেই। যদি কেবল তোমার রূপ, দেহ চাইতাম তবে ভালবেসে তোমায় জয় ক'রবার জন্যে তপস্যা ক'রতাম না, অন্যান্য যুবতীদের মত জোর জবরদস্তী ক'রতাম।

গঙ্গাবতী কোন উত্তর দেয় নি, ভ্রমরীমিত্রতার রূপ সে চেনে, বুঝে। ভ্রমরীমিত্রতা চিনুক, বুঝতে পারুক, সে যে সত্যিকার প্রেমও চায় না। স্বামীকে ভালবেসেছিল, ভালবাসা পেয়েছিল, দুরদৃষ্টবশতঃ তা' যখন হারিয়েছে তখন সেই স্মৃতি নিয়েই তাকে বাঁচতে হবে। সতীত্বের নিকট প্রেম, সুখ, সমৃদ্ধি, অসীম প্রতিপত্তি, রাজার ঐশ্বর্য্য যে অতি

তুচ্ছ। স্বামীকেই যখন প্রকৃত পক্ষে হারিয়েছে তখন তার মৃত্যুও যে হ'য়ে গেছে। রজতের কথা মনে পড়ে দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে, ভালবাসার কথাতে ভয়ও হয়; রজতের প্রভাব কি ভালবাসার মধ্যে দাবি জানায়? হয়তো জানায়, তবে সে দাবি স্নেহের সম্পর্কে! রজত যে তার দাদা, সত্যই যে সহোদর দাদার মত। রজতের বন্ধুতায়, ভালবাসায় স্বর্গীয় পবিত্রতা! আজ যদি রজত থাকতো তবে কি সে বোনের এতবড় অপমানে নিশ্চেষ্ট থাকতে পারতো! কক্ষণো না।...অন্তত আজ যদি কোলের শিশুটি না থাকতো তবে সে পাপ কথা শুনবার পূর্ব্বে মরণ বরণ ক'রতে পারতো। আজও তার দেহে এমন শক্তি আছে, মনে এমন বল আছে—যাতে শ্যামজীর মত নরাধমকে এক ঘুসিতে ধরাশায়ী ক'রতে পারে। কিন্তু উপায় নেই, তাই কোন প্রতিবাদ ক'রলে না, অদম্য ইচ্ছা সত্বেও এক ঘুসি নাকের ডগায় বসিয়ে দিয়ে জানিয়ে দিলে না যে, সে নারী—তার সতীত্ব, নারীত্ব খেলার জিনিষ নয়। উপায় নেই, পথ নেই, মুক্তি নেই—অভিশপ্ত শিশুটি যে এখনও কণ্ঠে জড়িয়ে আছে। টাকা চাই, পয়সা চাই। নীরবে, অতি নীরবে হেঁটমুখে সে কাজে চলে যায়; এমন ভাবে চলে গিয়েছিল যেন সে এত বড় সৌভাগ্যের প্রস্তাবে স্বীকৃত—অথচ সম্মতির কোন লক্ষণ এতটুকুও বোঝা যায় নি।

শ্যামজীর কুপ্রস্তাবে গঙ্গাবতী এখন আর রেগে উঠে না, চেঁচাবে বলে ভয় দেখায় না, চোটপাট ক'রে গায়ের জোর খাটাতে চায় না, কড়া কড়া কথা শোনায় না। মিলের ভেতরে একা কোথাও চলাফেরা করে না, কাজও করে না, কোথাও একা যেতে হলে একা যায় না, একজনকে সাথে নিয়ে যায়। শ্যামজীকে প্রাণপণে চায় এড়াতে। মিলে ঢুকতেই গা করে ছম্ ছম্, পা থাকে কাঁপতে; শ্যামজীর সাড়াশব্দ পেলেই গা

উঠে শিউরে, সান্নিধ্যে পড়লে মুখ যায় ছাইবর্ণ হ'য়ে, বুকের রক্ত হয় শীতল —এমন শীতল ও ভারী হয় যেন মস্ত বড় বরফের ওপর দস্তা চাপা দিয়েছে কেউ জোর ক'রে। মনে মনে ভগবানকে ডাকে অতি দীন করুণ ভাষায়।

শ্যামজীর চক্ষুলজ্জার মুখোস পড়ে গেছে, গঙ্গাবতীর ভীতার্ত্ত, শান্ত মুখের ভাবে সাহস সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এমনি ব্যাপার আরম্ভ ক'রেছেন যেন সে রাস্তার পানওয়ালী, পতিতা নারী, বাবুদের মিষ্টি হাসি পাবার জন্যে আসর জমিয়ে বসে আছে! হোক্ না সে দুর্দ্দশাগ্রস্তা, নির্য্যাতিতা গরিব নারী, হোক না সে স্বার্থপর হীন সমাজের পরিত্যক্তা, হোক না সে হীনচরিত্র, পাষণ্ড, মাতাল, চোর, জোচ্চোরের স্ত্রী—তবু ত' সে নারী। তার নারীত্ব ত' হীন নয়, তুচ্ছ অবজ্ঞার নয়। সে মূর্খ, অশিক্ষিত নারী বলে কি রোজ শুনতে হবে, বিশ্বাস ক'রতে হবে যে সতীত্ব গরিব ও আভিজাত্য নারীদের জন্যে নয়। সতীত্বজ্ঞান কুসংস্কার, সমাজের চালাকি, ফাঁকি! হোক কুসংস্কার, হোক চালাকি, হোক ফাঁকি— সে পারবে না, অসম্ভব—এর পূর্ব্বে মৃত্যু স্বেচ্ছায় না আসে তবে যেন জোর ক'রে সে মৃত্যুকে আনতে পারে। সতীত্ব হারাতে হলে যদি শ্যামজীর কথামত জ্ঞানী, অভিজাত হওয়া যায়, রাজরাণীর মত ঐশ্বর্য্যশালিনী হওয়া যায়, অসীম ক্ষমতাশালিনী হওয়া যায় তবে সে চায় না, চায় না কিছু সে দুনিয়ার। সে যেন চিরজীবন জন্ম জন্ম ধরে এমনি দুঃখ কষ্টই পায়।

ভাবতে ভাবতে অসীম শক্তি, বল জেগে উঠে, অপমানসূচক কথায় শরীরে আগুন জ্বলে উঠে, হাত দৃঢ়মুষ্টি হ'য়ে বজ্রের মত ভয়ঙ্কর হয়, শেষটায় পারে না—শিশু সন্তানের মরণোন্মুখ ছবি নয়নপথে ভেসে উঠে, সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলে; উপঢৌকনে, কুপ্রস্তাবে গর্জ্জে উঠে না— পদাঘাত ক'রতে উদ্যত হ'য়েও থেমে যায়, কাঁপতে কাঁপতে দূরে পালিয়ে যায়। প্রতিশোধ নেবার যে উপায় নেই।

—তেরো—

মিলের ছুটির সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হলো। প্রথম উড়লো ধূলিবালি, চোখ মেলা যায় না, চোখে মুখে সর্ব্বাঙ্গে গাদা গাদা রাস্তার হালকা আবর্জ্জনা এসে জড়াচ্ছে। দরজা জানালার কবাট দুম্ দাম্ ক'রে বন্ধ হচ্ছে আর খুলছে, গাছের ডাল পালা, কুঁড়ে ঘর-বাড়ি ধপ্ ধপ্ ক'রে ভেঙ্গে পড়ছে। কেউ রাস্তায় বেরোতে সাহস পায় না। তুফানের বেগও একটু কমলো—অমনি ঝপ্ ঝপ্ নামলো বাদল। বিশাল সমুদ্র উঠলো ক্ষেপে। ক্ষেপা সমুদ্রের মাঝবুক থেকে ধেই-ধেই ক'রে নেচে আসছে পাহাড়ের মত বিশাল জলের ঝাপটা, ঝপ্ ঝপ্ ক'রে পড়ছে জল। এমনি ভাবে জল পড়ছে যেন শিগ্‌গীর বন্যা হবে।

গঙ্গাবতী গেটের এক কোণে দাঁড়িয়ে ভীতচকিত নয়নে আকাশ পানে তাকিয়ে ভাবছে। বহু কুলি ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পালিয়েছে, যারা সে অবকাশ পায় নি, ঝড়ে যেতে সাহস পাচ্ছে না—তারা চিন্তিতমুখে আকাশ পানে ব্যস্তভাবে তাকিয়ে রয়েছে। জল আর ধরছে না, শিগ্‌গীর ধরবে বলে কোন লক্ষণও বোঝা যাচ্ছে না। এত বৃষ্টিতে যেতেও সাহস পাচ্ছে না, অথচ বৃষ্টি ধরার প্রতীক্ষায় কতক্ষণ বা উদ্বিগ্ন মনে অপেক্ষা ক'রবে। যুবকরা উস্‌খুস্ ক'রছে। অসহ্য হ'য়ে উঠলে দশ বার জন দল বেঁধে হল্লা ক'রতে ক'রতে বাড়ি চলে; এদের দেখাদেখি অন্য দল বের হয়।...

গঙ্গাবতীর বাড়ি যাবার তাড়া সব চেয়ে বেশি। রাত্রি হ'তে চললো, মেয়েটা হয়ত' জেগে উঠে মা'কে খুঁজছে, আর ভয়ে ক্ষুধায় মা'কে না পেয়ে চীৎকার ক'রে কাঁদছে। মেয়ের কথা মনে পড়তেই গঙ্গাবতী চমকে উঠলো, মনে বিভীষিকা জেগে উঠলো, ভয়ে অমঙ্গল আশঙ্কায় গা থর্ থর্ ক'রে কেঁপে উঠলো। কি বিষম স্বার্থপর সে! নিজের কষ্ট হবে বলে আরাম ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, জলের ছিটে যা'তে গায়ে না পড়ে সেজন্যে অপেক্ষা ক'রছে। সে কেন প্রতীক্ষা ক'রছে তার প্রকৃত কারণ মনে ক'রে সান্ত্বনা নিলে না, চেষ্টাও ক'রলে না, অভিযোগের ওজর দিলে না, মেয়েকে কষ্ট দিয়ে নিজে সামান্য জলের ভয়ে ছাদের নীচে দাঁড়িয়ে আছে সেজন্যে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলো। সে যে এতক্ষণ মেয়ের ভবিষ্যতের চিন্তায় যায় নি তা' মনে ক'রলো না; ভিজে বাড়ি গিয়ে কাপড় ছাড়বার মত একটা বস্ত্র নেই, যদি অসুখ-বিসুখ হয় তবে যে দু'জনকেই অনাহারে মরতে হবে। স্বপক্ষে বলবার তার কিছুই নেই, এতো পরের সঙ্গে দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ নয়। তারই বুকের রক্তে গড়া জীবনের একমাত্র অবলম্বন একটি মাত্র মেয়ে। সে সন্তানের জন্যে সব কিছু হাসিমুখে ত্যাগ ক'রতে পারে, ভগবানকেও অস্বীকার ক'রতে একটু ইতস্তত ক'রবে না; একটু কুণ্ঠিত হবে না। সন্তানের নিকট নিজের অস্তিত্ব ভুলে যায়, তাই ছুটলো উন্মাদের মত, কোনদিকে খেয়াল না করে'। ঝড়-তুফান অনুভূতির বাইরে, বাধা-বিপত্তি ভাববার সময় নেই, দিশেহারার মত ছুটলো, কেবলই ছুটছে।

ঝড়ের হাওয়া থেমে গেছে, টিপ্ টিপ্ ক'রে ছাতুর মত গুঁড়া গুঁড়া বৃষ্টির কণা পড়ছে। আকাশের স্তরে স্তরে মেঘরাশি জমাট বাঁধে নি, সমস্ত আকাশব্যাপী ছড়িয়ে আছে; আকাশ নিকষ কালো, ধরণী আঁধারে আত্মগোপন ক'রেছে, গুঁড়া গুঁড়া বৃষ্টির কণার সমষ্টিতে ধরণীর অনন্ত

আভরণকে কুয়াশাচ্ছন্ন ক'রে তুলেছে, তবে দৃষ্টির পথ রুদ্ধ নয়, আশু ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কর বিপর্য্যয়ের চিহ্ন নেই। একেবারে মুক্ত নয়, সরল নয়—কুটিলও নয়, ভীতিপ্রদও নয়।

গঙ্গাবতী চলেছে। রাস্তার মিটমিটে আলোকে দেখা যাচ্ছে তার শিথিলতা, ক্লান্ততা। অক্ষম দৈহিক শক্তির ওপর মানসিক বলের অত্যাচারের পরিণতি। গঙ্গাবতীর সর্ব্বাঙ্গ থেকে জল ঝরছে, মোটা এলো খোঁপা থেকে অবয়বে টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টির জল পড়ছে। পাতলা গাড়ীখানা গায়ে মিশে গেছে, শালুকা (অর্দ্ধ পাঞ্জাবীর মত জামা) ভিজে বুকে জড়িয়ে গেছে। ভেজা শরীরে শীতল বায়ু এসে একটু কাঁপিয়ে দিয়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে।

আঁধার রজনীর মেঠো আলোকে গঙ্গাবতীকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে। উজ্জ্বল অগ্নিশিখার মত রক্তাভ গৌরবর্ণ—দুঃখ-দুর্দ্দশায় এখনও মলিন হয় নি, বিষাদে দারিদ্র্যের পীড়নে যেন আরো রমণীয়, আকর্ষণীয়, অতুলনীয় সুন্দরী ক'রে তুলেছে শুভ্র গোলাকার মুখখানা। গভীর কাল টানাটানা ভাসামাসা চোখ দু'টি কি করুণ, কি মিষ্টি, কত সুন্দর—কত যুগের অনন্ত ভাবপ্রবণ ভাষার আধার! হাসি ভুলে গেছে, হাসতে চায়-পারে না, বিষাদ মুখ আরো বিষাদ-করুণ হ'য়ে উঠে। সে এত করুণ, এত বিষাদ বলেই বুঝি এত আকর্ষণীয়, এত সুন্দরী। কুলির মেয়ে, কুলির জায়া কি এত সুন্দরী হ'তে পারে? চার সন্তানের জননী এত রূপসী হয় কি করে'? শারীরিক মানসিক এত বিপত্তির পর কি গুণে এত সুন্দরী থাকতে পারে—যার জন্যে রাস্তার লোক থমকে যায়, পথিক পথ ভুলে যায়, চিত্রকর তুলিতে রঙ্ পরায়, বিদেশী আশ্রয় খুঁজে, যাযাবর আস্তানা গাড়ে, ক্রোড়পতিরা মাথা নত ক'রে ধর্ণা দিয়ে পড়ে, লোভ দেখায় নুরজার মত ঐশ্বর্য্যশালিনী ক'রে দিতে, ভদ্রমহিলারা অবাক

হ'য়ে চেয়ে থাকে, ছুটি কথা বলবার জন্যে ব্যস্ত হয়, সুন্দরীরা ঈর্ষায় জ্বলে মরে, পদস্থ ভদ্রলোকেরা অকারণে কারণ ঘটিয়ে আলাপ ক'রতে চায়।··· কি ক'রে এত সুন্দর চিরযৌবনের অটুট রূপরস নিয়ে সে দুঃখ কষ্ট নির্য্যাতনের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে চলেছে—তার উত্তর এখানে নয়। যিনি তাকে সৃষ্টি ক'রেছেন তিনিই জানেন এর রহস্য। হয়ত' সে আকস্মিক, অঘটন, সৃষ্টিকর্ত্তার খামখেয়ালী, ভুল; কিন্তু কল্পিতা নয়, অবাস্তব নয়।......

গঙ্গাবতী বাড়ি যাচ্ছে, ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে। এক হাঁটু জল শাঁ শাঁ ক'রে চলেছে, পদক্ষেপে ছপ্ ছপ্ ক'রে শব্দ হচ্ছে। কর্দ্দমাক্ত জল বৈদ্যুতিক আলোকে যেন টুকরো টুকরো শুভ্র কাঁচের মত চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। গঙ্গাবতীর কাপড় চোপড় কাদা জলে কাল হ'য়ে গেছে। এলোমেলো জলোহাওয়া বড় শীতল, বিশাল সমুদ্রের যেন গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস! সিক্ত অঙ্গে এক একটা ফুরফুরে হাওয়া দোল দিয়ে যায়—আর শীতে গা থরথরিয়ে কেঁপে উঠে। গঙ্গাবতীর কোন দিকে লক্ষ্য নেই, শীতে হাত পা কাঁপছে, দাঁত ঠক্ ঠক্ ক'রে বাজছে, সে শুধু মেয়ের কথা ধ্যান ক'রে এগোচ্চে। হঠাৎ একখানা বলিষ্ঠ হাত তার কম্পিত হাত চেপে ধরলো। ভয়ে থমকে দাঁড়ালো, ভীতাশ্চর্য্যনয়নে সুমুখে দেখলে শ্যামজী উত্তপ্ত মরুর পিপাসা নিয়ে নির্নিমেষ নয়নে তার দিকে চেয়ে আছেন—উঃ! কি ভয়ঙ্কর চাউনি, গঙ্গাবতীর গা শিউরে উঠলো। মুহূর্ত্তে নিজকে দৃঢ় ক'রে নিয়ে রুক্ষ কর্কশ স্বরে বললে—"ছিঃ! হাত ছাড়ুন। ছাড়ুন বলছি!"

হাত ছুটাতে পারলে না, মুক্ত ক'রেও দিলো না; বাঁধন দৃঢ় অথচ মৃদু। এ পরশ দেহকে করে অবশ, মনকে করে সম্মোহন। · · ·

শ্যামজী প্রাণের আবেগ ঢেলে বললেন—"তুমি কি পাষাণী!"

"আঃ! রাস্তার মাঝে কি মাতলামি ক'রছেন, ছাড়ুন হাত!"

"হুঁ! আজ তোমার একটা উত্তর চাই! তুমি কিসের জন্যে নিজেও ধ্বংস হচ্ছ, আমায়ও পুড়িয়ে মারছ? সতীত্বের ভয়? কিসের সতীত্ব! তুমি মূর্খ, লেখাপড়া শেখনি তাই সব ফাঁকি জোচ্চুরি ধরতে পার নি। কে তোমার স্বামী, তার কি পরিচয় বা তুমি দিতে পার?"

"ছাড়ুন বলচি—ভালয় ভালয়। আমার মেয়ের বড্ড অসুখ, বাড়িতে কেউ নেই—"

"তোমার কি এক তিল বুদ্ধি নেই? নিজে নয় সুখস্বচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন দিলে—কিন্তু সন্তান। এদের হত্যা ক'রবার কি অধিকার আছে তোমার। আজ আর কোন মানা শুনবো না। আমার স্ত্রী নেই, আমি তোমাকে আমার স্ত্রীর আসনে বসাবো; তোমার মেয়ের জন্যে ভয় ক'রো না, বৈপিত্রেয় মেয়েকে আমি নিজের সন্তানের মত দেখবো, শুধু একবার বলো তুমি আমার।"

শ্যামজীর কথা শুনে ও হাব-ভাবে গঙ্গাবতী বিষম ভয় পেয়ে গেলো। পাষণ্ডের সঙ্গে তর্ক ক'রে পারবে না—কিন্তু রাহু-গ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়াও কঠিন। এরা কুলি-মজুর, অশিক্ষিত, সংস্কারাবদ্ধ, কবিতার ধার ধারে না, বুঝালেও বুঝে না, তাই উপন্যাসিক প্রেম, যুক্তি-তর্ক শুনে ভড়কে যায়। এরা খোলাখুলি কথা বোঝে, জানে, এবং উত্তরও দেয়—এদিক, কি ওদিক। যে ধরা দেবার সে ধরা দেয় লোভে বা মোহে পড়ে; কেউ বা অবস্থায় পড়ে ধরা দিতে বাধ্য হয়, কেউ আবার লোভ, মোহ, বাধ্যতামূলক অবস্থায় পড়েও ধরা দেয় না, ধরা দেবার পূর্ব্বে জীবন বিসর্জ্জন দেয় বা অপরকে খুন ক'রে নিজের গরিমা রক্ষাও করে।... গঙ্গাবতী কোন উত্তর দিলে না, কিই বা উত্তর দিবে। একটি মাত্র উত্তর আছে কিন্তু তা' যে কার্য্যত অসম্ভব। সে গরিব, দুঃখিনী, নিঃসহায়

—কিই বা ক'রতে পারে। সে যা চায়, বলতে চায়—তার পরিণাম যে ভয়ঙ্কর। তার যে কেউ নেই, কেউ যদি জোর ক'রে ধরে নিয়ে যায় তবে কে তাকে বাঁচাবে, রক্ষা ক'রবে? এ পর্য্যন্ত যে কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যায় নি এই তার ভাগ্য, পূর্ব্বজন্মের পুণ্যের জোর। শ্যামজী যদি জোর ক'রে ধরিয়ে নেন তবে, সে কি ক'রতে পারে, কে তাকে দুর্বৃত্তের কবল থেকে উদ্ধার ক'রবে? জীনার স্বামী ছিল, ভাই বোন সবাই ছিল—কিন্তু কেউ কি তাকে রক্ষা ক'রতে পারলে? না দুর্বৃত্তের বিলাসকুঞ্জ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারলে? কেউ পারে নি, কুমার সাহেবের অর্থ ও প্রতিপত্তির নিকট আদালতের সূক্ষ্ম বিচার পর্য্যন্ত ব্যর্থ হ'য়েছে। জীনা রূপ যৌবন হারালো, কুমার সাহেব গলা ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিলেন। জীনা স্বামী পরিত্যক্তা, সমাজ ত্যক্তা হ'য়ে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা ক'রে কোনভাবে জীবন চালাচ্ছে। কোন প্রতিকার কি হ'য়েচে?

সে ছোটলোকের মেয়ে, খেটে খায়। দৈহিক ও মানসিক অসীম শক্তি সে রাখে। ইচ্ছে ক'রলে শ্যামজীকে দু'তিন ঘুসিতে কাত ক'রে দিতে পারে—হয়ত' ডাক্তার ডাকবারও প্রয়োজন হ'তে পারে। কিন্তু তার পর? সে কোথায় যাবে? কে তাকে স্থান দেবে? এ বিশ্ব জুড়ে কোথায়ও যে তার স্থান নেই, কাউকে যে সে বিশ্বাস ক'রতে পারে না, বিশ্বাস ক'রবার যে আর কোন উপায়ও নেই। পোড়া রূপ যৌবন যতদিন পর্য্যন্ত আছে ততদিন যে তার নিষ্কৃতি নেই। একগণ্ডা সন্তানের জননী হলো, মিলে হাড় ভাঙ্গা শ্রম ক'রছে প্রায় সাত বছর যাবৎ—তবু না যায় রূপ, না যায় যৌবন। কিন্তু এমন ভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে বা কতকাল! যে হয় রক্ষক সেই সাজে সংহারকর্ত্তা, যার পায় ক্ষুধা সেই চায় ক্ষুধা মেটাতে।

হঠাৎ কেঁপে উঠলো যেন ধরণী, থমকে গেলো পশু পক্ষী, ভয়ে চমকে উঠলো মানব, বীভৎস রাগিণীতে মথিত হ'য়ে উঠলো আকাশ বাতাস। জনক মৃত ছেলেকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে আর্ত্ত-স্বরে চেঁচাচ্ছে 'বাবা! বা-বা!' জননী মৃতদেহ সাপটিয়ে ধরে ক'রছে পাষাণভেদী আর্ত্তনাদ। নীরোগ ছেলে সকাল বেলাও হেসেছিল, খেলনা নিয়ে খেলেছিল, মূক ভাষায় জনকজননীর সঙ্গে সোহাগ আবদার ক'রেছিল। আফিম্ খাইয়ে শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে মিলে চলে যায়, ফিরে এসে আর পেলো না। জন্মের ঘুম ঘুমিয়েছে, আর জাগাতে পারছে না। জনক জননী! ঘুম চেয়েছিলে! এবার আর চিন্তা নেই, যুগ যুগান্তর ধরে ঘুমাবে। হায় রে অভিশপ্ত কুলিমজুর! এমনি ক'রেই কি মরতে হয়!

'আমার মেয়ে! আমার সোনার মাণিক!' গঙ্গাবতী উন্মাদিনীর মত ছুটলো। শ্যামজী নির্ব্বাক, নিস্পন্দ হ'য়ে গঙ্গাবতীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল হ'য়ে গেছে, একচুল নড়বার শক্তি নেই। মাতৃত্বের দীপ্তির নিকট চোখ ঝলসে গেলো, শক্তি সামর্থ্য কামের অগ্নিদাহ জড়, নিষ্প্রভ, নিস্তেজ হ'য়ে গেলো।

উন্মাদিনী ছুটেছে, ছুটেছে, কোন হুঁস নেই; শুধু বিভীষিকা—ভয়ঙ্কর অতীব ভয়ঙ্কর—মৃত্যুরাজ বহু পূর্ব্বে এসেছেন, টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছেন, সে যেতে চায় না, প্রাণপণে মাকে ডাকছে, পারছে না চেঁচাতে, ভয়ে গলা শুকিয়ে গেছে, সে বাড়ি পৌছতে না পৌছতে মৃত্যুরাজ চলে গেলেন, শুধু একটি কথা কইতে, শুধু একবারের জন্যে দেখতে দিলেন না, চলে গেলেন।...গঙ্গাবতী দৌড়চ্ছে, হাঁপাচ্ছে, পা যেন চলে না, ভীষণ ভারী, দস্তার মত ভারী। পিছল রাস্তায় কতবার পড়ে গেলো, কতবার পড়তে পড়তে বেঁচে গেলো। এক ধাক্কায় দোর ঠেলে উন্মত্তের মত ভীত রোরুদ্যমান শিশুকে বক্ষে চেপে ধরে নিজেই অসহায়ের মত কান্না জুড়ে

দিলো। নিষ্ঠুরা জননী কি ক'রেই বা প্রবোধ দেবে! এত বড় নির্দ্দয়তার কি কোন ওজুহাত আছে! তিন চার বছরের মেয়ে আজও হাঁটতে পারে না, ভাল ক'রে বসতে পারে না, কথা পর্য্যন্তও কইতে পারে না, রোগে ভুগে ভুগে দড়ির মত শুকিয়ে গেছে। এত রোগা, এত দুর্ব্বল—তার ওপর সারাদিন খায় নি ভাল ক'রে, কখন দুপুরে একটু বুকের দুধ চুষেছিল—সাত আট ঘণ্টার ক্ষুধায় নির্জীব হ'য়ে গেছে। পেট মেরুদণ্ডের সঙ্গে মিশে গেছে, মুখখানা মুমূর্ষুর মত শুষ্ক পাংশু হ'য়ে গেছে, বুক শুকিয়ে কাঠ হ'য়েছে, আঁধার নির্জ্জন ঘরে ঝড় তুফানের ভয়ে প্রাণের স্পন্দন, অনুভূতিটুকু যেন হারিয়ে ফেলেছে—জড়, নিস্পন্দ, মূক, বধির—মরণ কান্নায় গলা ভেঙ্গে গেছে, গোঁ গোঁ ক'রে গোঙানোর ক্ষমতাও নেই আর। নির্দ্দয় জননীর কোলখানি পেয়ে কি ক'রে জানাবে তার প্রাণের ভাষা। অবসর বা কৈ? মাতৃস্তন হ'তে রক্তচোষকের মত প্রাণপণে মাতার মধু চুষে নিচ্ছে। সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার জ্বালায়, ভয়ে আশ মিটিয়ে চোঁ-চোঁ ক'রে দুধ টানতে পারছে না, যেন মরুভূমিতে বিন্দু বিন্দু বারিধারা পড়ছে টপ্-টপ্ করে'। মাতার ভাষা নেই, সান্ত্বনা নেই—আছে রোদন, বিলাপ—আছে কল্পনাতীত আবেশ। শিশু মূক, বধির চেতনাহীন—আছে শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস, যেন দম আটকে যাচ্ছে।

— চোদ্দ —

মেঘ ক'রেছে ঘটা ক'রে, আঁধার সমস্ত পৃথিবীটাকে গ্রাস ক'রে রাত্রির মত ক'রে ফেলেছে। নেই শশী, নেই তারকা-রাশি, নেই সূর্য্য, নেই রাস্তার বৈদ্যুতিক আলোক, নেই বস্তিতে কোন স্তিমিত প্রদীপ শিখা। আছে মেঘেব গম্ভীর চাপা নিঃশ্বাস, বাতাসের শোকতপ্ত দীর্ঘশ্বাস। নেই রাত্রির নির্জ্জনতা, নিঝুমতা, নেই দিনের কোলাহল। না আছে স্বচ্ছ উজ্জ্বল আলোক, না আছে নিকষ আঁধার। হচ্ছে না বর্ষণ, হচ্ছে না তুফান, খাচ্ছে না মেঘে মেঘে ধাক্কা, ক'রছে মেঘে মেঘে কোলাকুলি, মেঘের ওপর মেঘ জমে প'ড়ছে ঢলে'।

গঙ্গাবতী মেয়ের অসুখের জন্যে চার পাঁচ দিন যাবৎ কাজে যেতে পারে নি। হাতে জমানো টাকাকড়ি বিশেষ কিছু ছিল না, যৎসামান্য বহু কষ্টে শিষ্টে যা' জমিয়েছিল তা' মেয়ের পথ্য যোগাতেই খরচ হ'য়ে গেছে; নিজে অনেক দিন দু'বেলা খেতে পায় নি, একবেলা উদর পূর্ণ ক'রে খাবারের সংস্থান ছিল না, ধার ক'রে কোন ভাবে এ কয়েকদিন চালিয়েছে। শারীরিক ও মানসিক কি যে দুর্দ্দশা, দুরবস্থা গিয়েছে এ কয়েকদিন—তা বর্ণনা করা যায় না।

হাতে এক পয়সা নেই, ধারও মিললো না। মেয়েকে একটু ভাল দেখে গঙ্গাবতী কাজে যেতে মনস্থ ক'রলো; কাজে যাওয়া ভিন্ন উপায় নেই। মেয়েকে একটু আফিম্ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে মিলে গেলো।

ক্রমাগত রাত্রি জাগরণে দুশ্চিন্তায়, শারীরিক পরিশ্রমে শরীর বড় দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে, তাঁতের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, শরীর কেবলই ঢলে পড়ছে। দেহ মন চায় দীর্ঘ বিশ্রাম, ভাল অপর্য্যাপ্ত-পরিমাণ খাদ্য, সুকোমল শয্যা। উদর ইচ্ছামত সুস্বাদু খাদ্যের লোভ ছাড়লেও দেহ মন কিছুতেই বিশ্রাম, নিদ্রার লোভ ছাড়তে পারছে না। সে ভাগ্য তার নেই, অভিশপ্তদেরও নেই সে ভাগ্য। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম ক'রতে হবে, গতর খেটে মূল্য নিতে হবে, তারপর ক্ষণিকের বিশ্রাম—সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার কিঞ্চিৎ প্রতিকার। তাঁতের পাশে দাঁড়িয়ে কেবলই ঝিমোচ্ছে। মাকুর ঠাস্-ঠাস্ শব্দে, এন্‌জিনের ঘস্-ঘস্ শব্দে চমকে ওঠে, অনবরত শব্দ ক্রমে একঘেয়ে হ'য়ে যায়। ধীরে ধীরে অনুভূতির বাইরে চলে যায়, কখনো পড়ে ঢলে, জীবন্ত হয় চমকে, ব্যথা পেয়ে। কেউ কেউ ওপরওয়ালার চাঁটা খেয়ে, গুঁতো খেয়ে— 'উঃ' ক'রে ভীষণভাবে আঁৎকে উঠে।...

গঙ্গাবতী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগলো—মেয়ের জ্বর হঠাৎ বেড়ে গেছে, যন্ত্রণায় ঘুম ভেঙ্গে গেলো আকুলি-বিকুলি ক'রে মা'কে খুঁজছে, পেলে না—প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলো। গঙ্গাবতী 'এই ত' আমি' বলে সাঁ সাঁ ক'রে ছুটে গিয়ে সন্তানকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে তাঁতের সঙ্গে ধাক্কা খেলো। ধাক্কা লেগে তন্দ্রা ভেঙ্গে গেলো, চেয়ে দেখে সূতা ছিঁড়ে গেছে, মাকু সূতায় জড়িয়ে আছে। একটা বড় নিঃশ্বাস অতি কষ্টে ছেড়ে যন্ত্র বন্ধ ক'রে মাকু ঠিক ক'রে, সূতা ঠিক ক'রে দিয়ে আবার যন্ত্র চালিয়ে দিলে। নিঃশ্বাসটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ, কিন্তু যন্ত্র চললো ঠিক মত।

মিল ছুটির সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাবতীর ওপর থেকে তলব পড়লো। তলব শুনে গঙ্গাবতী ভীষণ দমে গেলো। এ কয়েকদিন সে কাজে আসতে

পারে নি, সেজন্যে হয়ত' কর্ত্তৃপক্ষ ক্রুদ্ধ হ'য়েছেন, চাকরির জবাব দিয়ে দিতে পারেন। যদি চাকরির জবাব হ'য়ে যায় তা'হলে উপায়?

শ্যামজী গঙ্গাবতীকে অনুপস্থিতির জন্যে খুব শাসালেন, চাকরী যাবার ভয় দেখালেন। অবশ্যি পুরুষদেরও শারীরিক বা পারিবারিক অসুখ-বিসুখের জন্যে অনুপস্থিত থাকলে চাকরি যায়, নির্য্যাতন সহ্য ক'রতে হয়। গঙ্গাবতী শ্যামজীর বক্তৃতা শুনে অধৈর্য্য হ'য়ে পড়লো! রীতিমত রাত্রি হ'য়ে গেছে, কখন মেঘ আরম্ভ হ'য়েছে ঠিক নেই, ঘরে মরণ শয্যায় রুগ্ন শিশু, এতক্ষণে ক্ষুধায় জেগে উঠেছে। আঁধার ঘরে জননীকে খুঁজছে, কেবল খুঁজছে—পেলে না, ভয়ে ক্ষুধার জ্বালায় চেঁচাচ্ছে, জননীর কোন সাড়া পেলো না। দুর্ব্বল শরীরে আর চেঁচাতে পারছে না—গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেলো; উঃ! কি করুণভাবে গোঙাচ্ছে। তবু জননী নেই, স্নেহনির্ভর, সর্ব্বসান্ত্বনাময় বাহুডোর নেই, মধুস্রোতা স্তনযুগল নেই, একজন পাড়াপড়সী পর্য্যন্ত নেই। একা, অতি একা—নির্জ্জন আঁধার ঘরে। ঐ ঝড়ো হাওয়া বইতে লাগলো! কি প্রচণ্ড দাপট? কি গুরু হুঙ্কার! কি নিকষ-আঁধার। শিশু যে আর গোঙাতে পারছে না! বুঝি অচেতন হ'য়ে পড়লো। কেউ নেই, হায় কেউ নেই! গঙ্গাবতী হঠাৎ উঠলো চমকে! বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে, ঘরখানি স্বচ্ছ তীব্র আলোকে উজ্জ্বল। কত আকাশ-পাতাল প্রভেদ সেই কুঁড়েঘরে আর এখানে! গঙ্গাবতী প্রভুকর্ত্তার পানে তাকিয়ে দেখলে তিনি হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছেন, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে যেন চুষে নিচ্ছেন। রূপ দেখবার ও প্রেম ক'রবার এই তো সময়! একটা বড় নিঃশ্বাস ছেড়ে গঙ্গাবতী তাড়াতাড়ি বের হ'য়ে এলো বাইরে।

রাত্রি সাতটা। গঙ্গাবতী দ্রুত হেঁটে চললে, ঝড় এলো বলে, ঝড়ের আগে তাকে জিনিষপত্র কিনতে হবে, তারপর বাড়ি যেতে হবে। প্রবাদ

আছে—'রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে!' গঙ্গাবতীরও হলো তাই। শ্যামজী যতদিন পর্য্যন্ত তার প্রতি আসক্ত থাকবেন ততদিন তার চাকরি যাবে না, আর যতদিন যৌবনকুসুম সৌরভ ছড়াবে ততদিন চারদিক বিপত্তিতে ঘিরে থাকবে। তাই বুঝি গেট থেকে বের হ'তে না হ'তেই নামলো বাদল মুষলধারে।

রাত্রি কেবল বেড়ে যাচ্ছে, ঝড়োবাদল থামছে না! রাস্তার লোক চলাচল একরূপ বন্ধ হ'য়ে গেছে, মাঝে মাঝে ছু'একটা মোটর গাড়ি ভঁস্-ভঁস্ ক'রে বায়ুবেগে চলে যাচ্ছে, ক্বচিৎ পদাতিকের ভীত চঞ্চল পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে! গঙ্গাবতী কি ক'রবে? জিনিষপত্তর না কিনতে হলে একদৌড়ে বাড়ি চলে যেতে পারতো? কিন্তু রোগীর পথ্য, নিজের খাদ্য যে কিনতেই হবে! এমন দুর্য্যোগে কোথায় পাবে বার্লি সাগু, কোথায় পাবে আটা ছাতু? সব দোকান যে বন্ধ হ'য়ে গেছে! উপায় নেই! সহসা মেয়ের মুখখানা চোখের ওপর ভেসে উঠলো। চমকে উঠে, দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে, বুকের ভেতর হাতুড়ীর ঘা পড়ে ধপ্ ধপ্ ক'রে! সময়ও যাচ্ছে দ্রুতগতিতে ছুটে! ভাবলে বাড়িই ফিরে যাবে। বুক ছিঁড়ে, স্তন নিঙড়ে সন্তানকে খাওয়াবে, নিজে উপোষ ক'রবে, তবু যেতে হবে। কিন্তু তার পর দিন? সৌভাগ্য ত' আকাশ থেকে ঠিকরে পড়বে না! মিলে আসবার পূর্ব্বে ত' বাজার ক'রে নিজে খেয়ে ও মেয়েকে খাইয়ে আসবার সময় পাবে না! তবে উপায়? উপায়, উপায়, উপায়—কি করা যায়, কি করি, গঙ্গাবতী উত্তেজিত হ'য়ে পড়লো, শরীর শিথিল হলো, ইন্দ্রিয় সুড়সুড়ি দিতে লাগলো। কোন কিছুই ঠিক ক'রতে পারলে না। ঢং-করে সাড়ে আটটা বাজলো। সর্ব্বনাশ! গঙ্গাবতীর ভয় হলো মেয়েটা হয়তো এতক্ষণে মরে গেছে! মুহূর্ত্তে সকল বিপত্তি চলে গেলো, কঠিন সমস্যার সমাধান হ'য়ে গেলো! একটু এদিক ওদিক

না তাকিয়ে, একবার বর্যাঝরা আকাশ পানে না চেয়েই মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে গৃহমুখী চল্‌লো।

গেটের পাশে একখানা সিডান বডির গাড়ি। মোটরচালক গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে, আর অনুসন্ধিৎসু নয়নে মিলের ভেতর পানে তাকিয়ে আছে। গঙ্গাবতী কোন কিছুর খেয়াল না ক'রে মোটরচালকের পাশ ঘেঁসে চল্‌লো, মোটরচালক পথ আটকিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—অত দেরিতে যে? খুব খাটুনি গেচে বুঝি?

গঙ্গাবতী একটু নৈরাশ্যভাবে বল্‌লে—খাটুনি বেশি হয় নি, ছোটবাবু একটু দেরি করিয়ে দিলেন, তারপর পোড়া ঝড়োবাদল যে আরম্ভ হ'য়েছে, কিছুতেই থামছে না, কখন ক্ষান্ত হবে কে জানে!'

'এই ঝড় ঝঞ্ঝায় যাবে নাকি? আর একটু দেখে যাও!'

'না কাকা! মেয়েটার বড্ড অসুখ। হাতে একটি পয়সা নেই তাই মেয়েটাকে মরণ শয্যায় রেখে চলে এসেচি। এত রাত হ'য়ে গেলো, তার ওপর মুষলধারে জল পড়ছে, বেচারীর যে কি দশা হ'য়েছে!' একটা বুক ফাটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরুলো। কত ব্যাকুলতা, কত ব্যস্ততা, কত অসহায়ের বেদনায় নিঃশ্বাস কে বুঝতে পারে?

'বাচ্চার এত বড় অসুখে মা হ'য়ে একা ফেলে চলে আসতে পারলে? তোমরা কি সাংঘাতিক নারী বাছা! বাচ্চা হয়ত' এতক্ষণ মরে ভূত হ'য়ে গেছে। সেদিন এমনি একটি ছেলে—'

গঙ্গাবতী বাতাসের মত কেঁপে উঠলো, বিভীষিকায় অভিভূত ক'রে ফেল্‌লে। 'উঃ!' করে একটা আর্ত্তনাদ ক'রে হন হন্ ক'রে উর্দ্ধমুখে বাড়ি যাবার জন্যে পা বাড়ালে।

মোটরচালক বাধা দিয়ে বল্‌লে 'আমি যে তোমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে এলাম, মেয়েটা কাঁদতে পারছে না, কেবল গোঙাচ্চে, দৌড়ে চলে যাও!'

'অদৃষ্ট—কাকা! অদৃষ্ট! আচ্ছা, যাই।'

'এতদূর একা একা নির্জ্জন বিশ্রী রাত্রিতে যাবে? তুমি যদি যেতে চাও পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি।'

'বলো কি কাকা! বাবু জানলে শেষটায় তোমার চাকরি যাবে! কাজ নেই এ দুর্দ্দিনে বিপদ এনে! আশীর্ব্বাদ ক'রো!'

'না-না তোমার অত ভয় ক'রতে হ'বে না। বাবু হ'লো মাতাল—অত হুঁশ কি থাকে! আমি এমনই বসে আছি, তোমার এ বিপদে একটু সাহায্য ক'রতে পারবো না! আমার বড় মেয়ে যে তোমারই বয়সী!'

গঙ্গাবতী আর কোন দ্বিরুক্তি ক'রলে না, পিতার বয়সী লোকের সঙ্গে যাবে, তার মেয়ে যে তাকে খুব ভালবাসতো, এখনো শ্বশুরবাড়ি থেকে এলে রোজ ডেকে নিয়ে যায়। গঙ্গাবতী চট ক'রে গাড়িতে উঠে বসলো, তার প্রাণ বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলেছে বাড়িমুখে, মন চলে গেছে সন্তানের পাশে, প্রবল ইচ্ছে হচ্ছে দেহটাকে এক লাফে সন্তানের পাশে নিয়ে যায়, পলকে সন্তানকে বক্ষে চেপে ধরে চুম্বনে চুম্বনে প্রাণের অনন্ত, ক্ষিপ্ত, উন্মাদ ক্ষুধা ঢেলে দেয়। গাড়ি চলছে ভঁস্ ভঁস্ ক'রে। একটু দ্বিধা নেই, একটু সঙ্কোচ নেই—এতই লোভ, এতই প্রবল আকর্ষণ। কোথায় চলছে, কোন পথ দিয়েই বা চলছে তার কোন লক্ষ্য নেই, সে শুধু জড়ের মত বসে আছে গাড়ির এক কোণে—খোলা জানালা দিয়ে চেয়ে আছে বাইরের দিকে, দৃষ্টি উদাস, বাহ্যিক দৃষ্টি নেই, শুধু চেয়েই আছে—দেখছে না কিছু, ভাবছে পোড়া অদৃষ্টের কথা, কৃতজ্ঞতায় ধন্যবাদ জানাচ্ছে মনে মনে মোটরচালককে। ভাবছে—শুধু ভাবছেই, ইতো-মধ্যে যে কোথা দিয়ে কোথা চলে এলো অতটুকু টের পায় নি। এতক্ষণে যে হেঁটে বাড়ি যেতে পারতো। যখন বাহ্যজ্ঞান হলো তখন সে মহা-

সর্ব্বনাশের আড়ম্বরপূর্ণ দোরে বন্দিনী। গাড়িবারান্দায় মোটর দাঁড়িয়ে আছে। একটি বৈদ্যুতিক বাতি মিটু মিটু ক'রে জ্বলছে। আকাশে ইতস্তত মেঘপুঞ্জ ছড়িয়ে আছে, মাঝে মাঝে কয়েকটা তারকা হীরক-টুকরার মত ধক্ ধক্ ক'রে জ্বলছে। ধরণীর মহাশূন্য আবরণ জমাট আঁধার নয়, শুভ্রালোকে উদ্ভাসিতও নয়। আবছায়া আলোছায়া ছড়িয়ে র'য়েছে। বাড়ির পাশে বড় বড় বৃক্ষশ্রেণী, মানুষের তৈরি ছোট ছোট পাহাড়, ঝর্ণা, ফোয়ারা, পুষ্পে শোভিত লতায় পাতায় কুঞ্জ, রুচিমার্জ্জিত পুষ্পোদ্যান, পল্লব-শাখায় কারিকুরি! হাসনাহানার মদির মাতাল বায়ে চারদিক আমোদিত ক'রে তুলছে। রজনীগন্ধা বিধবার শুভ্র হাসি নিয়ে স্বচ্ছ, পবিত্র বাস ছাড়ছে।

গঙ্গাবতী সভয়ে দেখলো যে, সে বাগান-বাড়িতে বন্দিনী হ'য়েছে। মোটরচালক গাড়িতে নেই, গাড়ির পাশে শ্যামজী দাঁড়িয়ে আছেন। তার চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে খান খান হ'য়ে গেলো, ভয়ে সমস্ত শরীর থর্থর ক'রে কাঁপতে লাগলো। আজ আর তার নিষ্কৃতি নেই। সে যতই শক্তিশালিনী, স্বাবলম্বিনী, ক্ষমতাশালিনী, স্বাধীনা নারী হোক না কেন আজ আর কোন উপায় নেই, পরিত্রাণ নেই। সে যত বড় নারীই হোক, তবু সে নারী মাত্র। এমন অবস্থায় পুরুষের পশুপ্রবৃত্তির নিকট যে কোন নারীই, রক্তমাংসের একটা নারী-দেহ তুল্য হয়! এমনই অবস্থায় শ্যামজীর পশুশক্তির নিকট জয়লাভ করা দৈবানুগ্রহ ভিন্ন উপায় নেই। কাকুতি-মিনতি, চোখের তপ্ত, ফুটন্ত অশ্রুজল, সতীর তীব্র অভিশাপ, শারীরিক শক্তি—সব ব্যর্থ, নিস্ফল। নির্জ্জন, নিঝুম রাত্রিতে, নরক-তুল্য পাষাণ কারাগারে সে কি ক'রে ত্রাণ পাবে? এ নরকপ্রাসাদ বহু সতীর সতীত্ব পূজা পেয়ে বড় হিংস্র হ'য়ে পড়েছে। ছলনা, কল-কৌশল সবই কি ব্যর্থ হবে? একবার যদি দৌড়ে বাইরে যেতে পারে তবে কি

উপায় হবে না? এখনও ত' রাস্তায় লোক চলাচল ক'রছে, হয়ত' পরিত্রাণ পেলেও পেতে পারে!

শ্যামজীর মুখ থেকে বিলিতী মদের গন্ধ বেরুচ্ছে, চোখ দুটি ফোটা রক্তজবার মত লাল, অঙ্গ শিথিল, টলতে টলতে এগিয়ে এসে বললেন—সুন্দরি! মম আরাধ্যা দেবি! আমি তোমায় ভা-লো-বা-সি। ওগো হৃদ্‌পিণ্ডেশ্বরি'—কথা আটকে গেলো, লোলুপনয়নে চেয়ে রইলেন। কি ভীষণ চাউনি!

গঙ্গাবতী যেন কোন ভয় পায় নি, স্বেচ্ছায় এ পাপময় সুখ-সাগরে এগিয়ে এসেছে—এমনি ভাব দেখিয়ে বললে—'আমার মেয়ের বড্ড অসুখ, খুব জ্বর বেড়েছে, বিষম কাঁদছে একা একা।'

'কিছু হয় নি, ও মিছে কথা; তুমি স্বচ্ছন্দে এসো সখি! কোন চিন্তা নেই, তাকে আজ রাত্রেই এখানে এনে দেবো।'

গঙ্গাবতী একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্লে—'আঃ বাঁচলাম। দেখো! মেয়েকে কিন্তু আজ রাত্রির মধ্যে চাই, নইলে আমি থাকবো না।'

'এক্ষুনি আনিয়ে দিচ্ছি'—শ্যামজী শিথিলহস্তে দ্বার খুলতে খুলতে বল্‌লেন—'এসো পিয়ারী!'

গঙ্গাবতী শ্যামজীর হাত ধরে মোটর থেকে নামলো। শ্যামজী ধৈর্য্য আর রাখতে পারলেন না, দু'হাত বাড়ালেন জড়িয়ে ধরবার জন্যে। গঙ্গাবতী সাঁ ক'রে বজ্রের মত প্রকাণ্ড এক ঘুসি মারলে, শ্যামজী মাটির ওপর ঘুরে পড়ে গেলেন ধপ্‌ করে', নাক থেকে দর্‌দর্‌ ক'রে রক্ত পড়তে লাগলো। মোটরচালক ও ভৃত্য চুরি ক'রে মদ এনে খুব আমোদ ক'রে মদ খাচ্ছিলো, হঠাৎ চীৎকার শুনে 'কি হলো' বলে হোঁচট খেতে খেতে বাবুর নিকট ছুটে এলো। গঙ্গাবতী তৎক্ষণে এক গলির মধ্যে আত্মগোপন ক'রে ফেলেছে।

গঙ্গাবতী মেয়েকে বক্ষে জড়িয়ে ধরে কাল কোথায় পালাবে সেই মস্ত বড় কঠিন সমস্যা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছে, ঘুম এখনো ভাল ক'রে পায় নি, একটু তন্দ্রা এসেছে মাত্র, হঠাৎ দরজা ভাঙ্গার শব্দে জেগে উঠলো—বজ্র-গম্ভীর ভীষণকণ্ঠে বল্‌লে—'কে ? কি চাই ?'

'দরজা খোলো।' গঙ্গাবতী শ্যামজীর কণ্ঠস্বর শুনে চিনতে পারলে, রুক্ষ স্বরে বল্‌লে—'ভালয় ভালয় ফিরে যান, নইলে আজ খুন ক'রবো।'

'পিয়ারি ! যত টাকা চাইবে ততই দেবো, যা' চাও তাই দেবো।'

'তবে রে লম্পট, বদ্‌মাইস্ ! এক ঘুসিতে বুঝি শিক্ষা হয়নি !'

'ভাল মানুষটির মত দরজা খুলে দাও, কেউ দেখবে না, কেউ টেরও পাবে না—তোমায় সোনাদানা, টাকাকড়ি দিয়ে ঢেকে রাখবো পিয়ারী !'

'দাঁড়া বদ্‌মাইস ! ঠেঙ্গিয়ে সোনাদানা বের করাচ্ছি !'

'স্বেচ্ছায় রাজি হও ত' মঙ্গল—নইলে জোর ক'রে নিয়ে যাবো, এবার আর ফাঁকি, চালচাতুরী খাটবে না, কারও বাপের সাধ্যি নয় এবার রক্ষা করে তোমায় !'

'খুন ক'রে যদি ফাঁসি যেতে হয় তবে ফাঁসিই যাবো ; বড়লোক বলে আজ আর ডরাবো না, এখনো পালাও—নইলে চেঁচিয়ে লোক জড়ো ক'রবো।'

শ্যামজী দুমদাম ক'রে দরজায় ঘা মারতে লাগলেন। গঙ্গাবতী একখানা ইট নিয়ে দরজার ওপরের ফাঁক দিয়ে শ্যামজীর মাথায় ছুড়ে মারলে। 'মাগো' বলে শ্যামজী মাটির ওপর লুটিয়ে পড়লেন।

কারও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না। নিঝুম রাত্রি। • • •

— পনেরো —

গঙ্গাবতী শ্রীরাম মিলের কাজ ছেড়ে দিয়ে তার পরদিনই শহরের অপর প্রান্তে চলে আসে। শ্যামজীর ভয়ে এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করে নি। শ্যামজীর দ্বারা কোন কিছু বিশ্বাস নেই, হয়ত' ব্যর্থ হ'য়ে অপমানে মরিয়া হ'য়ে নতুন জাল বিস্তার ক'রে অষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে নিয়ে যাবেন, যুপকাষ্ঠ থেকে মুক্তি পাবার আর কোন উপায় থাকবে না। কি হবে? কোথায় যাবে? কোথায় পাবে আশ্রয় মাথা গুঁজবার? কোথায় পাবে একমুষ্টি খাবার? জানে না, তবু পোঁটলা-পুঁটলী নিয়ে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অজানা পথে চললো। সে জানে, ভাল ক'রেই বুঝতে পারে যে তার স্থান নেই, যেখানে যাবে সেখানেই ক্ষীণজীবী পতঙ্গ অগ্নিশিখায় ঝাঁপিয়ে পড়বেই। নির্দ্দিষ্ট পতঙ্গের আক্রমণ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু রূপ-পিপাসী পতঙ্গের আক্রমণ চলবেই। চব্বিশটি ঘণ্টার আয়ু নিয়ে পোকা জন্মায়, ওরা কি আগুনের শিখা দেখে দূরে থাকতে পারে? ঝাঁপিয়ে পড়ে, রূপের মোহে অকালে প্রাণ হারায়। গঙ্গাবতী জানে যে যতক্ষণ দীপ্তি আছে ততক্ষণ আলোক ছড়াবেই, সঙ্গে সঙ্গে রূপ-পাগলার অত্যাচার হবেই—তবু চল্‌লো অচীন পথে। জমিদারের লোক যখন আদালতের সাহায্যে বাড়ি-ঘর নিলাম ক'রতে আসে তখন উপস্থিত বিপত্তিকে এড়াবার জন্যে লোকে বেশি সুদে টাকা ধার করে। উপস্থিত বিপত্তিকে বাধা দেবার জন্যে লোকে ভবিষ্যতের বড় বিপত্তি তৈরি ক'রে

বর্ত্তমান বিপত্তি এড়ায়। তেমনই গঙ্গাবতীও ভবিষ্যৎকে ভবিষ্যৎ রেখে রাস্তায় নামলো।

উদ্‌ভ্রান্তের মত সারা রাস্তায় ঘুরছিল, কোথা'ও যাবে ঠিক, যেতে হবে সুনিশ্চিত—কিন্তু কোথায়, কিসের ভরসায় তা' ঠিক ক'রতে পারে নি। যাওয়া যে কত কঠিন, মানুষের পশুপ্রবৃত্তি থেকে নিজের পরিপূর্ণ যৌবনের অপূর্ব্ব সুন্দর দেহটা রক্ষা ক'রে জীবন চালানো যে কত কঠিন, কত বাধাবিঘ্নময়—তা' সে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে, তাই বাস্তব ক্ষেত্রে হ'য়েছে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, উদ্‌ভ্রান্ত। মেয়েটা তার জীবনের মস্ত বড় কাঁটা। যদি সে একা হতো, কোন বাধা যদি না থাকতো, তবে সে, শ্যামজীকে উচিত শিক্ষা দিয়ে হাসিমুখে মরণকে বরণ ক'রতে পারতো। মরণ তার পক্ষে অসম্ভব, তাকে বাঁচতে হবে, ক্ষতবিক্ষত দেহটাকে সংসারের নির্ম্মম অত্যাচারের বিপক্ষে দাঁড়া করিয়ে এগিয়ে চলতে হবে, পাষণ্ড দুর্ব্বৃত্ত পুরুষগুলির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা ক'রতে হবে!

এমনি মানসিক দ্বন্দ্ব নিয়ে গঙ্গাবতী পাগলিনীর মত ইতস্তত ঘুরছিল—হঠাৎ কিশোরীবাঈর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো।

কিশোরীবাঈ এখন আর রূপসী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যুবতী নয়। এ কয়েক বছরে জীর্ণা শীর্ণার মত প্রায় হ'য়ে গেছে। এখন মিলে বা রাস্তাঘাটে গতর খাটায় না; কুলিমজুর পাড়ায় ছোট একটা মুদী-দোকান ক'রে ব্যবসা করে। দোকানের সামান্য আয়ে তার একার খাওয়া-পরা বেশ স্বচ্ছন্দে চলে যায়। তার কোন ছেলেমেয়ে হয় নি, কোন আত্মীয়-স্বজনও নেই, ছিলও না কোনকালে। সংসারের বৈচিত্র্য-লীলায় যখন নেমে আসে তখন ছিল শুধু রূপকথার মায়াপুরী, সেই মায়াপুরীতে নীড় বেঁধে ছিল—সে আর তার স্বামী। তা'রা মদিরায় নেশায় ভরপুর হ'য়ে চলছিল, অদৃষ্ট এত বড় সৌভাগ্য সইতে পারলো না। স্বামী মিলে

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা রোজগার ক'রতো, উদ্দীপনায়, ঘরের মধুমিলনের কল্পনায় সব কিছু উপেক্ষা ক'রতো। টাকা-রোজগারের মানুষমারা পরিশ্রমকে হাসিমুখে বরণ ক'রতো—কারণ কষ্টার্জ্জিত অর্থ সে স্ত্রীর হাতে গুঁজে দিতো। কিশোরী প্রাণপণে স্বামীর সেবা ক'রতো, নিজের সত্তা উপেক্ষা ক'রে স্বামীর ক্লান্তি শ্রান্তি দূর ক'রতো। দু'জন দু'জনকে এতো ভালবাসতো যে, সাংসারিক দুঃখকষ্ট, বাধাবিপত্তি, অশান্তি কাকে বলে, উপলব্ধি ক'রতে পারতো না, ভাববার অবকাশ পেতো না। কিশোরীবাঈ অতি প্রত্যুষে উঠে ঘরদোর পরিষ্কার ক'রে ঠিক সময়মত স্বামীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতো, স্বামী হাতমুখ ধুয়ে ভেজা চানা বা পাকড়ী খেয়ে মিলে ছুটে যেতো; কিশোরী এটা-ওটা যোগাড় ক'রে বড় সাধে রান্না ক'রে বারোটার পূর্ব্বেই রোদ, বৃষ্টি অবহেলা ক'রে খাবার নিয়ে মিলে যেতো। নানা কথা বলে স্বামীকে খুব বেশি ক'রে খাওয়াতো, কোনদিন হয়তো তার খাবার কম পড়তো। কিশোরী যেদিন খাবার নিয়ে যেতে পারতো না—সেদিন তার স্বামীর খাওয়া মোটেই হতো না, কিশোরীরও কোন কিছু ভাল লাগতো না। কিশোরীর স্বামী মিল থেকে ফিরে কোথাও বের হতো না, ঘরের কোণে বসে কেবল প্রেমালাপ ক'রতো, পাড়াপড়সীর ঠাট্টা বিদ্রূপকে ওরা কখনও গ্রাহ্য ক'রতো না। এমনই সুখের মধ্যে, তৃপ্তির মধ্যে, প্রেমে আত্মভোলা হ'য়ে দু'জনের জীবন চলছিল, কোনদিন একটুর জন্যে একটু মন্দা পড়ে নি, হঠাৎ সুখের নীড়ে হলো বজ্রাঘাত। সেই যে সর্ব্বনেশে দুরদৃষ্টের সূত্রপাত হলো—চরমে না পৌঁছে থামলো না। তা'রা শ্যামজীর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে শ্রীরাম মিল ছেড়ে রাধাকিষণ মিলে চলে আসে। সুন্দরী যুবতীর সর্ব্বত্র বিপদ। প্রথম দর্শনেই কিশোরী বড়বাবুর কুপুত্রের লালসাময় মারাত্মক নজরে পড়ে যায়।

লোভে, প্রলোভনে কিশোরীবাঈ রাজি হয় নি, অতি তুচ্ছভাবে টাকাকড়ি জিনিষপত্তর প্রত্যাখ্যান ক'রেছিল, মুখের ওপর যা' তা' বকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, এমন কি ভয় দেখানো সত্বেও পাপ পথে, লোভের পথে যেতে রাজি হয় নি, দর্পভরে প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়েছিল। সামান্য একটা কুলি রমণীর দর্প, উপেক্ষা, অপমান বড়বাবুর ছেলে সইতে পারলেন না, পরিষদবর্গের পরামর্শে মরিয়া হ'য়ে প্রতিশোধ নেবার জন্তে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। মান, সম্মান ভুলে গুণ্ডা পাঠালেন কিশোরীকে ধরে আনতে। গুণ্ডারা স্বামীর বুক থেকে কিশোরীকে ছিনিয়ে নিতে পারে নি। পাঁচটি বলিষ্ঠ গুণ্ডা জখম হ'য়ে কোনভাবে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গিয়ে রক্ষা পেয়েছিল। তারপর একদিন নিঝুম নির্জ্জন নিকষ-আঁধার রজনীতে কিশোরীর স্বামীর বক্ষে নির্ম্মম, দুর্জ্জয় অস্ত্রাঘাত ক'রে প্রাণ বায়ু কেড়ে নিয়ে যায়! স্বামীর মরণ আর্ত্তনাদে কিশোরী জেগে দেখে সব শেষ, গুপ্তঘাতক নেই, অস্ত্র নেই, সাড়া শব্দ নেই, শুধু একটি মৃতদেহ, টগ্‌বগ্‌ ক'রে উথলিয়ে রক্তের ফোয়ারা বের হচ্ছে, ধীরে ধীরে সব থেমে যায়। নিশাচর পাখীও ডাকে না, কাদের যেন চাপা কান্না শতশত, সহস্রসহস্র স্পন্দনে গুমরিয়ে গুমরিয়ে বের হয়। ০ ০ ০

পুলিশ নরঘাতকের কোন সন্ধানই ক'রতে পারে নি, গরিব কুলিমজুরের রহস্যময় হত্যার কোন কুলকিনারা হয়নি, রহস্যময় হত্যা রহস্যের মধ্যেই সমাপ্ত হ'য়েছিল।

সকলে ভুলে যাক্, কিশোরী ভুলে নি, ভুলতে পারে না। তার চোখে মেয়েলী অবলা অশ্রু ঝরেনি, সে দুর্ব্বল, জড়, শিথিল হ'য়ে ধূলায় লুটায়নি, বিষাদের ছবি অবয়বে ধারণ ক'রে মুশড়ে পড়ে নি; গুলিবারুদ-ভরা কামানের মত চুপ ক'রে থেকেছিল; অভিসারের ছদ্মবেশ পরে স্বেচ্ছায় হাসিমুখে বিলাসকুঞ্জে ঢুকেছিল।

তারপর মহাসুযোগে চরিত্রহীন, মাতাল, পাষণ্ড নরঘাতক কুপুত্রের বক্ষখানা ছুরিকা দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নেয়। মাতাল যখন উত্তেজিত হ'য়ে কিশোরীকে জড়িয়ে ধরেছিল, কিশোরী যৌবনোত্তেজনায় ক্ষিপ্ত হয় নি, স্বামীকে হারিয়ে বিলাসকুঞ্জের মাতাল নেশায় ভুলে নি, শাঁ ক'রে ছুরিকা বক্ষে বিদ্ধ ক'রে দিয়েছিল। একটুকুও টলেনি, একটুকুও দ্বিধাবোধ করে নি, একটকুও দুর্ব্বল হয়নি—পলকে ছুরিকার আঘাত ক'রেছিল; মৃত্যুমুখী মাতাল একফোঁটা জল চেয়েছিল—কিশোরী ছুরিকা বিদ্ধ ক'রে চাহিদা পূরণ ক'রেছিল।

সেদিনের পর কিশোরীকে আর কেউ আহম্মদাবাদ শহরে দেখেনি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে বম্বে চলে আসে। ভাবে—অবশিষ্ট জীবনে এই প্রার্থনা ক'রবে যাতে পরজন্মে স্বামীকে কখনও না হারাতে হয়।

কিশোরীবাঈ গঙ্গাবতীর দুরবস্থা, দুর্দ্দশা, অত্যাচারের কাহিনী শুনে সাদরে নিজ গৃহে এনে আশ্রয় দেয়। দু'জন একই ধারার নারী বলে, মনের বিবেকের সাদৃশ্য হেতু কয়েকদিনের মধ্যে একজন অপরের আপনার লোক হ'য়ে উঠলো। দু'জনেই নারীত্ব উঁচু ক'রে চলে, প্রাণান্তেও নিচু ক'রতে চায় না, সতীত্বে, অপমানে দুর্দ্ধর্ষ হয়—তাই দু'জনের এত মিল, এত ভালবাসা। কিশোরী গঙ্গাবতীকে সহোদরা ছোট বোনের মত ভালবাসে, গঙ্গাবতীও কিশোরীকে দিদির ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করে, বন্ধুর মত ভালবাসে। কিশোরী চারদিকে খোঁজখবর নিয়ে গঙ্গাবতীকে একটি ভাল বাড়িতে আয়ার কাজে ঢুকিয়ে দিলে, নিজে বাড়ির ওপর ছোট দোকানখানা দেখাশোনা করে, সংসারের সমস্ত কাজ-কর্ম্ম করে, গঙ্গাবতীর মেয়েকে লালনপালন করে। এদের নতুন সংসারটা চলতে লাগলো বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে। এদের যেন নেই অতীত, আছে শুধু ভবিষ্যৎ। দু'জনে গতর খাটায়; মিলিত রোজগারে সংসার চালায়,

ছু'জনে মিলে কল্পনা আঁটে যে ক্রমে দোকানখানা বড় ক'রবে, গঙ্গাবতী তখন আর বাইরে কাজ ক'রতে যাবে না, টাকা জমাবে—হিসাব মত খরচ ক'রে যাতে মেয়েকে খুব ভাল ঘরে বিয়ে দিতে পারে। মেয়ের বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই আনবে, জামাই দোকান চালাবে, ছু' শাশুড়ী মিলে সংসার দেখবে; নাতি-নাতনী নিয়ে সুখে দিনযাপন ক'রবে।···এদের ভালবাসার সন্ধিস্থলে মাত্র একটি শিশু, তাই মেয়েকে নিয়ে প্রীতির ভাগাভাগি, শিশুর সুন্দর দেহ বক্ষে জড়াবার জন্যে হয় কাড়াকাড়ি। একটিমাত্র কুঁড়ি ছু'টি কোমল পাতার মাঝে আছে আত্মগোপন করে'। দূর থেকে বোঝা যায় না। কার সঙ্গে বেশি জড়িত হ'য়ে আছে—কুঁড়িখানা নিজেও বুঝতে পারে না সে কোনদিকে একটু হেলে আছে, কোনদিকে তার মন চায় হেলে পড়তে! পাতার সঙ্গে এমনভাবে জড়িত হ'য়ে পড়েছে, এমন সম্পর্কে বাঁধা পড়েছে যে একটি পাতা বাতাসে সরে গেলে কীট এসে অকালে ধ্বংস ক'রবে। এমনভাবে সুখে, স্বচ্ছন্দে, শান্তিতে চার পাঁচ মাস কাটলো, ভুলে এলো অতীতের বিভীষিকা—এমনই সময় হঠাৎ ধেয়ে এলো জোয়ারের মত অশান্তি, জ্বালা, দুর্দ্দশা। নদীতে জোয়ার আসাই যে স্বাভাবিক।

কানাই জেলখানায় বড় কষ্টে ছিল, জেলখানা থেকে বেরিয়ে দেখে গঙ্গাবতী নেই, বন্ধুদের বাড়িতে আশ্রয় চাইলে—কেউ আশ্রয় দিলে না। সারাদিন সারা রাত্রি পথে ঘাটে অভুক্ত অবস্থায় কাটিয়ে পরদিন গঙ্গাবতীর খোঁজ পেলে। গঙ্গাবতীর অবস্থা দেখে জিব দিয়ে জল পড়তে লাগলো, টাকার স্বচ্ছলতা দেখে মাথায় দুষ্টুমী বুদ্ধি ভাল ক'রেই খেললো! তোলা ভাতে সর্দ্দারী ক'রবার জন্যে দুষ্টুমী বুদ্ধির পথ খোলা ক'রবার জন্যে ভালমানুষ সেজে কিশোরীবাঈর দোরে ধর্ণা দিয়ে পড়লো। কিশোরী-বাঈ কানাই'র চেহারা দেখেই বুঝতে পারলে যে সে, যে সে মানুষ নয়;

তাই খাল কেটে কুমীর আনতে চাইলে না। গঙ্গাবতী আবার ভুল বুঝলে, কানাই'র মিষ্টি কথায় ভুলে গিয়ে স্বামীর স্থান ভিক্ষা চেয়ে আদায় ক'রলে—সে যে সতী!

কানাই গতর খেটে রোজগার করে, মজুরীর সব টাকা-পয়সা কিশোরীর হাতে দেয়। মাঝে মাঝে কিশোরীকে দোকানের বিষয়ে উপদেশ দেয়, নিতান্ত ভালমানুষের মত বলে যে, গঙ্গাবতীর পোয়াতী অবস্থায় এখন আর কাজকর্ম্ম করা উচিত নয়। কিশোরী কানাইর কথাবার্ত্তায়, চালচলনে ধীরে ধীরে কানাইকে বিশ্বাস ক'রতে লাগলো এবং মাসখানেক পরীক্ষা ক'রে কানাই'র হাতে দোকানের ভার দিলে। কানাই যদি গঙ্গাবতীর স্বামী না হতো তবে কিশোরী কিছুতেই দোকানের ভার তার হাতে দিতো না। যাক্ কিশোরীর সতর্ক দৃষ্টিতে বসে চালাকচতুর কানাই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে দোকানের অবস্থা খুব ভাল ক'রে দিলে। কিশোরী দোকানের এত ভাল উন্নতি দেখে গঙ্গাবতীকে কাজ থেকে নিয়ে এলো এবং কানাই'র ওপর দোকানের সকল ভার দিয়ে দিলো। মাত্র দু'টি মাস গিয়েছে এর মধ্যে দোকান দেউলে হ'য়ে পড়লো, চারিদিক থেকে ধার শোধ ক'রবার কড়া তাগিদ এলো। কিশোরীবাঈ এত বড় নিমকহারামী, হটকারিতা সহ্য ক'রতে পারলে না, ঝাঁটা মেরে মাতাল কানাইকে দূর ক'রে দিলো।

কানাই গঙ্গাবতীর জীবনে মস্ত বড় দুষ্টগ্রহ। কানাই অপমানিত হ'য়ে, নিঃস্ব হ'য়ে হাড়ে হাড়ে চটে গেলো, কিন্তু নিরুপায়—তাই চারদিকে অকথ্য দুর্নাম রটাতে লাগলো কিশোরী ও গঙ্গাবতীর নামে। কানাই কিশোরীকে খুব ভয় পায়—তাই ওৎ পেতে থাকে, গঙ্গাবতীকে একা পেলেই জোর জবরদস্তি ক'রে টাকা-পয়সা কেড়ে নিয়ে যায়। চিরদিন অত্যাচার করা যায় না, গঙ্গাবতী দৃঢ় হ'য়ে দাঁড়ালো, কিশোরীবাঈ সতর্ক

দৃষ্টিতে পাহারা দিতে লাগলো। কানাই বজ্জাতের চূড়ান্ত, অতি ধূর্ত্ত; যখন দেখলে জোর ছলনা ক'রে সুবিধা ক'রতে পারছে না তখন অন্য পথ ধরলে। —

কিশোরী মেয়েকে কোলে নিয়ে একটা জিনিষ কিনবার জন্যে বের হ'য়ে গেছে, গঙ্গাবতী দোকানে বসে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে আলাপ-সালাপ ক'রছে—এমন সময় কানাই এসে পাণ্ডুর মুখখানা তুলে বল্‌লে—'কাল থেকে খাই নি!'

স্বামীর ক্লিষ্ট করুণ মুখ থেকে ভিক্ষা চাওয়ার কথাগুলি যেন গঙ্গাবতীর প্রাণে হুল ফুটালে। গঙ্গাবতীর করুণ, প্রেমময় চোখের কোণ দিয়ে দু'তিনটে বিষাদ অশ্রুফোঁটা অজ্ঞাতে ঝরে পড়লো। গঙ্গাবতী কিশোরীর নিষেধ সত্ত্বেও চুপি চুপি খাবার দিলে খেতে, চুপি চুপি পালিয়ে যেতে উপদেশ দিয়ে, অনুরোধ ক'রে দোকানে এসে বসলো। কানাই পেট ভরে খেয়ে, বেশ তাজা হ'য়ে গঙ্গাবতীর নিকট গম্ভীরভাবে এসে আদেশের স্বরে টাকা চাইলে। গঙ্গাবতী টাকার কথায় কোন ভ্রুক্ষেপ না ক'রে সঙ্গীদের সঙ্গে কথা কইতে লাগলো।

কানাই চটে উঠে রুক্ষ স্বরে বল্‌লে—'বড় যে গ্রাহ্যি হচ্ছে না!'

'ভালয় ভালয় সরে পড়, এক্ষুণি দিদি আসবে!'

'দিদি-ফিদি বাবা বহু দেখেছি, এখন টাকা দাও বের ক'রে—নইলে এক থাপ্‌পড়ে'—

'যাবে কি-না বলো! লজ্জা করে না টাকা চাইতে, মরণ ভাল—।'

গঙ্গাবতী নিজের কথায় নিজেই চম্‌কে উঠলো।

'মরণ! মরলেই ত' ভাল ক'রে রোজগারের সুবিধে হয়! টাকা দিবি কি-না বল্ নইলে সব্বাইর নিকট দু'জনের কীর্ত্তি কলাপ বলে দেবো।'

'বের হও বাড়ি থেকে, বের হ' বলচি !'

'কেন বের হ'বরে হারামজাদি ! আমার সঙ্গে বদমাইসী, অতদিন কাউকে বলিনি, টাকা না দিলে সব্বাইকে বলে দেবো তোর কেলেঙ্কারীর কথা ! তুই কি ক'রে পোয়াতী হ'লি, আমি তো জেলে ছিলাম—'

'খবরদার !' গঙ্গাবতীর মুখ দিয়ে আর কোন কথা বের হলো না ; রাগে, দুঃখে, অপমানে, মিথ্যে দুর্নামে শরীর কাঁপতে লাগলো, চোখ দু'টি থেকে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হ'তে লাগলো। পাড়াপড়সীরা কোন বাধা দিলে না, কোন কথা বললে না, চোখ ঠারাঠারি ক'রে খুব আমোদ উপভোগ ক'রতে লাগলো। এরা চায়—ভাল ক'রে অশ্লীল কথার বর্ণনা শুনতে, মারাত্মক ঝগড়াঝাটি দেখতে।

কানাই বল্‌লে—'এতদিন যে রোজগার ক'রেচিস্, শিগ্‌গীর ভাগ দে !'

'বের হ'—বের হ' ! হারামজাদা, নচ্ছার ব্যাটা ! ঝাঁটা মেরে দাঁত ভেঙ্গে দেবো !'

কিশোরী ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলো। কানাই বেগতিক দেখে চট ক'রে সরে পড়লো।

কানাই পালালো, পাড়ার মেয়েছেলেরা মুচকি হেসে জটলা ক'রে কুৎসা রটাবার জন্যে একে একে সরে পড়লো। কিন্তু গঙ্গাবতীর মনের ঝড়োদোলা শান্ত হলো না, একটু মৃদু হলো না। কিশোরী কানাই'র কথায় কোন ভ্রুক্ষেপই ক'রলে না, পাগলের, মাতালের কথা বলে একটু পরেই ভুলে গেলো। কিন্তু গঙ্গাবতী প্রলাপ বলে', স্বপনের ঘোর বলে', সহজে ভুলে যেতে পারলে না। সে জানে, বুঝে, কিশোরীর মতই সে যুক্তিতর্কে মানে যে মিথ্যা কথার গভীরতা নেই, চিরদিন তার হলকোটা

ক্ষতচিহ্ন থাকে না। তবু সে মিথ্যাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারলে না, সে যে জননী, তার গর্ভে যে সন্তান!

কিশোরী যত বুঝায়, যত প্রবোধ দেয়, কানাই'র কথা মূল্যহীন বলে উড়িয়ে দেয়—গঙ্গাবতী ততই আরও অধীর হয়, মন তার বলে আত্ম-হত্যা ক'রে নিষ্কৃতি নিতে। কত দুঃখে বলে—'না—না—দিদি আর বাধা দিয়ো না। তুমি আমার অবস্থা বেশ বুঝতে পারচো, তোমার মনও চায় আমার মৃত্যু—তবে কেন মনকে ফাঁকি দেবে? তুমি বেশ বুঝতে পারো যে আমার মৃত্যু ছাড়া অন্য গতি নেই। এতদিন মেয়ের জন্যে মরতে পারি নি, এখন তোমার কোলে দিয়ে নিশ্চিন্ত—আর কেন বেঁচে থাকা!'

কিশোরী শাসন ক'রে বলে—'পোড়ামুখী এখন আমায় জ্বালাবার যোগাড় ক'রছো! ফের যদি অমন সর্ব্বনেশে কথা বলবি ত' পালাবো; আর আমার মুখও দেখতে পাবি নে। রইবে পড়ে তোর মেয়ে।'

'না-না! তুমি যেয়ো না! তবে যে আমার মরা হবে না, মরেও যে শান্তি পাবো না। আমায় মরতে দাও, নইলে প্রায়শ্চিত্তি হবে কি করে'? প্রায়শ্চিত্তিতে যে মেয়ের মঙ্গল হবে।'

গঙ্গাবতীর চোখের কোণ বেয়ে বড় বড় অশ্রু ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে। কিশোরী আর বোঝাতে পারে না, সান্ত্বনা দেবার ভাষা হারিয়ে ফেলে। রোগা মেয়ের দেহে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে।

আনন্দে আর ধরে না। ছেলের মুখ দেখে আহ্লাদে আত্মহারা। বস্তির বাড়িতে বাড়িতে বাতাসা বিলালো, জনে জনে ছেলের প্রশংসা ক'রে বেড়াতে লাগলো। ছু'দিনে ছেলের হাত, কোমর, গলা মন্ত্রপূত শিকড়তাবিজে ভরে গেলো; তার ওপর সাধু ফকিরের মন্ত্র, পূজাপার্ব্বণ নিত্যই হচ্ছে।

কিশোরী নিজের খাওয়া পরা ভুলে গেলো; ঘুরে ফিরে কেবল ছেলেকে কোলে নেয়, চুমো খায়, আর পঞ্চমুখে রূপ বর্ণনা করে।

গঙ্গাবতী ছেলের চেহারা দেখে ভীতস্বরে বলে—চেহারাখানা ঠিক বাপের মত পেয়েছে দিদি! ভগবান জানেন স্বভাবখানা কি রকম হয়, কতজনের জীবন ব্যর্থ ক'রে দেয়!'

কিশোরী শাসনের স্বরে বলে—অমন সুন্দর ছেলে বহু পুণ্যের জোরে মেলে। কেমন লাল টুকটুকে ছেলে! অমন সুন্দর ছেলে কি ভাল না হ'য়ে পারে?

'বাপের মত চেহারা, বাপের স্বভাবই পাবে দিদি!' দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।

'ষাট্ ষাট্! কি আক্কেলে শত্তুরের মত মা হ'য়ে খালি খালি অভিশাপ দিচ্ছিস্? বাপের চেহারা পেলেই কি বাপের মত স্বভাব পায়? মার রঙ্ চোখ পেলো, মার গুণ পাবে না কেন শুনি? অমন শত্তুরের মত কথা বলে ছেলের আমার অমঙ্গল ডেকে এনো না বলে দিচ্ছি।' কিশোরী নবজাত শিশুর মাথায় পায়ের ধূলি দেয়।

* * * * * * * * * *

গঙ্গাবতীর মেয়ের খুব অসুখ। কিশোরী ওষুধ আনতে ডাক্তারখানায় গিয়েছে। গঙ্গাবতী নবজাত শিশুকে বুকের ছুধ খাওয়াচ্ছে, মেয়ে অপর কোণে অত্যধিক দুর্ব্বলতাবশতঃ অঘোরে ঘুমোচ্ছে। জীর্ণা, শীর্ণা, মাথায় প্রায় চুল নেই, চোখ কোটরগত, দেহে মাংস আছে কি-না

বোঝা যাচ্ছে না, লাল রক্তের পরিবর্ত্তে আকাশী রঙের জল। হাড়ক'টি বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে, রবারের মত পাতলা চামড়া দিয়ে যেন ধরে রাখা হ'য়েছে, ছিঁড়ে যাবার মত অবস্থা। গঙ্গাবতী শুয়ে শুয়ে ভাবছে—কি উপায় হবে মেয়ের, অতো রোগা মেয়ের এত জ্বর, এ যাত্রায় কি রক্ষা পাবে? কেউ তার থাকবে না! একটি একটি ক'রে তিনটি সন্তান চলে গেলো অভিমানে, আর একটি যাবার পথে। স্বামী থেকেও নেই, সুখ নেই, শান্তি নেই, স্বস্তি নেই···হঠাৎ পথহারা নির্জ্জন বিভীষিকাময় গহন অরণ্যে ভয়ঙ্কর দৈববিপাকে প্রেতের মত কানাই দোরে এসে একটা অট্টহাসি দিয়ে দাঁড়ালো। ক্ষুদ্র কুঁড়েখানা যেন থর্‌থর্‌ ক'রে কেঁপে উঠলো; ঘরের তিনটি প্রাণী শিউরে উঠলো!

'দিব্যি ছেলে হ'য়েছে, বাচ্চা শ্যামজীর চেহারাখানাই পেয়েছে দেখচি!'

গঙ্গাবতী ভীতস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—'বের হ'। বের হ' আমার বাড়ি থেকে।'

'বের হবো বলেই এসেচি, থাকতে আসি নি। গোটা কয়েক টাকা ফেলে দাও দেখি ভালমানুষের মত। চুপটি ক'রে চলে যাই। দিব্যি ছেলে হ'য়েছে, শ্যামজী পুরস্কার দেবে মাইরি!'

'বের হ'! একপয়সা পাবিনে, দূর হ' এক্ষুণি।'

'বাবা! অত বোকা পাওনি সুন্দরী! টাকা না দিলে মেয়েকে এক থাপ্‌পড়ে সাবাড় ক'রবো।'

'সত্যি বলচি, মাইরি বলছি, আমার কাছে একটি পয়সাও নেই।'

'ওসব ফাঁকি চলছে না চাঁদ; দিবি ত' দে, নইলে—'

'তোর পায় পড়ি। পিতা হ'য়ে অতবড় সর্ব্বনাশ করিস নে।'

টাকার নিকট পিতাপুত্র নেই, স্ত্রী নেই, কন্যা নেই। টাকার জন্যে

আমি সব কিছু ক'রতে পারি। পরের কথা ত' দূরের—নিজের স্ত্রী, মেয়েকে যে বেশ্যা ক'রতে পারি তার আর প্রমাণ না দিলেও চলে—নিজের হাতে খুন ক'রতে পারি, অতএব বিবিচাঁদ যদি বাঁচবার ইচ্ছে থাকে তবে টাকা ফেলে দাও। আমার স্বভাব ত' জানই, কিছু অসম্ভব নেই।'

কানাই অসুরের মত মেয়ের নিকট গিয়ে দাঁড়ালো।

গঙ্গাবতী ব্যস্তভাবে শিশুকে সরিয়ে রেখে বল্‌লে—'আর একদিন আসিস্‌। ওরে দস্যু সর্ব্বনাশ করিস নে, আর একদিন আসিস্‌, টাকা নিশ্চয় দেবো।'

'এই ত' পথে আসচিস্‌ বাবা। শ্যামজীর নিকট থেকে যে মুঠোমুঠো টাকা পেয়েচিস্‌, তার কিছু ভাগ দে। আজ আর কোন কথা মানছি নে বাবা।'

'বিশ্বাস কর্‌, সত্যই আমি টাকা আনি নি, আমি এখনো পর্য্যন্ত সতী, ওরে নিষ্ঠুর বিশ্বাস কর্‌!'

'শুধু কথায় চিড়ে ভিজে না! আমি অত বোকা নই যে সুন্দরীর কথায় বিশ্বাস ক'রবো! ভাল চাস তো দে, নইলে—'

কানাই সত্য সত্যই মেয়ের গলা চেপে ধরলো। অচেতন প্রায় দুর্ব্বল মেয়ে একটা বিশ্রী শব্দ ক'রে ছটফট ক'রে উঠলো। গঙ্গাবতী পাগলিনীর মত ছুটে এলো মেয়েকে ছিনিয়ে নিতে, পারলে না, মেয়ে ঝাপটা-ঝাপটিতে আরও বেশি গোঙায়। গঙ্গাবতী স্বামীর পদতলে লুটিয়ে পড়লে। অসহায়, দুর্ব্বল—ছিন্নলতা ধরণীর ওপর লোটায়, পদদলিত হ'য়ে কালগর্ভে মিলায়। উন্মত্ত তুফানে আশ্রয়চ্যুত হ'য়ে চারদিকে আশ্রয় ভিক্ষা করে করুণসুরে, মর্ম্মবেদনা পাষাণভেদে; আঘাতের পর আঘাত পায়, দলিত হ'য়ে আবার দলিত হয়, ভাঙ্গা দেহ আবার ভাঙ্গে, ত্রাণ কি

পায়? পায় না, পায় না, পায় না; হায় অসহায়, হায় রে দুর্ব্বল! অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায় ঘা খেতে খেতে একটি করুণ সুর বের হলো 'ওগো! বিশ্বাস করো আমি অসতী নই, আমি টাকা আনি নি। আমার কাছে এক কপর্দ্দকও নেই। কিশোরী এলে চেয়ে রাখবো, চুরি ক'রবো, দেবো তোমায়, দেবো, সত্যি দেবো। যদি না দিই তবে অন্য দিন এসে আমায় খুন ক'রে ফেলো।'

মেয়ে অসুরের মত ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে কখনো চেঁচিয়ে উঠে, কখনো চোখ টাটিয়ে ভীত নয়নে তাকায়, কাঁপে, আশ্রয় চায়, কখনো সিংহনাদে আঁৎকে উঠে। 'আবার চালাকি! এখনো দে বজ্জাত মাগি! মাগীর বদমাইসী এখনও কমে নি, এবার দেখাচ্ছি বাছাধন!' কানাই মেয়ের গলা চেপে ধরলো। মেয়ে যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে উঠলো। গঙ্গাবতী শিউরে উঠলো, শিশু স্বপনঘোরে মুহুর্মুহুঃ কেঁপে উঠতে লাগলো। কানাই অটল, অচল, পাহাড়ের মত নির্ভীক, বীর, বলীয়ান, স্পর্দ্ধিত, দুর্দ্ধর্ষ। মেয়ে আর চেঁচাতে পারলে না, শুধু গোঁ গোঁ ক'রে গোঙাতে লাগলো। বলি দেওয়া পাঠার মত হাত পা ছুঁড়তে লাগলো।

'তবে রে দস্যু!' গঙ্গাবতী বিদ্যুৎবেগে হিংস্র বাঘিনীর মত কানাই'র ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কানাই এক ধাক্কায় গঙ্গাবতীকে মেঝেতে ফেলে দিয়ে পদদলিত ক'রলো। জননী! বুক ফেটে গেছে, পরতে পরতে রক্তস্রোত প্রবল বন্যার মত উদ্বেলিত হ'য়ে উতলিয়ে পড়তে লাগলো। নয়নে দৃষ্টিশক্তি নেই, বিভীষিকা—ভয়াবহ নরক-চিত্র। মুখে শুধু জড়িত ভাষা মূর্চ্ছে মূর্চ্ছে অনন্তে মিলাচ্ছে 'বাচাও! কে আছো বাঁচাও দস্যুর হাত থেকে। ওগো বাঁচাও—বাঁচাও—বাঁ—চা—ও।'

কানাই নিজের শিশু মেয়েকে জননীর ক্রোড়ে আছড়িয়ে ফেললে। মেয়ের চোখ ঠিক্‌রে বের হ'য়ে গেছে, বুকের ধুকুধুকানিও বন্ধ হ'য়ে

গেছে। সব শেষ। নেই ক্রন্দন, নেই আশা আকাঙ্ক্ষা, নেই কিছু—খানিক পূর্ব্বেও ত' কত ছিল ?

গঙ্গাবতীর উঠবার শক্তি নেই, বাধা দেবার আর ক্ষমতা নেই, গলায় ভাষা নেই। শুধু শিথিল হাতে মেয়ের মৃতদেহ আগ্নেয়গিরিরূপ পাষাণ বক্ষে চেপে ধরলো। একটা বিশ্রী, ভয়াবহ, ভয়ঙ্কর হাহাকার ঘড় ঘড় ক'রে গঙ্গাবতীর গলা থেকে বের হলো—ও! মা-গো—

গঙ্গাবতী অজ্ঞান হ'য়ে পড়লো।···কানাই স্ত্রী ও মেয়ের কাছ থেকে সচকিতে সরে এসে একবার তাদের মুখপানে ভাল ক'রে তাকালে; তারপর হাততালি দিয়ে পিশাচের মত অট্টহাসি দিয়ে টলতে টলতে বের হ'য়ে গেলো।

— সতেরো —

কিশোরীবাঈ'র অবস্থা হলো মেঘনা নদীর পাড়ের মত, নীচে ক্ষয় হ'য়ে গেছে—ওপর থেকে বোঝা যায় না ; পাড়খানা শ্যামল ঘাসে ঢাকা, লতাপাতা, ডালশাখা কত কি থাকে, পাড় পাড়ের মতই, কিন্তু ঢেউয়ের ধাক্কায় ধাক্কায় হয় ভিত্তিহীন, হঠাৎ এক সময় সামান্য আঘাতে ধ্বসে পড়ে। মেঘনা নদীর পাড়ের মতই কিশোরীবাঈ ভীত্তিশূন্য হ'য়ে পড়েছে, ওপর থেকে বোঝা যায় না। কিশোরীর ওপর দিয়ে কত ছোট বড় বিপত্তি চলে গেছে, কোন দিন একেবারে এলে পড়ে নি, স্বামীর মৃত্যুতেও বুঝি এত বড় শোক পায় নি, এত বড় আঘাত প্যায় নি! স্বামীর মৃত্যুতে সে সান্ত্বনা রেখেছিল প্রতিশোধ নেবে বলে, কিন্তু এখানে সে কি ক'রে সান্ত্বনা নেবে, কি ক'রে মনকে প্রবোধ দেবে? গঙ্গাবতীকে নিজের বোনের মতো ভালবাসে, গঙ্গাবতীর মেয়েকে নিজের পেটের সন্তানের চেয়ে বেশি ভালবাসতো, কার ওপর প্রতিশোধ নেবে, কাকে দোষারোপ ক'রবে? সেদিন কানাইকে পেলে হয়তো খুন ক'রে ফেলতো, কিন্তু যে গেছে—যে সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—তার কি কোন উপায় হবে! সে আসবে না, কোন ক্ষতি পূরণ হবে না। যৌবনের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিতে কি আর সান্ত্বনা মিলে—সে বয়সও নেই, মনও নেই।

কিশোরীবাঈ ধীর, স্থির, গম্ভীর। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, ভেতর পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে। গঙ্গাবতীর বাহির ভেতর দুই সমান।

এক মুহূর্ত্ত স্বস্তি পায় না, এক মুহূর্ত্ত নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে পারে না, ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে। কে তাকে সান্ত্বনা দিতে পারে? সান্ত্বনা দেবার কি কোন ভাষা আছে? কিশোরীবাঈ পালিয়ে পালিয়ে চলে, সর্ব্বদা এড়িয়ে চলে, গঙ্গাবতীর সুমুখে পড়লে হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হ'বার উপক্রম হয়। কেউ কারো সামনে যায় না, পরস্পর পরস্পরকে এড়িয়ে চলে। গঙ্গাবতী সর্ব্বদা কাঁদে, দুর্ব্বলতায় মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে, কিশোরীবাঈ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে, এক একটা নিঃশ্বাসে যেন এক এক বছরের আয়ু শেষ হ'য়ে যায়। কিশোরীবাঈ রাঁধেবাড়ে, গঙ্গাবতীকে খাওয়ায়, খেতে চায় না, খেতে পারে না, জোর ক'রে যা' পারে তা' খাওয়ায়; নবজাত শিশুকে দুধ খাওয়ায়, নিজে প্রায়ই উপোষ করে, খাবার মুখে তুলতে পারে না—হাত পা' শিথিল হ'য়ে যায়, গা বমি বমি করে, অস্বস্তি বোধ করে। কত দুঃখের সংসারে আলোর আলেয়া জ্বালিয়েছিল, সবই নিভে গেলো!

গঙ্গাবতী কঠিন রোগে আক্রান্ত হলো। জীবন-মরণ সমস্যা—যে কোনও মুহূর্ত্তে হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হ'য়ে মারা যেতে পারে। কিশোরীবাঈ খাওয়া দাওয়া এক মত ভুলে গিয়েছিল, এবার ভুলেই গেলো। প্রাণপাত ক'রে রোগিনীর সেবা-শুশ্রূষা ক'রতে লাগলো। চিকিৎসার জন্যে প্রথম সমস্ত জিনিষপত্র বেচতে, বন্ধক দিতে লাগলো; অল্প জিনিষ দু'দিনেই ফুরিয়ে গেলো। বাঁচাতে হবে, যেমন ক'রে হোক বাঁচাতে হবে, অর্দ্ধপ্রবেশ মৃত্যুর ভয়ঙ্কর মুখ থেকে টেনে আনতে হবে। শেষ সম্বল দোকানখানা —তাও বিক্রয় ক'রলো। শেষ কপর্দ্দকখানি খরচ ক'রে বাঁচাবে, তারপর যদি ভিক্ষে ক'রতে হয়, তবে তাই ক'রবে। গঙ্গাবতী ওষুধ খাবে না, ডাক্তারকে পরীক্ষা ক'রতে দেবে না, সে মরবে, ভেবেছিল আত্মহত্যা ক'রে মরবে, কষ্ট ক'রে সাহস যোগাতে হ'লো না; কাল স্বেচ্ছায় এতদিন পরে অনুগ্রহ ক'রে এলো। যমরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'রে নিজের মহা

সর্ব্বনাশ ক'রবে না, অমন সুযোগ কি সে কখনো আর পাবে? এ পর্য্যন্ত কোন দিন পায় নি, আর কখনো পাবে না। এত বড় মিথ্যা কথার কিশোরী প্রতিবাদ করে না। সে জানে যে গঙ্গাবতী দুর্ব্বলতাবশতঃ মরতে চাইলেও, কখনো মরতে পারতো না—অপত্য-স্নেহের শিকল তাকে বেঁধে রাখতো, মুখে মরণ চাইলেও প্রাণে প্রাণে মরণ কখনো চায় নি, এখনো সে মনে প্রাণে মরণ চায় না।

কিশোরী চট্‌ ক'রে উত্তেজিত গঙ্গাবতীর কোলে ছোট শিশুটিকে রেখে সরে যায়, বিদ্রোহী মন শান্ত হয়; গঙ্গাবতী আবেশে ঢক্‌ ঢক্‌ ক'রে ওষুধ-পথ্য খায়, বাঁচবার চেষ্টা করে, বাঁচতে চায়। অদ্ভুত নারী, অদ্ভুত তার মন, অদ্ভুত তার প্রাণ, আরও অদ্ভুত তার মাতৃত্ব!

গঙ্গাবতী ধীরে ধীরে সেরে উঠলো, সম্পূর্ণ না সারলেও আর কোন ভয় নেই। অত বড় কঠিন আঘাত ও অসুখের পর শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, শক্তি সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছে, যৌবন এক ধাক্কায় প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেচে, ধীরে ধীরে সংসারে নামলে, চলন্ত পৃথিবীতে তার গতি পেছনে না সম্মুখে—সে বুঝতে পারে না, সে সম্মুখেই চলে, কিন্তু পৃথিবী পেছনে ঘুরছে না সম্মুখে ঘুরছে তা' জানে না, হয়ত' গঙ্গাবতী একই স্থানে আছে, হয়ত' অতি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, হয়ত' বা পেছনে যাচ্ছে, সে ত' জানে না—বুঝতেও পারে না, শুধু ছেলেকে যক্ষের ধনের মত আঁকড়ে ধরে এগিয়ে চলে।

গঙ্গাবতী মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলো। আর কিশোরীবাঈ মেঘনা নদীর ভিত্তিহীন পাড়ের মত হঠাৎ ধ্বসে পড়লো। দূরে থেকে কেউ বুঝতে পারে নি, কেউ আঁচ ক'রতে পারে নি—যে তার সময় ফুরিয়ে এসেছে; জীবন-প্রদীপের তেল বহুদিন হ'তে ফুরিয়ে গিয়েছিল, তেলহীন সলতে উস্কে কোনভাবে জ্বালিয়ে রেখেছিল,

আর যে তেলহীন প্রদীপে সল্‌তে নেই, মস্তক, বক্ষ পুড়ে গোড়াতে এসে নিবু নিবু ক'রছে, আর যে সল্‌তে নেই—কি দেবে, কি ক'রে ক্ষণিকের তরে জ্বালিয়ে রাখবে? সে যে প্রদীপ! নিজের জন্যে জ্বলে নি, অন্যের জন্যে নিজের বক্ষে সল্‌তে জ্বালিয়ে রেখেছিল!

গঙ্গাবতী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়লো, বিমর্ষ হলো, ভীত হলো, ভীষণভাবে দমে গেলো। এক পয়সার সঙ্গতি নেই, কি উপায়ে কিশোরীকে বাঁচাবে ভেবে কোন কূলকিনারা পেলে না। করুণমুখে কিশোরীর নিকট টাকা চায়, মিনতি করে, অভিমান করে, ঝগড়া করে।

কিশোরী মৃদু হেসে বলে—'টাকা দিয়ে কি হবে? ঘরে যা খাবার আছে তাতে বহুদিন বেশ চলবে। রাক্ষসের মত খেলেও এক মাসে আটা শেষ হবে না।'

'সে ত' বুঝলাম। কোথায় টাকা রেখেছিস লুকিয়ে? ওষুধ কিনতে হবে না? দে লক্ষ্মীটি! টাকা না পেলে আর ডাক্তার আসবে না।'

'না আসে না আসুক! বুড়ী হ'য়েছি, এখন সুখে মরতে দে। ডাক্তার এনে কোন লাভ নেই, মিছিমিছি টাকার শ্রাদ্ধ।'

'টাকা থাকলে দে, নইলে চল্‌লাম গতর খাটাতে।'

'পাগলামি করিস নে! কোন লোকের মাথা অত খারাপ হয়নি যে তোর মত রোগিণীকে কাজ দেবে।'

'গতর খাটাতে না পারি, ভিক্ষে ক'রবো, তবু তোকে বাঁচাবো।'

'মরণ বাঁচন যেন তোর হাতে, না? যার সময় ফুরিয়ে গেছে, তাকে কি ধরে রাখা যায়, না রাখবার চেষ্টা করা ভাল দিদি! ওপরে যে, সে বসে আছে, আর কত কাল তাকে বঞ্চিত ক'রে রাখবো?'

একটা মর্ম্মবেদনা হিংসার ছায়া পেয়ে গঙ্গাবতীর বক্ষে নির্ম্মম ঘা মারলো। গঙ্গাবতী অব্যক্ত ব্যথায় চুপ ক'রে থাকে।

কিশোরী বলে চলে 'তুই ভিক্ষে ক'রতে যাবি, তোর ছেলে দেখবে কে? তোর ছেলেকে রক্ষা ক'রবে কে—ঐ দস্যুর করাল খুনী-প্রবৃত্তি থেকে?'

'আমি ওকে কোলে ক'রে ভিক্ষে ক'রতে বের হবো।'

'পাগলী দিদির যা মোটা বুদ্ধি! ভিক্ষেয় কি নগদ পয়সা মেলে? যা' তিন চার পয়সা হয় তা'তে কি ডাক্তার দেখানো চলবে কখনও?'

'যত দিনেই হোক তবু ডাক্তার আনবো।'

'অত দিন বাঁচলে তো! কচি খোকাকে নিয়ে রদ্দুরে বের হলে নিজেও মরবে, ছেলেটাকেও মারবে—আর কানাই একা পেয়ে আমায় খুন ক'রে প্রতিশোধ নেবে, দিন দুপুরে ডাকাতি ক'রবে।'

গঙ্গাবতী ভয়ে চমকে ওঠে, কিশোরীর ছলনা বুঝতে পারে না।

ক্রমে কিশোরীর অবস্থা বড় শোচনীয় হ'য়ে দাঁড়ালো। বাঁচবার আর কোন আশা নেই, যে কোন মুহূর্ত্তে মারা যেতে পারে। গঙ্গাবতী আসন্ন মৃত্যুযাত্রিনীর পাশে বসে কেবল কাঁদছে, মন প্রবোধ মানছে না; অনবরত অশ্রুজলে শাড়ির আঁচল ভিজে যাচ্ছে। কিশোরী গঙ্গাবতীর মাথায় ও সারা গায়ে হাত বুলিয়ে প্রবোধ দেয়, ব্যর্থ সান্ত্বনা দেয়।...

কিশোরী গঙ্গাবতীর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ডাকলে 'গঙ্গা!'

গঙ্গাবতী চমকে উঠে উত্তর দিলে 'দিদি! কি দিদি?'

কিশোরী ক্ষীণস্বরে ধীরে ধীরে বললে—'শোন, বোন! যাবার বেলায় আর কাঁদিসনে, বড় কষ্ট হচ্ছে, আর কাঁদিসনি—সইতে পারছিনে, বুক বাঁধ দিদি!'

'দিদি! দি-দি!' গঙ্গাবতীর মুখে আর কথা সরলো না, কিশোরীকে জড়িয়ে ধরে কাঁধে মুখ গুঁজে ডুকরিয়ে কাঁদতে লাগলো।

'গঙ্গা! ও গঙ্গা! ছেলেকে একবার আমার কোলে দে তো!'

গঙ্গাবতী ছেলেকে অতি সাবধানে কিশোরীর দুর্ব্বল হাতে দিলো।

কিশোরী ছেলেকে চুমো খেয়ে গঙ্গাবতীর হাতে দিয়ে বল্‌লে—'বড় দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছি। ছেলেটা বড় ভয় পেয়ে গেছে, ছাখ্! কেমন ক'রে চেয়ে আছে। ও সবই বুঝতে পারছে, ওরা যে সব বোঝে,। বড় অস্বস্তি বোধ ক'রছি। ওঃ—!' কিশোরী হাঁপাতে লাগলো।

গঙ্গাবতী 'কি হলো' বলে চেঁচিয়ে উঠলো, কিশোরী হাত নেড়ে মানা ক'রলো।

কিশোরী খানিক চুপ ক'রে থেকে ধীরে, অতি ধীরে বল্‌লে—'যাবার সময় একটা কথা বলে যাই; বল্ আজীবন পালন ক'রবি!'

'ক'রবো—ক'রবো! তোর আদেশ প্রাণ দিয়েও পালন ক'রবো দিদি!'

'যখন যে অবস্থায় পড়িসনে কেন, ছেলেকে ফাঁকি দিবি না, মাতৃত্বের গতিকে বাধা দিবি নে, অপমান ক'রবি নে; সে পর্য্যন্ত ছুটির কল্পনা ক'রতে পারবিনে যে পর্য্যন্ত মাতৃত্বের দাবি পূর্ণ না হয়। বীর, ধীর, স্থির হ'য়ে পূর্ব্বের মতই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবি; নিজের নিজত্ব অম্লান বদনে অস্বীকার ক'রবি, যদি সন্তানের অদৃশ্য শক্তি তাও দাবি ক'রে বসে।' কিশোরী খানিক বিশ্রাম ক'রে বল্‌তে লাগলো, বড় আফ্‌শোষ র'য়ে গেলো যে, কিছু রেখে যেতে পারি নি। এখন থেকে তোর কঠিন সংগ্রাম ক'রতে হবে; আমার শিয়রের নীচে মাটিতে পোঁতা কিছু টাকা আছে, তা' দিয়ে এখন কোন ভাবে চালাস, এ শরীর নিয়ে গতর খাটাতে যাস নে; যাস নে কিন্তু, মাথার দিব্যি রইলো। আশীর্ব্বাদ করি ছেলেটি সুখী হোক, তুই পরজন্মে সুখী হোস্।'

'পরজন্ম! পরজন্ম! চাইনে দিদি। মনুষ্যজন্ম আর চাই নে, ও আশীর্ব্বাদ ক'রে অভিশাপ দিয়ো না। অন্য আশীর্ব্বাদ করো!'

কিশোরীর কথা বলবার শক্তি আর নেই, কথা বলতে চায়, বলছেও —কিন্তু ভাষায় ফুটাতে পারলো না, শুধু চোখে মুখে ফুটে উঠলো ব্যথা-জড়িত ভাষা, চোখের কোণ বেয়ে গড়াতে লাগলো অশ্রুকণা। শরীর স্থির হ'য়ে আসছে, চোখ বুজে যাচ্ছে, তাকিয়ে থাকতে চায় কিন্তু স্তিমিত নয়ন ঢুলে পড়ে, নাড়ীতে অতি—অতি চঞ্চল গতি, ধীরে—অতি ধীরে চলে, ক্রমে থেমে আসে—বোঝা যায় না; বুকের ধুক্-ধুকানী ছন্দে ছন্দে নাচে না, হঠাৎ একটু সাড়া দেয় যেন।

গঙ্গাবতী চেঁচিয়ে বললো—দিদি। ও দিদি! দ্যাখ্ দিদি! খোকা কেমন ক'রে তাকিয়ে আছে। একবার খোকাকে কোলে নিবি নে? দিদি! ধর খোকাকে!'

কিশোরীর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, কথা বলতে পারলে না; খোকাকে বক্ষে নেবার জন্যে হাত বাড়ালে, অসাড় হাত তখনি পড়ে গেলো।

গঙ্গাবতী চীৎকার ক'রে উঠলে 'দিদি! হাত সরালি কেন? অত সাধের খোকা তোর; একবার কি নিবি নে?'

কে উত্তর দেবে? শুধু একটা প্রতিধ্বনি হলো। গঙ্গাবতী ছেলেকে কিশোরীর বক্ষে আস্তে আস্তে রাখলে। কিশোরী শিথিল হস্তে চেপে ধরলো। সব শেষ। হাত কঠিন হ'য়ে গেলো, নয়ন মুদে গেলো, হৃদ্‌যন্ত্র থেমে গেলো, শরীর হিম-শীতল হ'য়ে পড়লো।

গঙ্গাবতী 'দিদি গো' বলে আর্ত্তনাদ ক'রতে ক'রতে কিশোরীর মৃত দেহখানি সাপটে ধরলো। মায়ের রোদনে ছোট শিশু ভয়ে 'মা! মা' বলে অস্ফুট ভাষায় বিষম কান্না জুড়ে দিলো।

কিশোরী মারা গেলো। কিশোরী গঙ্গাবতীর রক্তের সম্পর্কে কেউ নয়, পারিবারিক সম্পর্ক দিয়েও আত্মীয়া নয়, বহুদিনের সুখ দুঃখের

ভাগী বন্ধু নয়। কেউ নয়, কিছু নয়, কত দূরের অথচ কত নিকট, কত আপন—আজ গঙ্গাবতী মনে প্রাণে ভাল ক'রেই বুঝতে পারলো যখন সত্যিকারের মৃত্যু এসে ব্যবধান স্বষ্টি ক'রে দিলো। আজ ভাল ক'রেই বুঝতে পারলো—স্বামী ও কিশোরীর দুজনের ব্যবধান কত বড় আকাশ পাতাল প্রভেদ।

*
*** **** ***

কিশোরীর সঞ্চিত যৎসামান্য যা' টাকাকড়ি ছিল, জিনিষপত্তর ছিল, তা' দিয়ে টেনেটুনে কোনভাবে কয়েক মাস নিরাপদে কাটলো। কিশোরীর সঞ্চিত ধনে গঙ্গাবতী কয়েক মাস দুর্ভিক্ষের হাহাকারে জ্বলে না মরে একটু অলস নিঃশ্বাস ছাড়তে পেরেছে। আর ত' চালাতে পারছে না, ঘরে খাবার নেই, পয়সাকড়িও নেই, চাকরিও জুটছে না। এখন নিজেই বা খায় কি, ছেলেকেই বা খাওয়াবে কি? ছেলে এখন বেশ বড় হ'য়েছে, শুধু জননীর স্তনদুগ্ধে ক্ষুধা নিবৃত্তি ক'রতে পারে না; তার ওপর মাতৃস্তনে তেমন দুধ নেই, অতি চেষ্টা ক'রেও দুধ চুষে আনতে পারে না। গঙ্গাবতী ছেলের পাণ্ডুর মুখখানির দিকে করুণ-নয়নে তাকায়, ক্ষুধার অসহ্য জ্বালা নিজের প্রাণ দিয়ে বুঝতে পারে, সন্তানের মূক জ্বালায় অস্থির হয়, উন্মাদের মত ছটফট করে, কোন হদিস পায় না। কি ক'রবে? কি ক'রে চলবে? কোন্ পথে এগোবে? কি উপায়ে খাদ্য রোজগার ক'রবে? ভাবে, কেবলই ভাবে, হয় শুধু উদ্‌ভ্রান্ত। মিল, ফ্যাক্টরী, দোকান, লোকের বাড়ি—কোথায়ও অনুসন্ধানের বাকি রাখে নি; কেউ চাকরি দেয় নি, দিতে চায় না, করুণ কাহিনী, দুর্দ্দশার কথা কেউ শুনতে চায় না, অবকাশ দেয় না। নাছোড়বান্দা হ'য়ে দোরে দোরে মাথা ঠুকে ঘোরে, কেউ কেউ দুর্ব্বল

রোগা দেহ দেখে অনুকম্পার মুখোস পরে রুদ্র বিদ্রূপে তাড়িয়ে দেয়, কেউ কেউ মুখঝাড়া দিয়ে দূর ক'রে দেয়। রাস্তায়, হাটবাজারে, লোকের বাড়িতে মাঝে মাঝে ছোটখাট কাজ অতিকষ্টে যোগাড় করে, তাতে দু'জনের ভরণপোষণ করা যায় না, ছেলের পেছনেই প্রায় সব ব্যয় হয়। রোজ কাজ জোটাতে পারে না, তার ওপর অসুখ বিসুখ হ'য়ে প্রায়ই শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়ে থাকে। রোজ মাথা ধরে, শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে, সর্ব্বদা অবসাদ বোধ করে, রাত্রিতে জ্বর আসে।

চলছে না বল্‌লেই ত' কোন কিছু আটকে থাকে না, সুখ, দুঃখ সব কিছুই দাঁড়িয়ে থাকে ন', কাউকে অনুগ্রহও করে না। এ সে চিরন্তন, মামুলী, গতানুগতিক কথা। তবে দুঃখীদের দুঃখ দুর্দ্দশা কিন্তু অচল, শাশ্বত, একটু নড়তে চায় না। গঙ্গাবতীকে দুঃখদুর্দ্দশা বড় ভালবাসে, তাই যোড়শোপচারে ঘিরে রেখেছে। গঙ্গাবতীর দিন আর চলতেই চায় না, থেমে যাচ্ছে পদে পদে, সে লোপও পায় না—চলতেও পারে না, অথচ একটি একটি ক'রে দিন ঠিক ভাবেই যায়। দিনের শেষে ঘোমটা পরে আসে রজনী, রজনীর কালো আভরণে লেখা থাকে অভাব, অভিযোগ, হতাশা, ব্যথা, দুঃখ, লাঞ্ছনা, দারিদ্র্যের বিভীষিকা। কিশোরী মারা যাবার পর প্রায় এক বছর এক যুগের মত দীর্ঘকাল ব্যপ্ত হ'য়ে কাটলো। এই দীর্ঘকালে যে কত বড় দুঃখ দুর্দ্দশা গঙ্গাবতীর ওপর দিয়ে নির্ম্মমভাবে গেছে, তা বর্ণনাতীত। এক একটা দিনের করুণ কাহিনীতে যে এক একটা বিষাদকাব্য রচনা হতে পারে। ভারতবর্ষ জুড়েই যে বিষাদ কাব্য নিত্য হচ্ছে, অশ্রুগঙ্গা কোন পথে বইবে? কা'দের সহানুভূতি গেয়ে আছড়িয়ে আছড়িয়ে মাথা ঠুকে অনন্তে মিল্‌বে? স্থানও নেই, স্থান পেলে হয় শুধু বন্যা, প্লাবন, রোধ ক'রতে কেউ আসে না, শাস্ত কেউ করে না। গঙ্গাবতীর এই বিরাট, মর্ম্মান্তিক,

পাষাণভেদী বেদনা, জ্বালা, হাহাকার কিঞ্চিত অনুভব করা যায়, প্রকাশ করা যায় না। এ শুধু করুণ কাহিনী নয়, এতে শুধু সহানুভূতির অশ্রু ঝরে না, ভাবপ্রবণতার (sentiment) স্বাভাবিক কান্না আসে না; 'আঃ!' 'উঃ!' ক'রলেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না; বৈদ্যুতিক পরশে (shock) সর্ব্বাঙ্গ ভাষাহীন জ্বালা পোড়ায় চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে যেতে থাকে; অশ্রুতে অগ্নিবৃষ্টি হয়, অগ্নিবাষ্প হু হু ক'রে চারদিকে ছড়ায়, অনুভূতিকে বিকল ক'রে দেয়। এতো আমার চোখে দেখা, বিচার বুদ্ধিতে অপরের হৃদয়ের ছবি দেখা, বোঝা মাত্র; কিন্তু যার ওপর দিয়ে এসব ঘটছে, যে দেহ, মন, প্রাণ দিয়ে মর্ম্মে মর্ম্মে, স্পন্দনে স্পন্দনে অনুভব ক'রছে, যার হাড়ে হাড়ে অস্থিমজ্জায় এ আঘাত দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ ধরে লেগে আসছে, তার সঠিক অবস্থা, মনপ্রাণের ভাষাহীন ভাষা বোঝবার মত কি কিছু আছে? সে নিজেও জানতে পারে না। বৈদ্যুতিক আঘাতের পরিণতি দেখা যায়, কিন্তু তার আঘাত কেমন বোঝানো যায় না। বুভুক্ষুর জ্বালা লোকে অনুভব করে মাত্র, কিন্তু কেউ বোঝাতে পারে না, বর্ণনা ক'রতে পারে না, বুভুক্ষু-জ্বালার কবিত্বময় বর্ণনা শুধু নেশায় মাতলামি। ওদের রূপ নেই, দেহ নেই, অদৃশ্য শক্তি আছে ও শুধু অনুভূত হয়, প্রকাশ করা চলে না।

গঙ্গাবতী মরিয়া হ'য়ে যুঝছে, যেমনি ক'রে হোক চাই অর্থ, চাই খাদ্য। কল কারখানায় কাজ পায় না, কাকুতি মিনতি করে, দুঃখের কাহিনী বলতে বলতে কেঁদে ফেলে। রোগিণী, শক্তিহীনা, দুর্ব্বল নারীকে কেউ কাজ দেয় না, গঙ্গাবতী ছেলের কথা মনে ক'রে পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে, কেউ কেউ দয়া করেন, নাছোড়বান্দা স্বভাবকে এড়াতে না পেরে অল্প মজুরীতে কাজ দেন। গঙ্গাবতী বেশিক্ষণ কাজ ক'রতে সক্ষম হয় না, গা থর্ থর্ ক'রে কাঁপে, শরীর অবশ হ'য়ে যায়

প্রাণপণে একটু একটু এগোয়, চলতে পারে না, থামে, আবার চলে চমকে উঠে। চাকরির জবাব হয়, কাজ পায় না; ধর্ণা দিয়ে পড়ে, আবার হয়ত' কাজ পায়, আবার কাজ যায়; রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, কোন দিন কাজ পায়, কোন দিন পায় না।

গঙ্গাবতী নিজের অক্ষমতা, শক্তিহীনতা স্বীকার করে না। তাকে লোকে শত্রুতা ক'রে, ষড়যন্ত্র ক'রে কাজ দেয় না, ইচ্ছে ক'রে দাবিয়ে রাখছে, শুকিয়ে মারছে, নিষ্পেষণ ক'রে মারতে চাচ্ছে—কারণ সে নিজেকে কারও নিকট বলি দিতে রাজি হয় নি, হবেও না কখনো, দেহের ওপর অধিকার ক'রতে এসে বহু রাজরাজা, ক্ষমতাশালী, দুর্বৃত্ত মাতাল পদাঘাত খেয়ে সরে গেছে, নারীত্বের দীপ্তিতে কেউ টিঁকতে পারে নি। এতদিন সে ভদ্র মুখোসপরা লম্পটদের চাব্‌কিয়ে সায়েস্তা ক'রে এসেছে—তাই আজকাল কেউ কাছে ঘেঁসতে সাহস পায় না—শুধু ফাঁক অনুসন্ধান ক'রে দগ্ধ হ'য়ে জলে মরে, প্রতিশোধ নেয় আর্থিক ব্যাপারে। সব বড় লোক দল বেঁধে শত্রুতা ক'রছে, তাকে কপর্দ্দকহীন ক'রেও তৃপ্ত হয় নি, অভাব পূরণের পথ বন্ধ ক'রে তাকে চায় তাদের পথে স্বেচ্ছায় আনতে। গঙ্গাবতী ভাবে, আর আক্রোশে জলতে থাকে।

সকাল বেলা, অতি প্রত্যুষে উঠে কাজের খোঁজে বের হয়, সারাদিন আঁতি-পাঁতি ক'রে কাজের অনুসন্ধান ক'রে ব্যর্থ মনোরথ হ'য়ে যখন ঘরে ফিরে, তখন আর ধৈর্য্য রাখতে পারে না, বিবেক মনকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। জীবনের প্রতি এত নিরাশ হয় যে আত্মহত্যার প্রবল ইচ্ছাকে দমন করা বড় কষ্টসাধ্য হ'য়ে পড়ে। দিশেহারা হয়, উদ্‌ভ্রান্ত হয়, উত্তেজিত হয়, উন্মাদ হয়, পাগল হয়। এ জীবনে একটুও শান্তি পেলে না, জীবনটা ব্যর্থ গেলো। তিনটি সন্তান গেলো, শেষে আরো একটি মেয়ে খুন হলো, কিশোরী মারা গেলো, একটিমাত্র ছেলে আছে সেও

যাবার পথে। নিজে খেতে পায় না, ছেলেকে খাওয়াতে পারে না। দু'জনেই হয়ত' এক সঙ্গে যাত্রা ক'রে মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছাবে। বড় ভয়, বড় আতঙ্ক—যদি মৃত্যু এক সঙ্গে না হয়, যদি দু'জনে পাশাপাশি না চলতে পারে, যদি দু'জনের গতি একই মাপে না হয়, যদি মৃত্যু শান্তি দু'জনকে এক সঙ্গে দান না করে। গঙ্গাবতীর দুঃখময় জন্মের মাঝে একটি ছোটখাট পাথেয় নেই। চিরদুঃখীরও ছোটখাট পাথেয় থাকে—যা'তে জীবনে অন্য কিছু না পেলেও সে স্মৃতির কল্পনায় বেঁচে থাকা যায়, হতাশেও একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে পারে। তার ছেলে আছে একটি, জীবনে এর চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা, এর চেয়ে বড় সম্পদ আর নেই, অথচ তার নিকট কত ব্যথার, কত জ্বালার, কত বড় বিরাট হাহাকারের ধন। জননী সে—প্রাণপাত ক'রেও যখন ছেলের ক্ষুধার্ত্ত, রুগ্ন পাণ্ডুর মুখে খাদ্য, ওষুধ, পথ্য দিতে পারে না তখন ছেলেকে কি ছেলে বলে মনে ক'রতে পারে, জীবনের আলোক, শান্তি, তৃপ্তি, সমাপ্তি বলে ধারণ ক'রতে পারে? কল্পনা ক'রেও যে মনকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। ভাবে—আর ত' কোনই আশা নেই, হয়ত', পরজন্মে সুখ শান্তি মিলতে পারে। আর কেন দুঃখ কষ্ট সয়ে মরার চেয়ে অধম অবস্থায় বেঁচে থাকবে? কিসের আশায় নিবু-নিবু জীবন-প্রদীপখানি জোর জবরদস্তি ক'রে জ্বেলে রাখা? জীবনধারার পরিবর্ত্তন ত' শুধু মরণের ওপর নির্ভর ক'রছে, মরলেই ত' সব চুকে যায়, একটা আকাশ-পাতাল আমূল পরিবর্ত্তন হ'য়ে যায়। এ অবস্থায় বেঁচে থাকাই যে হাস্যাস্পদ ব্যাপার—নিতান্ত বোকামীর, মূর্খতার চূড়ান্ত, অভিশাপের আয়ুকে দীর্ঘ করা, বন্দনা করা। মরবে সে, আবার জন্ম নেবে কল্পনার স্বপ্নপুরীতে, স্বামী ছেলে-মেয়েকে নিয়ে সংসার ক'রবে, জীবন থাকবে অনন্ত, অভাব, অভিযোগ, অশান্তি, হাহাকার কাকে বলে তাও জানবে না—কখনও কোন দুঃস্বপ্নঘোরে।

— আঠারো —

গঙ্গাবতী ছেলের মাথাটি কোলে ক'রে ভাবছে, কেবলি তন্ময় হ'য়ে ভাবছে, ভাবনার গোড়া নেই, শেষ নেই, নির্দ্দিষ্ট পথ নেই, অনন্ত ভাবনা, ভাবছে, শুধু ভেবেই যাচ্ছে, কি ভাবছে নিজেই মনে রাখতে পারে না; কি চায়, কি ক'রে একে কার্য্যকরী করা যায়, কোন্ পথে গিয়ে কোন্ পথ ধরবে, কি ক'রে চলতে হবে? এই ভাবনার কাঠামো। কাঠামোর ওপর যখন রঙ্‌চঙ্ পড়ে—নিজেই চিনতে পারে না, কাঠামোর রূপ ভুলে যায়। ভাবতে হয় তাই ভাবে, ভাবতে বাধ্য বলে, পথহীনা বলে আবোল তাবোল ভাবে, দিশেহারা হয়, ব্যাকুল হয়, ভীত হয়, আঁৎকে উঠে চারিদিক খোঁজে, চেয়ে দেখে কিছু নেই—যেমনি সমস্যা তেমনই র'য়ে গেছে। জননী ভাবে, শিশু ছেলে কোলে ঘুমায়, কখনো পাশে শুয়ে আপন মনে অচেতন হ'য়ে থাকে। রুগ্ন শিশুর হাড়ক'টি উঁচু হ'য়ে আছে, রঙ্ মলিন, চোখের কোণে কালি, শরীরে মাংস নেই, একটি মানুষের আকৃতির চামড়া লটকে আছে নর-কঙ্কালকে আবেষ্টন ক'রে। পেটের অসুখ, জ্বর, কাশি ইত্যাদি লেগেই আছে। ক্রমে অবস্থা খারাপের দিকে গতি নিয়েছে, অবস্থা বেশ রীতিমত খারাপ। জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হ'য়ে প্রায় সর্ব্বদা থাকে, মাঝে মাঝে 'মা'মা' ক'রে চেঁচিয়ে উঠে। কাসতে কাসতে চোখের শিরায় রক্ত জমে গেছে; এত কাসি হয় যে কাসতে কাসতে দম বন্ধ হ'য়ে যায়, চোখ মুখ লাল হ'য়ে যায়, চোখের

তারকা নিশ্চল হ'য়ে ওপরে উঠে যায়। জননী পাগলিনীর মত প্রবোধ দেয়, বুকে মোলায়েম হাতের পরশ বুলায়, নাকে মুখে ফুঁ দেয়। ব্যাকুলভাবে কত কি শুধায়, অজ্ঞান শিশু ভাষাহীন, কিছু বলতে পারে না, আবরণ খুলে দেখাতে পারে না—কত জঞ্জাল, কত আবর্জ্জনা, কত হৃদয়বিদারক জ্বালা-যন্ত্রণা। ভাষার প্রভাবেও বুঝি সান্ত্বনা মিলে, শিশুর কি সান্ত্বনা মিলে? হয়ত' মিলে, নাড়ীতে নাড়ীতে সে মিলন ঘটায়, নইলে হয়ত' হৃদ্‌-যন্ত্র বন্ধ হ'য়ে শিশুরা মারা যেতো। গঙ্গাবতী নাড়ীর টানে বুঝতে পারে—নাড়ী ছেঁড়া ধনের প্রাণে কি ঝড় বইছে। মনে হয়, মনে হয় তার বলিষ্ঠ এক হাতে নিজের টুঁটি চেপে ধরে, দুর্ব্বল কোমল অন্য হাতে ছেলের টুঁটি চেপে ধরে, দু'জনেই একত্রে এপার ওপারের সন্ধিস্থলটা পেরিয়ে চলে যায়, আরও তার মনে হয় যে, জগতের যত বন্ধু, এক পথের পথিক যত জননী আছে—তাদের দুর্ব্বল হৃদয় থেকে সন্তান ছিনিয়ে এনে সহযাত্রী করে। এক একবার ভাবে, হাত উঠে, হাত বাড়ায়, থমকে যায়, হাত শিথিল হ'য়ে পড়ে যায়।...পাগলিনী! গঙ্গাবতী পাগলিনী হ'য়েছে। ভাবে, কেবলি ভাবে—পথ নেই, উপায় নেই, সত্যই কি কোন উপায় নেই, পথ নেই? কি ক'রে এই আসন্ন মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবী নির্ম্মম হাত থেকে মুমূর্ষুকে বাঁচাবে, রক্ষা ক'রবে? জীবনের একমাত্র শেষ সম্বল হারানিধিকে কি ক'রে ধরে রাখবে, মৃত্যু-দূতের হাত থেকে কেড়ে রাখবে? যদি একেই না বাঁচাতে পারলো, রক্ষা না ক'রতে পারলো—তবে কেন সে অত বিপত্তি, অত অত্যাচার, অত নির্ম্মম অবিচারের পরও বেঁচে রইলো? কেন সে বেঁচে আছে, কেন সে অভিশপ্ত সংসারের সংসারী? এর উত্তরে গঙ্গাবতী ভাবতে পারে না, মনে হলেও বুঝতে পারে না। বাঁচতে হয় তাই বাঁচে, মানতে হয় বলেই সব মানে, এ যে অপ্রতিহত প্রকৃতির ধারা। সে যে সাধারণ মানুষ

মাত্র, তাই তার সংসার—সে যে জননী তাই সে এত বড়—তার বুকে যে এখনো একটি সন্তান আঁকড়ে আছে তাই তার বেঁচে থাকবার প্রবল আসক্তি ; জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি আনবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। মরণেচ্ছু যে খানিক উত্তেজনার প্রলাপ মাত্র ; ছেলেকে বাঁচিয়ে তোলা, সুখী করা, ছেলের সুখে নিজে সুখী হওয়াই যে তার প্রবল গুপ্ত অভিলাষ। গভীর জলে নিমজ্জিত জীব পিছল, চলন্ত, ভঙ্গুর, যে কোন জিনিষের ওপর পা' স্থাপন ক'রে বাঁচতে চেষ্টা করে, এই যে জীব-ধর্ম্ম।...

অতি ভারাক্রান্ত এ দুনিয়ার মাঝে কি এমন কেউ নেই যে এই দুঃখিনীর শিশুকে বাঁচিয়ে দিতে পারে? এতলোক, এত টাকাকড়ি, এত ঐশ্বর্য্য, এত খাদ্য, এত ওষুধপত্তর—এর কি এক কণাও তাদের দেবার কেউ নেই! কত ঘরে ঘরে কত জিনিষ স্তূপীকৃত হ'য়ে দিনের পর দিন ধরে পড়ে আছে, কত জিনিষ কত অনাদরে, অপ্রয়োজনে আনাচ-কানাচে পড়ে নষ্ট হচ্ছে, অপ্রয়োজনের নষ্ট জিনিষের একমুষ্টি কি এরা পেতে পারে না! এত ঐশ্বর্য্য যে অত্যাচার ক'রে শেষ ক'রতে পারেনা, এর থেকে কি এরা কিছু পেতে পারে না, এরা ভিক্ষা চায় ; হত্যা দিয়ে পড়ে থাকে ফেলে দেওয়া জিনিষের এক মুষ্টি নিতে। চারদিকে হাহাকার উঠে, চীৎকারে গগন বিদীর্ণ হয়, বক্ষ ফেটে যায়, গলা শুকিয়ে যায়, শুধু হাহাকার। কেউ দেয় না ; কেউ যে নেই, নেই কেউ এদের! ভাবে স্বামীর কথা। হায় রে স্বামী! এখনো কি জাগবে না, এখনো কি তোমায় চৈতন্য হলো না, আর কি ফিরে তাকাবে না! যেখানে থাকো, একবার ফিরে তাকাও মুহূর্ত্তের তরে। যত বড় নির্ম্মম, চেতনাবিহীন হও না কেন, লাগবে ঘা, দুলে উঠবেই।...

রজত!...বহুদিন পরে রজতের কথা মনে পড়লো। রজত! বন্ধু! দাদা! কোথায় তুমি—অমরলোকে না নরলোকে? যেথায় থাকোনা,

আমায় সাড়া দাও, বলে দাও—আমার জন্যে কোন পথ আছে? ওগো নবীন! ওগো সুন্দর বন্ধু! আমি যে পথ-হারা, বিভ্রান্ত, বিপর্য্যস্ত, ফুটন্তজলের মত এলোমেলো। আমি কি ক'রবো, কি উপায়ে বাঁচাবো আমার জীবনপ্রিয় মরণোন্মুখ সন্তানকে? আর যে কোন পথ নেই, ছুনিয়ার সভ্যতা, স্বার্থপরতা হিংস্রতা যে সকল পথ রুদ্ধ ক'রে রেখেছে! ওগো! বলে দাও—সতীত্ব বড় না সতীত্বের বিনিময়ে অপত্য-রক্ষা বড়? আমি কী ক'রবো? সতীত্ব রক্ষা ক'রে সন্তানকে পিষে মারবো, আপনাকে ধ্বংশ ক'রবো না দেহ বিক্রয় ক'রে রক্ষা ক'রবো সন্তানকে, আপনাকে? সভ্যতা, সমাজ, আইন, রীতিনীতি দেখিয়ে দেয়না বাঁচবার পথ, দেয়না জীবনায়ন, দেয়না মুক্তি, শান্তি, তৃপ্তি। ওরা মানুষকে দলে, পিষে, আত্মদহের অগ্নি জ্বালায় শুধু ঘৃণিত মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে! ওগো বন্ধু! আর পারিনে, পারিনে—পা-রি-নে।...

গঙ্গাবতী চোখ মুখ খিঁচে, যন্ত্রণায় সারা অঙ্গ কুঞ্চিত ক'রে অচেতন হ'য়ে সকল বিপত্তি, সমস্যা এড়াতে চায়।...কিশোরী! এখন তুমি কোথায়? কত দূরে আছো? একবার পেছনে তাকিয়ে দেখো! আর বুঝি ধরে রাখা যায় না, প্রতিজ্ঞা যে রক্ষা হয় না, সত্য যে হতাশের ব্যথায় ভেসে যায়! সর্ব্বনাশী কি প্রতিজ্ঞা করালে? আশীর্ব্বাদ ক'রলে কি? এ যে অভিশাপ! নারী হ'য়ে কি ক'রে কোন প্রাণে আশীর্ব্বাদ ক'রতে পারলি? নারীত্ব কি গলা চেপে ধরে নি, প্রাণে কি সহস্র সহস্র অসহ্য হুল ফোটা দংশন হয় নি। কেন তুমি ভালোবাসলে, কেন অত গভীরভাবে ভালোবাসলে? কেন কুড়িয়ে এনে ঠাঁই দিলে, কেন মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনলে? কি সর্ব্বনাশ ক'রেছো, কি মহা ভুল ক'রেছো, কি মহা ক্ষতি ক'রেছো! যা' সর্ব্বনাশ ক'রেছো, তা' তো আর ফেরানো যাবে না, কি উপায় হবে তবে? আশীর্ব্বাদ ফিরিয়ে নাও,

চাই নে আশীর্ব্বাদ। অভিশাপ দাও! প্রাণভরে অভিশাপ দাও। পরপার থেকে অভিসম্পাৎ ক'রো!…অভিসম্পাৎ কি ক'রবে না? দয়া কি হবে না? ওগো। দয়া করো, অভিসম্পাৎ দাও!

গঙ্গাবতী কি সত্যই অভিসম্পাৎ চায়? না…। কেন?

গঙ্গাবতী ভাবে, হিংসুক লোভীর মত হাঁ ক'রে তাকিয়ে দেখে—কত চিকিৎসক রাস্তার মোড়ে মোড়ে, রাস্তার মাঝে সারিসারি কত ওষুধের দোকান; বড়লোকের বাড়িতে কত ওষুধ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে, নর্দ্দমার জলে পড়ে নষ্ট হয় অথচ সে এককোঁটা ওষুধ পায় না; চুরি ক'রে, ফাঁকি দিয়ে—এমন কি ভিক্ষে ক'রেও আনতে পারে না। থমকে থমকে চলে, হাঁ ক'রে ওষুধ পত্তরের পানে তাকিয়ে থাকে; তাড়া খেয়ে সরে পড়ে, চলে, আবার থমকে দাঁড়ায়—নতুন দোকানের পাশে। এমনি চলে, এমনি চলে কত সময়, কত ভোর, সন্ধ্যা, কত রাত্রি; কতদিনও এমনি ভাবেই চলে! বড়লোকের বাড়ির পাশে এসে দাঁড়ায়, সচকিতে চারদিকে তাকায়, আশা মেটে না, আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় না, অভাব ছোট হ'য়ে আসে না, হাহাকার মাথা নিচু করে না। কখনও আবর্জ্জনা ঘেঁটে ওষুধের শিশি পায়। পথের লোককে জিজ্ঞেস করে—শিশিটা কিসের? ওষুধের শিশি হ'লে আনন্দে আত্মহারা হয়, কাকুতি মিনতি ক'রে সব খবর নেয়, প্রাণখুলে আশীর্ব্বাদ করে। ছেলেকে ওষুধ খাওয়াতে যায়, থমকে উঠে, আঁৎকে উঠে, তাড়াতাড়ি ছুটে যায় ডাক্তারখানায়, ভাল ক'রে খবর নেয় কিসের ওষুধ! ডাক্তারবাবু, কম্পাউণ্ডারের কথা ভিন্ন কাউকে বিশ্বাস করে না। বড়লোকের কথায়ও তার বিশ্বাস নেই। খাবার ওষুধ ভাল ক'রে খোঁজ খবর না নিয়ে কি ছেলেকে খাওয়াতে পারে? রাস্তায়, নর্দ্দমার পাশে বহুবার সর্দ্দিকাসির ওষুধ পেয়েছে, ছেলের সর্দ্দি কাসি না হলেও একটু আধটু খাওয়াতো। এ যাত্রায় যে

কঠিন রোগ! কি রোগ তা' জানে না, আন্দাজে কুড়িয়ে পাওয়া ওষুধ রোজই দু'তিনবার ক'রে খাওয়ায়, কিন্তু কোন উপকার হয় নি। জরও কমে না, রোগীর অব্যক্ত ব্যথা, যন্ত্রণাও কমে না। পূর্ব্বে ডাক্তারখানা থেকে কুইনাইন কিনে এনে নিজের বা ছেলের জর হ'লে খেতো, ছেলেকে খাওয়াতো, কয়েকদিন পর জর সেরেও যেতো। এবার কুইনাইনেও জর ছাড়ছে না। ভাবে, মিলে ফ্যাক্টারীতে যদি কাজ পেতো—তবে ছেলেকে চিকিৎসা করাতে পারতো, ওষুধও খাওয়াতে পারতো, এক পয়সা খরচ পড়তো না। এখন মিলে ফ্যাক্টারীতে কাজ নেই, হাতে টাকাকড়িও নেই। টাকা ছাড়া ডাক্তার আসেন না, পয়সা ছাড়া ওষুধ মিলে না। এক পয়সার সঙ্গতি নেই—কি ক'রে ডাক্তার ভাড়া ক'রবে, কি ক'রেই বা ওষুধ কিনবে, কি ক'রেই বা পথ্য যোগাড় ক'রবে? টাকা চাই! কোথায়ও ধারকর্জ্জ পায় না, দ্বারে দ্বারে টাকা ধারের জন্যে ধর্ণা দেয়—কেউ দেয় না। তার কোন বন্ধুবান্ধব নেই, চেনাশোনা যারা আছে তারা নিজেরাই খেতে পায় না, অন্যকে কি ক'রে সাহায্য ক'রবে—হাতে পয়সাকড়ি থাকে না, ধার দেবে কি!

—ধার পায় না, দান পায়না, সাহায্য পায় না, দয়া পায় না, তবে ক'রবে কি? দুনিয়ার লোককে প্রশ্ন করে, সে ক'রবে কি? এ অবস্থায় তার কি কর্ত্তব্য? তার অতীত ও বর্ত্তমানের সব অবস্থা বর্ণনা ক'রে জিজ্ঞেস ক'রেছে যে, সে ক'রবে কি? ধূর্ত্ত দার্শনিক বুলি না আওড়িয়ে উত্তর দাও!

ভাবে, সে কোন পথ না পেয়ে, কারো সাড়াশব্দ না পেয়ে চুরি ক'রবে। সে চুরি ক'রবে! কিন্তু ক'রতে ত' জানে না; চুরি ক'রবেই বা কোথায়? যাদের আশেপাশে যেতে পারবে তারা যে কপর্দ্দকহীন। সে ধারণাই ক'রতে পারে না—চোরে কি

ক'রে টাকা পয়সা চুরি করে। লোকে ত' পথে ঘাটে পয়সাকড়ি ফেলে রাখে না, দরজা খোলা রাখে না, বাক্স তালা দিয়ে বন্ধ রাখে—তবে চোরে কি উপায়ে চুরি ক'রতে পারে? সে ত' নিত্য রাস্তাঘাটে, বাড়িবাড়ি আনাগোণা করে—কৈ, একসময়ও টাকাকড়ির সন্ধান পায় না। বাড়িতে লোক থাকে, চুরি করা কি মুখের কথা! যদি ধরা পড়ে, তবে জেলে পূরবে—তখন ছেলেকে কে দেখবে?··· ভিক্ষে? কে দেবে ভিক্ষে? চামচে বা ঝিনুকে কি সমুদ্র ছেঁচা যায়? এই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনে যে ভিক্ষুকদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা চলছে। অন্য গতি না থাকায় নয় ভিক্ষাই ক'রলো, যা' পাওয়া যায় তাই মস্ত বড়, কিন্তু ভিক্ষে ক'রতে বের হলে মুমূর্ষু রোগীকে কার নিকট রেখে যাবে? এমন একটি লোক নেই—যার নিকট অল্পক্ষণের জন্যে রেখে যেতে পারে?···অভাগিনী নারী ছোট ছেলেটিকে কোলে নিয়ে শুধু ভাবছেই, রোজ ভাবে, আজও ভাবছে, হয়ত' ভবিষ্যতেও এমনি ক'রেই ভাববে। ভাবনার অন্ত থাকবে না, আদি থাকবে না, ধারা থাকবে না, হবে না শেষ, পাবে না পথ, মিলবে না কূলকিনারা—শুধু অনন্ত, অসীম, দিকহারা, এলোমেলো, ঘোরপ্যাঁচ, জটিল। * * *

সন্ধ্যা উৎরে গেছে বহুক্ষণ। অচেতনপ্রায় বালক একবার শুধু "মা! মা' রবে কেঁদেছিলো, আবার ঘুমিয়ে পড়েছে; ঘুম নয়, মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে আছে। গঙ্গাবতীর বাহ্যিক জ্ঞান বিশেষ নেই, নেই-ই। ছেলেকে কোলে নিয়ে সারাদিন যাবৎ বসে আছে, এ পর্য্যন্ত জলস্পর্শ করে নি। নড়ে না চড়ে না, একই ভাবে বসে আছে; গম্ভীর চিন্তিতমুখ, নয়নতারকা নিশ্চল, স্থির, পলকহীন, তাকিয়ে আছে—অথচ দৃষ্টিহীন; রুক্ষ ক্ষিপ্ত বিদ্রোহী চুলগুলি অরাজকতা ঘোষণা ক'রেছে, মলিনবস্ত্র অসংযত, অচেতনপ্রায় শিশুর কোমল, সরু ঠোঁটযুগল

স্পর্শে আছে মাতৃস্তন। যেন একটি শ্বেতপাথরের মাতৃমূর্ত্তি। এত সুন্দর, এত বিষাদ কাব্যময়, এত করুণ কাহিনীময় নরনারীর মূর্ত্তি কি কখনও দেখেছো? পৃথিবীর কোনও মূর্ত্তিতে কি এত কথা গাঁথা আছে? এত কাব্য কি নীরব ভাষায় প্রকাশ করে মর্ম্মে মর্ম্মে? হে সন্তানের দল! একবার অবনত মস্তকে এসে দাঁড়াও—জননীর চরণধূলি তলে; জগতের সকল সন্তানের মস্তক লুটিয়ে পড়ুক ভূমির ওপর, মিলিতকণ্ঠে গাহি—অমলিন পবিত্র মাতার বন্দনা।

এমন সময় গির্জ্জার ঘড়ি ঢং-ঢং-ঢং ক'রে বেজে উঠলো; নরনারী আরাধনা ক'রবার জন্যে হৈ হৈ ক'রে ছুটে আসতে লাগলো; মন্দিরে মন্দিরে কাঁসি, ঘণ্টা, শঙ্খ বিকট ঐক্যতানে বেজে উঠলো, মসজিদে মসজিদে আজানের সাড়া বিকটভাবে প্রকাশ পেলো। ভেঙ্গে ফেলো মন্দির, ভেঙ্গে ফেলো মসজিদ, ভেঙ্গে ফেলো গির্জ্জা। কি হবে ভণ্ডামীতে—ধর্ম্মের ফন্দিতে, ভগবানের চালচাতুরীতে, তোষামোদ করা দর্শনতত্ত্বে, স্বার্থপর ভগবানের স্তুতিগানে। ও গুলি যে পাগলাগারোদ। ভেবে দেখো একবার সমস্ত দুনিয়াটাকে—এ দুনিয়াটা কি চিড়িয়াখানা নয়?—আর মসজিদ, গির্জ্জা, মন্দিরগুলি পাগলাগারোদ ভিন্ন অন্য কিছু বলা চলে কি! সভ্যতার অসভ্যরূপ দিয়োনা! যদি জননীই সন্তানের জন্যে অভিসারে যেতে বাধ্য হয়—তবে কিসের মন্দির, কিসের গির্জ্জা, কিসের মসজিদ, কি-ই বা মূল্য থাকে ভগবানের! জননী! জননী যায় অভিসারে! হে সন্তানদল! নিজের ওপর দিয়ে ভাবো জননী যায় দেহ বিক্রয় ক'রতে!···যারা পুষ্পরথে (এরোপ্লেন) আকাশ পথে চলে, একশোমাইল গতিতে মোটর হাঁকায়, চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় নিত্য খেয়ে বিরক্ত হয় না, শ্রমিকের প্রতি অন্যায়ের 'পর অন্যায় ক'রে ক্লান্ত হয়

না ওদের কথা ছেড়ে দিলাম, কিন্তু যারা টাকা তৈরি ক'রে, লোকের ওপর সর্দ্দারী ক'রে রাজাপ্রজার ব্যবধান দেখায়, সমুদ্রের ওপর সীমানা দেয়, ভূগোলের চিত্রকে লাল, সবুজ, হলদে, কালো কালিতে রঙ বেরঙে চিত্রিত ক'রে নিজের রঙ বাড়াতে চায়, তাই নিয়ে হয় মারামারি, হয় কাটাকাটি—তাদের ডেকে আনো—যারা ধর্ম্মের ব্যবসা করে, পাণ্ডাগিরি ক'রে ভবনদী পার করে, পাপ থেকে ত্রাণ করে, অজ্ঞান তিমির মোহাচ্ছন্ন থেকে মহাজ্ঞান, মহালোকে নেবার জন্যে সর্দ্দারী করে, সে সব মহাজ্ঞানী, মহালোক-প্রাপ্তদের ডেকে এনে দেখাও—জননী চলেছে অভিসারে। হায়রে জননী! হায়রে সন্তান!···

উৎসবের বিকট হুঙ্কারে গঙ্গাবতী চমকে উঠলো। একটি কথা আবার ভাবলে, যা' দিন ভরে ভাবছে; আবার ভাবলে, যদি উপায় পাওয়া যায়, যদি শেষ পথ এড়ানো যায়, অন্য কিছু মিলে। লোকে যেমন ফাঁস লাগিয়ে চারদিক খোঁজে বাঁচবার পথ, রক্ষা পাবার উপায়—যদিও সে জানে যে, সে বাঁচবার পথ বন্ধ ক'রে রেখেছে। গঙ্গাবতী ভাল ক'রেই জানে যে আর কোন উপায় নেই, এই তার শেষ পথ, তবু ভাবে, ভেবে ভেবে কাঁদে। আর পথ নেই, সময়ও যে আর নেই, বহুক্ষণ কেঁদে এড়াতে চাইলে, পারলে না এড়াতে, উঠে দাঁড়ালো। তারপর ধীরে ধীরে সন্তানকে ছেঁড়া কাঁথায় জড়িয়ে ভাল ক'রে শুইয়ে দিয়ে এক পা' সরে গেলো। আবার ভাবনা আসে, ভাবলো, অনেকক্ষণ ভাবলো—উপায় নেই, পথ নেই। ভাল ক'রে কাপড় পরলেনা, চুল ধুয়ে আঁচড়ালে না, গা ধুলে না, মুখ হাত পর্য্যন্ত ধুলে না যেমনি ছিল তেমনি ভাবেই চললো। দোর হ'তে ছুটে ফিরে এলো। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে একটি চুমো খেয়ে বললে তোর জন্যে এ পোড়া

দেহ বিক্রয় ক'রবো, প্রাণও দেবো, তবু তোকে বাঁচাবো। সতীত্ব! (গঙ্গাবতী চমকে উঠলো ভয়ে) হ্যাঁ! সতীত্ব বিক্রয় ক'রবো! এ পোড়া দেহ তোর তুলনায় অতি তুচ্ছ। না-না! রাগ করিস নে, সতীত্ব তো দেবো না, নারী কি সতীত্ব দিতে পারে? আমি যে নারী, আমি যে জননী। আমি দেহ দেবো, মন ত' দেবো না, কেন পাপ হবে? যদি পাপ হয় তবে ত' শুধু আমারই হবে, তোকে যেন স্পর্শে না।' টস্ টস্ ক'রে কয়েক ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু শিশুর ললাটে পড়লো, জননী চুম্বনে চুম্বনে সে অশ্রু ফোঁটাগুলি মুছে নিলো।

…এতো দিন যে সম্পদ প্রাণপণ আঁকড়ে ধরেছিল, আজ স্বেচ্ছায় তা' বিলিয়ে দিতে চললো ছেলের জীবনের বিনিময়ে।…

গঙ্গাবতী শ্যামজীর বাড়ির সুমুখে এসে থমকে দাঁড়ালো,'পা' কিছুতেই আর এগোতে চাচ্ছে না। সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে। পা' যেন ভেঙ্গে পড়ছে, কি ভীষণ ভারি—এক বোঝা দস্তা পায়ে যেন আঁট ক'রে বেঁধে রেখেছে, পা' তুলতে পারছে না, অবশ ক'রে দিচ্ছে। টলতে টলতে আলোর থামে ঠেস দিয়ে কুঁজো হ'য়ে কোনভাবে খাড়া রইলো। কেন সে এসেছে? কি চায় সে? এমনি যেন ঘোরাঘুরি ক'রতে এখানে এসে পড়ছে। এর কি কোন উদ্দেশ্য লাগে? মনে করো এখন থেকেই তার কাজ আরম্ভ হবে, এখান হতেই তার আরম্ভ। এখন থেকে এ স্থান হতেই যেন আরম্ভ হবে। কি চায় সে? কি উদ্দেশ্য তার? কিছু চায় না সে, কোন উদ্দেশ্য তার নেই। বেশি ক্ষণ মনকে চোখ ঠারা যায় না—ভাবতে হলো যে তার তেমন জরুরি কাজ নেই, উদ্দেশ্য নেই, এমনি এসেছে, যদি একটা কিছু যৎসামান্য উপকার হয়। ক্রমে এগিয়ে চললে—যদি সে কিছু পয়সা পায়, রাস্তায় কতলোকে কত টাকাকড়ি কুড়িয়ে পায়, সে সেই খোঁজে এসেছে; যদি

কোন অযাচিত, অনাহূত কোন সৌভাগ্য হঠাৎ কুড়িয়ে পেয়ে ফেলে। ঘোরাঘুরি ক'রতে ক'রতে কাজকর্ম্মও ত' পেয়ে ফেলতে পারে। রোজই পথঘাট আঁতিপাতি ক'রে খোঁজে যদি কোন টাকাকড়ি পায়, যদি কেউ দয়া ক'রে অর্থ দান করেন, যদি কেউ চাকরি দেন, আজও তাই খুঁজতে এসেছে। সে ত' রোজই যাওয়া আসা করে! ধীরে ধীরে সেই কথাতে আসতে বাধ্য হলো। অন্যদিনের মত আজও সব ব্যর্থ হলো; শেষ পথ অস্পষ্ট থেকে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হ'য়ে সম্মুখে প্রসারিত হলো, আর ফাঁকি দেওয়া চলে না, আর বাজে কথা এনে ভুলে থাকা যায় না; অপত্য স্নেহের টান অপ্রতিহত, অপত্য-স্নেহ অন্ধ। সে প্রশ্নটা মর্ম্মে মর্ম্মে, হাড়ে হাড়ে, মজ্জাতে মজ্জাতে হুল ফুটিয়ে মারাত্মক হ'য়ে বাজলো— তার সমাধান ক'রতেই হলো। কি করা যায়? তবে কি দেহ বিক্রয় ক'রতেই হবে। প্রাণমন দিয়ে ভাবছে, আশা ক'রছে, প্রতিক্ষণে একটি দৈবঘটন—অঘটনের উত্থাপনের আলোড়ন, তা' কি হবেনা? এখনো সময় আছে, এখনো যদি একটা কিছু ঘটে যায়, যাতে সে এ অবশ্যম্ভাবী বিপদ থেকে রক্ষা পায়। ব্যাকুল দৃষ্টিতে, সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে তাকায়, উদ্‌গ্রীব হ'য়ে কান পাতে। ঢিব্-ঢিব্-ঢিব্ ক'রে বুকে হাতুড়ীর ঘা পড়ে, শরীর শিথিল হয়, ইন্দ্রিয় জড় হয়। কৈ? কিছু ত' হচ্ছে না। যেমনি পৃথিবী ছিল, তেমনিই ত' আছে। সে যেমনি ছিল—তেমনি আছে। ঘর, দোর, পথ, ঘোড়াগাড়ি, দালানকোঠা, দোকানপাট সব কিছুই তেমনি আছে। কিছুই ত' হয় নি? হচ্ছে না প্রলয়, হচ্ছে না ভূমিকম্প, হচ্ছে না টাকাকড়ির ঝড়, হচ্ছে না জগতব্যাপী বিদ্রোহ, হচ্ছে না মারামারি কাটাকাটি, আসছে না কোন ছোটবড় সৌভাগ্য তেপান্তরের চৌমাথা পেরিয়ে। তবে কি, তবে কি ভগবানের ইচ্ছা, সভ্যজাতির ইচ্ছা যে সে সতীত্ব বিকিয়ে অর্থ উপার্জ্জন করে?

এতদিন যা' প্রাণপণে রক্ষা ক'রে এসেছে সে অমূল্য সম্পদ কি বিক্রয় ক'রতেই হবে? কৈ কেউ ত' সাড়া দেয় না। সাড়া দাও, যে যেখানে থাকো একবার সাড়া দাও, সাড়া দাও; 'মাভৈঃ' ক'রে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল থেকে উঠে এসো।০ ০ ০ কৈ কেউ ত' এলো না; গঙ্গাবতী ওপরে তাকায়, পাশে তাকায়, নীচে তাকায়, ভাবে হয়ত' কেউ আস্‌বে, যেমনি ক'রে পুরাকালের রূপকথাতে স্বয়ং ভগবান ছদ্মবেশ ধরে সতীকে বাঁচাতেন, তেমনি ক'রে। কেউ এলো না। এলে না? যদি নাই বা এলে, তবে সতীর আদর্শ নতুন ক'রে ব্যাখ্যা করো; আজ থেকে প্রচার ক'রো যে মাতৃত্বের নিকট সতীত্ব তুচ্ছ, অপত্য-স্নেহের জন্যে সতীত্ব বিসর্জ্জন দেওয়ায় সতীর আদর্শ উচ্চ হয়; জননী যে ভাবেই মাতৃত্ব বাঁচিয়ে রাখুক না কেন তাই সতী নারীর আদর্শ হবে, সন্তানের দাবি পূরণ করা স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ, অসীম পুণ্য।

গঙ্গাবতী সংস্কারবশতঃ যতই পেছোয়, অপত্য-স্নেহের প্রভাব ততই এগিয়ে দেয়, মানসিক দ্বন্দ্বে তার অবস্থা হলো—নঃ যযৌ নঃ তস্থৌ। একবার এদিকে যতটুকু ঠেলে, পরমুহূর্ত্তে আবার উল্টোদিকে ততটুকু ঠেলে, গতি তখন হয় মন্দ, দাঁড়ায় সন্ধি স্থলে। বাতির থামে হেলান দিয়ে যে কতক্ষণ মনের দ্বন্দ্ব নিয়ে তোলপাড় ক'রছে তার কোন হুঁস্ নেই। সংস্কার বাঁচাতেও পারে না, সংস্কারের প্রভাব ছাড়তে পারে না, সতীত্বের প্রভাবও ছাড়তে পারে না; সর্ব্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে সৌভাগ্যকে আনাতে চায়, তা'ও তেপান্তরকে এড়িয়ে আসে না। এমনি চলছে, হয়ত' কতকাল চলতো কে জানে! হঠাৎ একখানা মোটর ভোঁস্-ভোঁস্ ক'রে সতীরমণীর মর্ম্মরমূর্ত্তি বেষ্টিত গেট পেরিয়ে বের হ'য়ে এলো। মোটর শাঁ-শাঁ বেগে বের হ'য়ে চলে গেলো। গঙ্গাবতী দেখলে শ্যামজীকে ও একটী রূপসী যুবতীকে।

গঙ্গাবতী যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। দেবতা তাকে অতবড় বিপদ থেকে বাঁচালেন বলে মনে মনে বহু ধন্যবাদ দিলো, যুক্তকরে অবনত মস্তকে অদৃশ্য দেবতাকে প্রণাম ক'রলে বার বার। এক মুহূর্ত্ত দাঁড়ালে না, উর্দ্ধশ্বাসে বাড়িমুখে ছুটলো। কি সর্ব্বনাশ! মুমূর্ষুকে একলা ফেলে সে এসেছে অভিসারে! ধিক্কারে সারা গা রি-রি ক'রতে লাগলো। হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি এসে উন্মাদের মত ছেলেকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

ঠিক্ তার পরদিন! দিনের আলোকে গঙ্গাবতী লজ্জায় মরমে মরে যেতে লাগলো। সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোক সহ্য হচ্ছে না, আঁধারে মুখ লুকাতে পারলে বাঁচে! শুধু নির্জ্জনতায় চলবে না, জমাট আঁধার চাই, এমনি আঁধার হবে যা'তে নিজেরও অনুভব ক'রে বুঝতে কষ্ট হয়। ছেলেকে একা ফেলে রেখে কোন আনাচে কাণাচে লুকোতে পারছে না, ছেলের দিকে না তাকিয়েও উপায় নেই। ছেলের পাশে বসে শুশ্রূষা না ক'রলেই নয়। গঙ্গাবতী মহা বিপদে পড়লো। মাথা তুলতেই ছেলেকে দেখতে পায় সঙ্গে সঙ্গে মাথা নত হ'য়ে যায়, লজ্জায় আত্মহত্যা ক'রতে চায়। ছিঃ! ছিঃ! ক্ষণে ক্ষণে মন প্রাণ, প্রাণ, বিবেক, দেহ ঘৃণায় রি-রি-রি ক'রে উঠতে লাগলো।

সারাদিন মুমূর্ষুকে নিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই ক'রে অবসন্ন হ'য়ে পড়লো। যতই দিন যায়, ঘনিয়ে আসে গোধূলি—ততই মনপ্রাণ দেহ অবসন্ন, শ্রান্ত, ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়ছে। জননী হ'য়ে আর কতকাল বঞ্চিত ক'রবে, আর কতকাল লৌহকণ্টকচক্রে নিষ্পেষিত ক'রবে। কি অধিকার আছে তার একটি জীবকে হত্যা ক'রবার? কে তাকে বলেছে যে জীবহত্যায় পুণ্য হয় যদি সতীত্বে ছোঁয়া না পড়ে? এ পোড়া দেহ কোন্ ছার যে, জীবন অপেক্ষা প্রিয় ছেলের কল্যাণে বিকোতে পারবে না?

একদিকে সতীত্ব, অন্যদিকে পুত্রের জীবন, কোন্‌টা সে চায়? পুঁথি পুস্তকের কথা নয়, বড় লোকের বড় কথা নয়, তার প্রাণ, বিবেক কোন্‌টা চায়? সতীত্ব সতীত্ব ক'রে ত' এতদিন দর্প ক'রে এলো, সেই দম্ভে চারটি সন্তান মারা গেলো, স্বামীকে হারালো, যে সন্তানটি আছে সেও মৃত্যু-যন্ত্রণায় ভুগছে। নিজে নয় কিছু পেলে না; কিন্তু স্বামী বা পুত্রের ত' মঙ্গল হওয়া উচিত ছিল। সতীত্বের দম্ভে কোন উপকার হয় নি, কখনো হবেও না, তবে বিসর্জ্জন দিলে ক্ষতি কি? ক্ষতি হবেই বা কি—যার ক্ষতিময় জীবন। সতীত্ব বিসর্জ্জনে অন্যের কোন ক্ষতি নেই, তার মহাসর্ব্বনাশ হ'বে, সংস্কারের হাত থেকে ত্রাণ পাবে না, মানসিক রাজ্য নরক হ'বে, জীবন্ত অবস্থায় পুড়ে পুড়ে অঙ্গার হ'বে; ভাবে, বাকিই বা কি আছে! আরো ভাবে—হোক, শুধু তারই ত' হ'বে, সে সাগ্রহে মাথা পেতে নেবে যত-মারাত্মক, যত নির্ম্মম ঘা পড়ুক না কেন! ছেলেকে বাঁচাতে যদি নরকবাস ক'রতে হয় তবে সে অনন্ত নরকবাস ক'রবে হাসিমুখে, মনের সুখে। যদি দেবতার অভিশাপ পড়ে, তবে সে আশীর্ব্বাদ বলে গ্রহণ করবে। ছেলেকে কোলে নিয়ে একটু কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবতে লাগলো। একই প্রশ্ন, একই যুক্তিতর্ক, একই উত্তর বহুদিন যাবৎ ভাবছে, আজো গতানুগতিক ভাবেই চললো। সংস্কারের বিপত্তি, না সত্যের ইঙ্গিত কে জানে? ভুল, না সত্য কে বলবে? যারা এ কাহিনী পড়বে তারা এর উত্তর দিও।

সাঁঝের ক্ষীণালোকে গঙ্গাবতী ভাল ক'রে সাজলো। গা ধুয়ে কাপড় পরলে, জটাবাঁধা চুল অতি কষ্টে এক রকম ক'রে খোঁপা ক'রলে, আঁচলে ময়দা লাগিয়ে মুখে ঘসে-মেজে লাগালে, প্রদীপের কালিতে চোখে সরু কাজল পরলে, ভ্রু'র সন্ধিস্থলে উজ্জ্বল একটি টিপ আঁকলে। সাজ-সরঞ্জাম নেই, আরসি নেই—তবু বহুক্ষণ ধরে প্রসাধন ক'রলে। আজ

মনকে দৃঢ় ক'রেছে, কোন কথা ভাবে না। জীবন নিয়ে' আর কতকাল ছিনিমিনি খেলবে! সটান অভিসারে গিয়ে নামবে, কিছুই ভাববে না; আর কোন কথা চিন্তা ক'রবে না, আর কোন সমস্যা নেই, চোখ-মুখ বুজে যাবে, দরাদরি ক'রে টাকা আনবে, ডাক্তার ডাকবে, ওষুধ কিনবে, পথ্য করাবে—ব্যস্ দিনের কাজ তার শেষ। কোন কথাই ভাববে না, সেখানে গিয়ে কি অভিনয় ক'রবে নটরাজের সঙ্গে, তাও ভাববে না, মনকে বিশ্বাস নেই, কি জানি কি ভাবতে কি এসে পড়ে, তারপর হয়তো দুর্ব্বলতার, সংস্কারের অসীম হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। সংস্কার জীবনের মস্ত বড় বিপত্তি, খুব বড় শত্রু। আজ আর ছেলেকে জড়িয়ে ধরলে না, চুমো খেলে না, মনপ্রাণ বিবেক এত দুর্ব্বল, এত সতর্ক যে, হয়তো ছেলেকে বাহুডোর থেকে মুক্ত ক'রতে পারবে না, মুক্ত ক'রতে গিয়ে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়তে পারে। ছেলেকে দূর থেকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি দরজা ভেজিয়ে বের হ'য়ে পড়লো, ফিরে তাকাতে সাহস পেলে না, একটি শুধু চাপা নিশ্বাস শূন্য গগনমার্গে মিলালো।

শিরায় শিরায় উষ্ণরক্ত প্রবাহিত, মাথার পুঞ্জীভূত শিরা উপশিরায় জ্বলছে আগুন, কাঁপছে থর্ থর্ ক'রে সর্ব্বাঙ্গ, শরীর শিথিল, প্রাণ অনুভূতিহীন, মন, বিবেক বিকল। এক এক পা' বাড়াতে থমকে যায়, পিছনে হটে যায়। উপায় নেই, আবার ভাবনা চিন্তা, আবার দুর্ব্বলতা! ভাববে না, একটুও চিন্তা ক'রবে না, দুর্ব্বলতাকে পাশে ঘেঁসতে দেবে না। আজ উন্মাদিনী, উন্মত্ত, পাগলিনী! কামের অনলে নয়, দৈহিক মিলনে নয়, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, জীবন-মরণ সমস্যায় উন্মত্ত, উদ্ভ্রান্ত, পাগলিনী! প্রাণপণ শক্তিতে নিজের নিজত্ব, অস্তিত্ব অন্তরালে লুকিয়ে হনহন্ ক'রে শ্যামজীর বাড়িতে ঢুকে পড়লো।

শ্যামজী একখানা ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় শুয়ে, পা দু'টি টেবিলের ওপর তুলে দিয়ে হিসাব-খাতা ঘাঁটছেন, এমন সময় গঙ্গাবতী হঠাৎ টেবিলের পাশে এসে থম্‌কে দাঁড়ালো! একটু অস্বস্তি, একটু নীরবতা।...

শ্যামজী চমকে উঠে বল্‌লেন—'কে? কি চাই?'

গঙ্গাবতীর মুখ থেকে কোন কথা সরলো না, শুধু ওষ্ঠদুটি নড়লো মাত্র!

'কে তুমি? কি চাই?'

গঙ্গাবতী অতি চেষ্টায়ও মুচকি হাসতে পারলে না, বল্‌লে—'আমি গো, আমি!'

'য়্যাঁ! গঙ্গাবতী! গঙ্গা-ব-তী! এমন অসময়ে—'

গঙ্গাবতী একটি কথাও বল্‌তে পারলো না।

'কি বিপদে পড়া গেলো! কি চাই? কি প্রয়োজন তোমার?'

গঙ্গাবতীর হাবভাবে শ্যামজী বুঝতে পারলেন যে, গঙ্গাবতীর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে; অতি দুঃখ-কষ্ট পেয়ে পাগলিনী হ'য়ে গেছে। তাড়াতাড়ি পাপ বিদায় ক'রবার জন্যে বল্‌লেন—'ভিক্ষে চাচ্ছো? এখন কোন সুবিধে হবে না, বড্ড ব্যস্ত আছি। অন্য সময় এসো'খন কিছু দেওয়া যাবে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও—'

'ভিক্ষে! ভিক্ষে!' গঙ্গাবতী এমনি বিকট ভাবে উচ্চারণ ক'রলে যে, শ্যামজী চমকে উঠলেন, ঘরের আসবাব পত্তরগুলি, জানালার সারসি-গুলি যেন থর্ থর্ ক'রে কেঁপে উঠলো। শ্যামজী ভয়ে কোন প্রতিবাদ ক'রতে সাহস পেলেন না! গঙ্গাবতী খানিকক্ষণ দম নিয়ে বলতে লাগলো—'হ্যাঁ ভিক্ষেই চাইচি। সব গিয়েছে, শেষ সম্বল একটি ছেলে, সেও মরণের মুখে; না আছে ওষুদ, না আছে পথ্য। তাই—তা—ই।'

গঙ্গাবতী আর বল্‌তে পারলে না, ক্ষুদ্র বালিকার মত কেঁদে উঠলো। কত ব্যথার, কত দুঃখের যে অশ্রুফোঁটাগুলি—জানে শুধু সে নিজে, আর জানে তার অন্তর্য্যামী।

কত কাকুতি মিনতি, কত অশ্রুজল শুধু ভিক্ষের জন্যে। বেশি না, যৎসামান্য অর্থ, ওষুদ ও পথ্যের জন্যে। সব ব্যর্থ হলো। বিগত-যৌবনার কাতরোক্তি আজি ব্যর্থ হলো!

— উনিশ —

দীর্ঘকাল পর অপ্রত্যাশিত ভাবে রজতের মুক্তির আদেশ হলো। রজত আরো আশ্চর্য্য হ'লো যে সে নাকি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। হিজলী ডিটেনশান ক্যাম্প থেকে যখন সে বেরিয়ে আসে সুপারইনটেণ্ডেণ্ট তার করমর্দ্দন ক'রে জীবনের স্থিতি ও উন্নতি কামনা ক'রেছিলেন। কত বছর সে জেলে কাটিয়েছে মনে নেই, কোনদিন হিসাব করেনি, জীবনের ডাইরিও ক'রে নি। কলম নিয়ে বসলে, বিগত জীবনের সূত্র ধরে বর্ত্তমানকে চলতি রেখায় মিলিয়ে নিয়ে ভবিষ্যতের রেখাপাত ক'রতে কষ্ট হয়, আলস্য আসে—আসে এত ক্লান্তি, বিরক্তি, শ্লেষ যে মনের ও দেহের অবস্থা ঠিকরূপে বুঝে উঠতে পারে না। মনুষ্য জীবনের ওপর তার ধিক্কার এসে গেছে! প্রথম প্রথম আশার আলোক মেঘের ফাঁকে ইন্দ্রধনু ছটা আঁকতো, ক্রমে সারা আকাশ জমাট মেঘের কালিতে একেবারে অন্ধকারের মত কাল হ'য়ে যায়! এরি মধ্যে কবে যেন সে জীবনটাকে বাকির খাতায় উসুল দিয়ে ফেলে, সব কথা মনে নেই, মনে রাখবার মত ক্ষমতাও আর নেই—তবে বড় কষ্ট হ'য়েছিল বাকির খাতায় লিখতে!

যেদিন জানলে সে নির্দ্দোষ, দুষ্ট লোকের ষড়যন্ত্রে সে বন্দী হ'য়েছিল —তখন ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা পুনঃ ফিরিয়ে পেয়েছিল। বেরিয়ে ত',এলো এখন ক'রবে কি? জগত বহুদূর এগিয়ে গেছে, সে ত' সমান তালে পা'

ফেলে আর চলতে পারবে না! সভ্য জগতের তালের সঙ্গে ত' তাল পড়ে না—তার যে বহু পূর্ব্ব থেকেই তাল কেটে গিয়েছিল, তার জীবন যে ছন্দহীন, চলতি সভ্যতার প্রতি যে তার শুধু বিদ্রূপ ও কৃপা আছে মাত্র!···ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলছে। বালীগঞ্জের ট্রাম কালীঘাটের পুলের ধারে দাঁড়ালো। রজত কোন কিছু না ভেবে ট্রামে উঠে পড়লো। কণ্ডাক্টার টিকিটের পয়সা চাইলে তার খেয়াল হ'লো কোথায় যাবে সে! তার যাবার স্থান যে আর নেই! ট্রামের লোক-গুলির প্রতি তাকিয়ে হেসে উঠলো এই ভেবে যে, যার মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই তার গতির প্রতি নজর কেন হয়? ওই অসীম নীলাকাশের কতটুকু স্থান সে ব্যবহার ক'রতে পারবে? সভ্যতার প্রভাবে সারা দুনিয়া তো এখনো মরুভূমি হয়নি, এখনো সবুজ কচি ঘাসের কোমল বিছানা তার মত অসভ্যদের জন্যে বিছানো আছে।·····

লেকের পাড়ে বসে রজত ভাবছে! আজ যে সত্য সত্যই ভাববার দিন! জীবনের স্থিতি সহজ, কিন্তু তার গতি, বিকাশ ত' সহজ নয়! জেলটাই ভাল ছিল—কোন ভাবনা চিন্তা নেই, জীবনটা বাকির খাতায় জমা দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। হঠাৎ আবার শত্রুতা কেন? জীবনের সারাংশ যে ক্ষয় হ'য়ে গেছে, এ জীবন দিয়ে সে আর কি ক'রতে পারে?

রজতের চিন্তা সূত্রকে ছিন্ন ক'রে দিলো তাপসী। রজত তাপসীকে পাশে দেখে চমকে উঠলো! লেক্—তার ওপর ব্যর্থ প্রেমিক—দীর্ঘ বিরহের পর আরাধ্য দেব দেবীর সান্নিধ্য, পূর্ব্বরাগ বিদ্যুৎ ঝলকানোর মত হঠাৎ ঝলকে উঠে—ভগবান জানেন কি অবস্থা দাঁড়ায়!···

তাপসী টিপিক্যাল গিন্নীর মত রজতের নিকটে এসে একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লে—রজত না?

বয়সে ছোট মেয়েদের পাকামিতে রজতের হাসি পায়, একটু শ্লেষ মিশ্রিত স্বরে বল্‌লে—চিনতে পারা যায় না—কেমন ?'

'বড্ড শুকিয়ে গেছ যে—একি চেহারা হ'য়েছে, চোখ বসে গেছে, রঙ্‌ মলিন হ'য়ে গেছে। দাড়ি কামাতেও সময় পাওনি ?...তারপর, আছ কেমন ?'

'আমি বড় শুকিয়ে গেচি—না ? তুমি যে দেখচি বেশ ফুলচো। ওয়েট পনেরো ষ্টোনের কম নিশ্চয় নয় !'

রজত তাপসীর স্থুল দেহটার প্রতি তাকিয়ে হাসতে লাগলো !·· রজত হাসে কেন ? ওর মুখে হাসি শোভা পায়না। ওর হাসি ভাব-প্রবণ প্রাণকে কাঁদিয়ে দেয়—অস্বস্তির ব্যথার কঠিন আঁচড় কাটে। রজত কাদুর্ক, ওর কান্নাই যে বাঞ্ছনীয় ! যে তার জীবনটা ব্যর্থ ক'রে দিয়েছে, যে সুখের, ঐশ্বর্য্যের দম্ভে কৃপা করে, চাল দেখায় তাকে সে হেসেই অভ্যর্থনা ক'রবে ? Elope ক'রবে না—প্ররোচিত ক'রে লেকের শীতল গর্ভে যোড়া বেঁধে চির-মিলন লাভ ক'রবে না—অন্তত প্রতিশোধ নেবে না ?···

তাপসী রজতের একটু দূরে দাঁড়িয়ে গলার লম্বা সরু সোণার চেনটা মধ্যের আঙ্গুলের ডগায় নিয়ে হীরক বসান লকেটটা ঘুরাতে ঘুরাতে জিজ্ঞেস ক'রলে 'তারপর অতদিন ছিলে কোথায় ? কি ক'রচো এখন ?'

'আমাদের আবার থাকা না থাকা। আমাদের মরণ বাঁচনে দুনিয়ার কোন কিছু আসে যায় না। পুরুষ মানুষের বেঁচে থাকাটাই তো বর্ত্তমান যুগের মস্ত বড় humour.'

'এত বয়েস হলো ; বয়েসের দিক থেকে সংসারে রীতিমত দায়িত্ব আছে তবু সাহিত্যিক idiocy গেলো না। কাব্য লেখা ছাড়ো। কি হবে ও-সব trash সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে ? আমি তোমার ভালর জন্যেই

বলচি। সাহিত্যে পেট ভরে না, জীবনকে সুন্দরভাবে চালানো যায় না। আজও তোমার চৈতন্য হয়নি? বাঙলা সাহিত্য! যে দেশে সাহিত্য ফরমাস্ অনুযায়ী সৃষ্টি ক'রতে হয়, সম্পাদক ও পাঠকের মনোরঞ্জন ক'রে মিথ্যা কথা, ভুল কথা লিখতে হয়; যে দেশের সম্পাদকেরা নিজের দলের লোক নয় বলে ভাল লেখকদেরও chance দেননা, দাবিয়ে রাখবার জন্যে দুর্ণাম করেন, শত্রুতা বশতঃ মিথ্যা ক'রে বিশ্রী সমালোচনা করেন, ভিন্ন দলের লেখক যা'তে নাম না ক'রতে পারে তার চেষ্টা করেন; যে দেশের সাহিত্য সমালোচনা হলো চাকরির উমেদারীর মত—সে দেশের যারা সাহিত্যকে জীবনের আরাধ্য করে ওদের মত বোকা আর নেই। Art for art sake নয় art for money sake.'

'তুমি তো ইতিমধ্যে বেড়ে উন্নতি ক'রেচো দেখচি। বল্লেনা—Sincerity, simplicity, honesty and devotion are the greatest crimes in this century. A first class idiot proves his best idiocy when he believes his beloved—কেমন? একি, চুপ্ ক'রে গেলে যে!'

তাপসীর মুখখানা রাত্রির মত কাল হ'য়ে গেলো। কনকবাবু নিকটে নেই তবু তাপসীর ভয়। মেয়েদের ভয়টা একটু বেশিই থাকে! মেয়েরা পুরুষকে যত ভয় পায় তত আর কাউকে ভয় পায় না।

রজত ক্রমশঃ যে ভাবে চলছে তা'তে তাপসীর মুখ শুকিয়ে গেলো। রজতকে বাধা না দিলে কি যে বলে বসবে, পূর্ব্ব স্মৃতির প্রভাবে কত কি দাবি ক'রে বসতে পারে! যদি ক'রেই বসে?—তাপসীর শরীর কেঁপে উঠলো! পূর্ব্বরাগের সূচনাতে, গুপ্ত প্রণয়ের গুপ্তদ্বারে স্বামীর আগমনকে যে সতী-সাধ্বী নারীরাও জাজ্বল্যমান যমদূতের আগমনের

চেয়ে বেশি ভয় পায়! সতীত্বের প্রতি এদের সব চেয়ে বেশি মোহ সেজন্যেই এদের এত ভয়, এত বেশি প্রবঞ্চনা।

তাপসী কথার ধারা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি বল্‌লে 'এখন চাকরি-বাকরি ক'রচো না বাড়িতে বসেচো!'

'সাহিত্যিক মানুষের চাকরি ক'রতে হয়না। পত্রিকাওলারা, প্রকাশকরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা দিয়ে থাকেন কারণ ওরা capitalist, কারণ বাঙ্গালী পাঠকরা luxury হেতু বাংলা বই কিনেন! বিয়ের কথা জিজ্ঞেস ক'রলে না—কটি ছেলেমেয়ে—'

'বিয়ে ক'রেচো!'

'না—মেঘদূত লিখচি।' রজত হেসে উঠলো!

'চেহারা দেখে কিন্তু মনে হয় না!'

'গরিব লোকের এই নাকি গরিবপণার মস্ত বড় বিশেষত্ব। গরিব লোকের অভাবের চিহ্নগুলি এত বেশি পরিস্ফুট থাকে যে অন্য কিছু এসে হদিসই পায়না, সব কিছু তলিয়ে যায়।'

'অত পেঁচিয়ে কথা বলো কেন?'

'আমার যে দালান নেই, গাড়িও নেই! বাবা যদি মোটা রকম bank balance রেখে যেতেন তবে দেখতে আমার সব কথাই কত সোজা হতো।'

'তোমার বাবা মোটা রকম bank balance রাখেন নি সত্যি কিন্তু জমি-জমা তো যথেষ্ট রেখে গিয়েছিলেন!'

'যথেষ্ট! প্রায় জমিদারি। পূর্ব্বে সম্ভব তুমি জানতে না—না?'

'ঠাট্টা ক'রচো!'

'তোমাকে আমি ঠাট্টা ক'রবো। তুমি প্রফেসর গিন্নী, জমিদারণী—তোমাকে ঠাট্টা ক'রবে কোথাকার কে এক সামান্য লোক!··· থাক্ বাজে

কথা ; তারপর বেশ আছ, না ? কনকবাবুও সঙ্গে এসেছেন নাকি ?—এসেছেন ! ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ ক'রবার সুবিধেই হয়নি ! তোমার পুরাতন বন্ধু বলে আমার যেচে পরিচয় করা উচিত ছিল !—না আজ থাক, অন্য একদিন হবে'খন, বিশেষতঃ তোমার তেমন মত নেই।' রজত যেন অপ্রস্তুতের হাসি হাসতে লাগলো।

তাপসী রজতকে এড়াবার জন্যে তাড়াতাড়ি বললে, 'সঙ্গে কাচ্চা-বাচ্চা আছে ঠাণ্ডা লাগাবো না ! দেখা হলো, সুখী হলাম। আচ্ছা, আসি ! এক দিন যেও কিন্তু।'

স্থানটা অপরিষ্কারের মত অন্ধকার—সান্নিধ্যটা নিজের নিঃশ্বাসের মত সত্য, হাওয়ার মত চঞ্চল।...তাপসী সত্য সত্যই চলে যাচ্ছে—পাষাণী ! বে-রসিক ! রজতও কম নয় ! থপ্ ক'রে পরিচিত দেহটাকে ধ'রে দীর্ঘ এক চুম্বন ক'রলে না, কাব্য সৃষ্টি ক'রলেনা, এমন কি দীর্ঘ এক বক্তৃতা ক'রে নাটকও তৈরি ক'রলে না। শুধু হো-হো-হো ক'রে হেসে উঠলে। হাসির মাঝে যেন ব্যথা, শ্লেষ মাখানো তীক্ষ্ণ তীরের মত ছড়িয়ে পড়লো 'রজত ! অত রোগা হ'য়েছ কেন ? আমি প্রফেসর গিন্নী, টাকাওয়ালা লোকের গিন্নী হ'য়েছি বলে দেখতো কেমন মোটা হ'য়েছি !'...হাসিটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ গেলো।

* * * * * * * * * *

অতি ভয়ঙ্কর আকাশ ! বিরাট আকাশ ব্যাপি' মেঘে মসীলিপ্ত হ'য়ে আছে। হাওয়া ক্ষিপ্ত, রাস্তার বিশ্রী, দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনা ঘেঁটে উড়িয়ে নিয়ে চলছে ! লোলচর্ম্ম ঘৃণায় কুঞ্চিত হ'য়ে আসে।

বম্বে এসে রজত তিন দিন ধরে গঙ্গাবতীকে খুঁজছে। গঙ্গাবতীকে কত সম্ভবাসম্ভব স্থানে প্রত্যাশা ক'রে ভয়ে, কষ্টে মরমে মরে গেছে—তবু পায়নি ! আসন্ন প্রলয়ের ভূমিকায় যখন বস্তির ঘৃণ্য, দূষিত, পীড়নে

কুক্ষিত, অত্যাচারে জমাট বাঁধা হাওয়ায় এসে পৌঁছায় তখন চমকে উঠে দেখলে একজন পাগলিনীর মত নারী দৌড়ে কুঁড়ে ঘরে ঢুকছে; হয়ত' মুহূর্ত্তকে কুঁড়েখানি স্থতো ছেঁড়া ঘুড়ির মত উড়ে চলে যাবে!

রজত দৌড়ে কুঁড়ে ঘরে ঢুকে পড়লে! চমকে উঠলে বিগত-যৌবনা, বিকলাঙ্গ, শুকিয়ে যাওয়া বিশ্রী, ভয়াবহ নারীকে দেখে! নারী বিবস্ত্রা প্রায়, খাটো, ছেঁড়া বস্ত্র পূর্ণ অঙ্গ ঢেকে রাখতে সক্ষম নয়! অকাল বার্দ্ধক্যের পীড়াদায়ক দেহ নিরাভরণ হ'য়ে রজতের চক্ষুকে পীড়া দিচ্ছে!

'গঙ্গাবতি! গঙ্গাবতী না?'

'কে—কে? রজত দাদা!'

'গঙ্গাবতী—তুমি? তোমার এ অবস্থা কি ক'রে হলো!'

'অবস্থা!' অদৃশ্য দেবতাকে বিদ্রূপ ক'রতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত ভাবে কেঁদে উঠলো।

রজত ঝাঁপিয়ে পড়লো, কান্নায় খসে পড়া অকাল বৃদ্ধার দেহটা সবলে নিজের তপ্ত বক্ষে চেপে ধরলো! দু'জনের মুখে কথা নেই—কান্নার বেগে, বক্ষের দ্রুত উত্থান পতনে অনন্ত ভাষা।...

'তারপর—তারপর?...উঃ! শ্যামজীকে ছেড়ে দিলে—কানাইকেও ক্ষমা ক'রলে? তখন পাষণ্ড কানাইকে খুন ক'রতে পারনি! সেদিন যদি কানাইকে খুন ক'রতে পারতে তবে সতীত্বের নতুন আদর্শ হ'ত, অপত্য স্নেহের জয়জয়-কার পড়ে যেতো!...তারপর?'

'তারপর!' গঙ্গাবতী একটু চুপ ক'রে থেকে বলতে লাগলো 'তোমার কাছে আমার মানাপমান নেই, গোপনাগোপন নেই, পাপপুণ্য নেই! তিনদিন যখন নির্জ্জলা উপোষ ক'রলাম, তখনও সতীত্ব রক্ষা ক'রে বাঁচতে চেষ্টা ক'রেছি, তারপর যখন বাচ্চাটা ওষুধ ও পথ্যের অভাবে ঊর্দ্ধশ্বাস টানতে আরম্ভ ক'রলে তখন আর পারলাম না ছুটে গেলাম—

উঃ! (ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো) শ্যামজী আমার বিকলাঙ্গ আর্সিতে দেখালেন, আমি অচেতন হ'য়ে পড়লাম—ভিক্ষা পর্য্যন্ত দিলেনা!'

'দিলেনা—দিলেনা! Scoundrel, swine! Living hell!' রজত উন্মত্তের মত ঘরে পায়চারি ক'রতে লাগলো। হঠাৎ রজত আপন মনে বলে উঠলো 'যা' হোক ভগবান তা'হলে তোমায় পাপের পথ থেকে রক্ষা ক'রছেন!'

'ভগবান!' গঙ্গাবতী ক্ষেপে উঠে বিদ্রূপ ক'রে বল্‌লে 'ভগবান! তুমিও ভগবানের দোহাই দিচ্চো? বোকার ভগবান—আমার ভগবান বলে কেউ নেই। যদি সত্যই কেউ থেকে থাকে তবে, আমি তাকে অভিশাপ দিই—নরকের আবর্জ্জনায় গলে, খসে জীবন্ত পচে মরবার জন্যে। সতীত্ব—স-তী-ত্ব, সতীত্ব কি আর আমার আছে। আমি যে (ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো) আমি যে মনে প্রাণে বেশ্যা হ'য়ে গেছি! যদিও আমার দেহ এখনো কলঙ্কিত হয়নি, তোমাদের সভ্যতার সতী-আদর্শানুসারে এখনো আমি সতী কিন্তু আমার মনকে ফাঁকি দিই কোন প্রবঞ্চনায়?'

'ওরে দুর্ভাগিনী নারি! বলিস কী? অপত্য-রক্ষার জন্যে তুমি দেহ বিক্রয় ক'রতে পারো তা' যে আমার কথার কথা মাত্র ছিল। উঃ! ভগবান একি ক'রলে নিঠুর!'

'আকণ্ঠ গরল পান ক'রতে বাধ্য হ'য়ে, আবর্জ্জনায় ডুবে মরতে মরতে তোমার অত বড় কুসংস্কার মানায় না দাদা! জানো, এর জন্যে আমি অনুতপ্ত নই—আমার শুধু দুঃখ হয়! আমার এমনি জীবনের জন্যে তোমাদের দেবতাকে অভিশাপ করি শুধু।...একদিন—'

'না-না-না! আমি আর শুনতে চাইনে, আমার দম বন্ধ হ'য়ে আসচে, বেদনায় বুক ফেটে যাচ্ছে; আমি আর সইতে পারিনে!'

'পথের শেষে যখন এসে দেখা দিয়েচো তবে, শুনে যাও তোমাদের অদৃশ্য দেবতার মাহাত্ম্য, তোমাদের সভ্যতার, জ্ঞানের, পুণ্যের, ন্যায়ের রাজ্যের দু'একটা ঘটনা দেখে যাও। যখন দেখলাম আর কোন পথ নেই, যখন আসন্নমৃত্যুমুখী সন্তান, নিজের অভুক্ত পেট আমায় বুঝাতে বাধ্য ক'রলো সত্যই আমার আর অন্য কোন গতি নেই, আমি গেলাম থিয়েটারে, সিনেমায়। যারা কোনদিন হাজার হাজার টাকার লোভ দেখিয়েছিল তারা দূর্ দূর্ ক'রে তাড়িয়ে দিলে। তারপর গেলাম চুল বিক্রয় ক'রতে, চুলওয়ালারা আমার পেছনে দুষ্ট ছেলেদের লেলিয়ে দিলে! তারপর, তারপর গেলাম সে পাড়াতে—যেখানে মেয়েরা সন্ধ্যা-রাতে নিশিপদ্ম হ'য়ে ঘণ্টায় ঘণ্টায়—হলোনা স্থান। তারপর—শোন, শুনতে তো বিশেষ কষ্টকর নয়, যার ওপর দিয়ে এ দৃশ্য ঘটে গেলো তার অবস্থা তো বুঝতে পারবে না, তোমাদের দেবতাও পারেন না!…রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে একদিন শেষ রাতে একটি পাকা বদমাইস পাঁড় মাতাল শিকার মিললো—আমার সতীত্বের মূল্য দিতে চায় চার আনা!' গঙ্গাবতী রাগে জ্বলে উঠলো।

রজত উত্তেজিত হ'য়ে চেঁচিয়ে বল্‌লে, 'তোমার সতীত্বের বিনিময় —এঁ্যা! এর পূর্ব্বে কি তোমার মরণ বাঞ্ছনীয় ছিল না? যার সতীত্বের বিনিময় পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যে হ'তো না, পৃথিবীর উত্থান পতনেও সম্ভবপর ছিল না তার মূল্য হলো, তা'ও আবার শুন্‌তে হলো?'

গঙ্গাবতী কি এর পর অতি তুচ্ছ, হীনা নারী হ'য়ে পড়েনি? তার পর কি তার স্বাতন্ত্র্য, শ্রেষ্ঠত্ব, বিশেষত্ব, নারীত্ব, উঁচু আদর্শ অতি তুচ্ছ ভাবে ধূলিসাৎ হ'য়ে যায়নি? তার উদ্দেশ্য কি অতি হীন হ'য়ে ছিল না? যদি সতীত্ব দিতে হয় তবে কম মূল্যে দেবে কেন! বেশি টাকা পেলেই সতীত্ব দিতে পারে! যৌবনে যে সকল আবেদন তার চরণ

তলে এসে নৈবেদ্য হতো তা' কি তখন মনে আফ্‌শোষের ঝড় তোলেনি? তাই যদি হয় তবে কি সে ঠকেনি, মস্ত বড় ভুল ক'রেনি যৌবনে সতীত্ব বিক্রয় 'করেনি বলে'?··· করেনি সে! সত্য সত্যই যে, সে অসতী নয়! সে ত' নিজের জন্যে টাকা রোজগার ক'রতে চায়নি, তবে কেন সে হীনা হবে?··

গঙ্গাবতী শান্ত হ'য়ে বললে—মাতালটা অসভ্যের মত আমার গায়ে হাত দেয়, রাগ সামলাতে পারলাম না, এক ঘুসি মেরে বসি। মাতালটা আর্ত্তনাদ ক'রে পড়ে যায়। ছেলেটা কেঁদে উঠলো দৌড়ে ঘরে পালিয়ে যাই!

'Well served! বেশ ক'রেছিলে!'

'বেশ তো করিনি! ওর তো কোন দোষ ছিল না! তারপর দিনও যখন ছেলেটাকে কিছু খাওয়াতে পারিনি তখন আমার আফ্‌শোষ হ'য়েছিল।

রজত বল্‌লে—'তবু তো রক্ষা পেয়েচো!'

'ভগবান যা' করেন মঙ্গলের জন্যে না? এখনো মরিনি তো—ছেলেটাও বেঁচে আছে! কিছু আফিম্ যদি কিনে দেও দাদা তবে তোমার পুণ্যি হ'বে!' গঙ্গাবতী বিকট স্বরে হেসে উঠলো! মৃত্যুমুখী সন্তান মরণার্ত্তনাদ ক'রে উঠলো। গঙ্গাবতী একটি স্তন ছেলের মুখে ঢুকিয়ে দু'হাতে প্রাণপণে চেপে ধরলে দুধ নিঙ্‌ড়াবার জন্যে! রজত 'উঃ!' ক'রে আর্ত্তনাদ ক'রে চোখ ঢাকলে!

বাইরে প্রলয়ের ঝাপ্‌টা ঝাপটি, বিদ্যুতের অগ্নিকণা নরকের বীভৎস আকাশকে ছুরিকাঘাতে কিমার মত ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিচ্ছে, ধরণী মৃত্যুমনের চেয়ে অন্ধকার! গঙ্গাবতী বল্‌তে লাগলো 'মাতালটাকে মেরে নির্জ্জন ঘরে শুয়ে কেন জানি তোমাদের দেবতাকে অভিযোগ

ক'রেছিলাম—হায় বিধাতা! আমার শেষ পরিণতি কি এমনি ক'রে তৈরি ক'রেছিলে? তোমার শরীর কী দিয়ে তৈরি, কী দিয়ে গড়া তোমার মন-প্রাণ? তোমার সৃষ্ট একটি সাধারণ মানুষের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে যে মহত্বটুকু বের হয় তা' কি তোমার মাঝে নেই? তুমি কী? কি ক'রে আমার শেষ-পথ এমনি তৈরি ক'রলে? আমায় যে অবস্থায় দাঁড়াতে বধ্যে ক'রেছো, সেস্থানে তুমি নিজে কি দাঁড়াতে পারো? তুমি কি আমার মাঝে তোমার অংশ দেখতে পাও? আমি যে তোমারি একটা অংশ তা' কি তুমি স্বীকার করো? তুমি কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিকট অম্লান বদনে, অসঙ্কোচে বলতে পারো যে তুমিই গঙ্গাবতী? এই যদি তোমার ইচ্ছাকৃত নির্দ্দেশ তবে জীবন ব্যাপি' এত হীন, নিষ্ঠুর খেলা খেল্‌লে কেন? যে জন্তে আমি বাধ্য হলাম তোমার তৈরি নরকে ডুবতে তোমারি হীন চক্রান্তে—সে পথ খোলা, সুগম করনি কেন? তুমি আর যাই হও না কেন, এ কথা তো জানো যে, চার আনায় কারো ওষুধ, পথ্য, খাবার হয় না!

প্রলয়ের ঝাপটা ঝাপটি থেমে গেছে, ছিটে ছিটে বৃষ্টি পড়ছে; লোক চলাচলের সাড়া পাওয়া যায়। গঙ্গাবতী ঘরের ফাঁক দিকে আকাশ পানে তাকিয়ে দেখলে, তারপর ছেলেকে কাঁথা চাপা দিতে দিতে বল্‌লে 'চল্‌লাম শিকারের খোঁজে! ক্ষমা করো দাদা! তুমি জননী নও তাই বুঝতে পারচোনা আমার মনের অবস্থা! তোমাদের দেবতা যে আমায় বাধ্য ক'রেছেন, আমি যে নিরুপায়! ঐ দেখো চেয়ে—বেঁচে আছে কি মরে আছে বোঝা যায় না, এর পরও কি আমার সতীত্ব নিয়ে দম্ভ করা শোভা পায়! তার ওপর তোমাদের সতীত্বের রীতিনীতির প্রতিই যে আমার আস্থা শিথিল হ'য়ে পড়েছে! যে সতীত্বের বিচার হয় দেহ দিয়ে; দুর্বৃত্ত কর্ত্তৃক নিষ্পেষিত যে দেহের পবিত্র আত্মা শত মাথা কুটে, শত

চেষ্টা চরিত্রে আর পবিত্র হ'তে পারে না, বদমাইস, মাতাল, চরিত্র-হীনদের ভোগ, বিলাস, কামের লালসা বিনা আপত্তিতে চূড়ান্ত ক'রে পূর্ণ ক'রবার জন্যে বাজারে ঘর সাজাতে বাধ্য করে ওদের আবার সতীত্ব, সতীত্বের আদর্শ !"

'অভাব তোমাকে অতবড় cynic করে'—

'সে আবার কি ?' গঙ্গাবতী আশ্চর্য্য হ'য়ে তাকালো !

'cynic মানে—মানে, এই—যে; সোজা কথায় হলো যে, সব কিছুকে বিদ্রূপ করে, বিশ্বাস ক'রতে পারে না, মন্দগুলিই দিনরাত ঘাঁটে !'

'শুধু অভাব আমায় এমন ক'রেনি। অভাব যত খারাপ না করে, মানুষ তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করে।

'অপর লোকের প্রতি একথা খাটে কিন্তু তোমার প্রতি একথা একেবারেই খাটে না ! মানুষ তো মানুষ, স্বয়ং ভগবানও তোমায় এ পথে নামাতে পারতেন না যদি না তোমার ছেলে টাকার অভাবে এমনি মরণের মুখে গিয়ে পড়তো।'

'হয়তো তোমার কথাই সত্যি !'

'এ কথা তোমার চেয়ে বেশি সত্যি বলে আর কেউ জানেনা !' রজত একটু অন্যমনস্ক থেকে বলতে লাগলো 'মানুষের জীবনটাই যেন দুনিয়ার মাঝে সব চেয়ে বড় রহস্যময় ! কত জীবন কত ভাবে গড়ে উঠে হঠাৎ একটু ভুলের জন্যে, হয়ত' ঠিক ভুলের জন্যেও নয় কেন জানি কেমন এক অদ্ভুত রূপ নিয়ে দেখা দেয়। এক একটি জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধ্যায়গুলি যত ভাল বা মন্দই হোকনা কেন, পৃথকরূপে বিচার ক'রলে তেমন চোখে ঠেকে না কিন্তু যেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধ্যায়গুলি পাশাপাশি সাজিয়ে দেখা যায় তখন আশ্চর্য্যে হতভম্ব হ'তে হয় ! পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দের একই মাপকাঠি সর্ব্বকাল ও সর্ব্বস্থানের জন্যে

কিন্তু মানুষের জীবন মাঝে মাঝে এমনি ভাবে মোড় ঘুরে কোথা থেকে কোথা চলে যায় যে, নিজেই নিজেকে চিনতে পারে না, বুঝে উঠতেও পারে না ; পাপ-পুণ্যের, ন্যায়-অন্যায়ের, ভাল-মন্দের মাপকাঠি দিয়ে তখন বিচার করা চলেনা ! মানুষ সমাজকে রক্ষা ক'রতে গিয়ে জোর ক'রে বিচার করে, সেজন্যেই সমাজের হয় মস্ত বড় অন্যায়, হয় অপকার।'

—বৃষ্টি থেমে গেছে ! আকাশ শান্ত, নিঝুম রজনীর পরশ জীবন্ত। নিস্তব্ধ রাতের গভীরতামুখী অভিযান দারিদ্র্যপীড়িত কুঁড়ে ঘরখানির প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে জানিয়ে চলছে ! ওই দূরের বিশাল সমুদ্রের বক্ষ-নির্গত শোকতপ্ত চাপা কান্না উচ্ছ্বাস শীতল হাওয়ার মাঝে ওতপ্রোতভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে ! সহনশীলা মাতা বসুমতীও ধৈর্য্য হারিয়ে বসেন, বাতাস কি অত সইতে পারবে ? হয়ত' বা ঝড় উঠলো বলে !···

রজত একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্‌লে 'পথের শেষে যখন ভগবান আমায় টেনে এনেছেন তখন তিনিই আমার হাত দিয়ে একটা পথ বের ক'রে দেবেন। আমি চললাম, নিশ্চয় জেনো যে শুধু হাতে ফিরে আসবো না !'

গঙ্গাবতী হাসলো, হাসির মাঝে ঝরে পড়লো বিষাদ অশ্রু ঝর্ণা !

*

* * * * * * * * * *

রজত বড় দর্প ক'রে বেরিয়েছিল। সে খুব আশা ক'রেছিল যে কিছু টাকা যোগাড় ক'রতেই পারবে ! বম্বে শহরে বহু বাঙ্গালী আছে, বহু বড় বড় কংগ্রেসী পাণ্ডা আছেন, কত টাকাওয়ালা ব্যবসায়ী আছেন। রজতের ধারণা ছিল যে, সে যাবে আর মোটা হাতে টাকা নিয়ে আসবে। বাস্তব ক্ষেত্রে যখন প্রবেশ ক'রলে তখন দেখলে মহারথীদের সঙ্গে দেখা করাই পুণ্যের বহু জোর লাগে। অত পুণ্য সে করেনি !

যাদের নিকট সে মোটা টাকার প্রত্যাশা ক'রেছিল সে স্থানে পেলে indirect অপমান, গা জ্বালানো ন্যাকামো। যত চেনা অচেনা স্থানে গিয়েছে, সে স্থানে যদি টাকার পরিবর্ত্তে অন্ততঃ চার ছ' আনা ক'রেও পেতো তবে পকেট বোঝাই ক'রতে পারতো। আজ সে ভাল ক'রেই বুঝতে পারলে যে টাকার ব্যাপারে সকল সময় ভগবানের মঙ্গল হাত প্রদর্শিত হয় না। বাস্তবের মাঝে সত্য সত্যই অদৃশ্য দেবতার কোন হাত নেই—তিনি কল্পনাতেই বিকশিত, কল্পনাতেই সুন্দর, কল্পনাতেই আশাতীতরূপে পরিস্ফুট। মানুষের সঙ্গে সত্য সত্যই কোন যোগাযোগ নেই। যোগাযোগ মানুষই কল্পনায় গড়ে নেয়। কোন কোন মানুষের কল্পনাটাই সত্যের রূপে ধরা দেয়—তা' হয়ত' সত্যই illusion. সাধনায় মানুষ অনেক শক্তি অর্জ্জন ক'রতে পারে, মহাপুরুষদের অলৌকিক ক্ষমতা ভগবানের দান নয়, সাধনার দান। অভিনয় ক'রতে ক'রতে যেমন মানুষের জীবনটাও অভিনয়ময় হ'য়ে উঠে, অভিনয়ের অঙ্গ সত্যি-কারের জীবনে জড়িয়ে যায় অজ্ঞানে, তেমনি হয়ত' মহাপুরুষের দেবতা।

রজত আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে শ্যামজীর বাড়ির সুমুখে এসে দাঁড়ালো। যাবে নাকি? শ্যামজীর নিকট টাকা সাহায্য—অসম্ভব!··· যাবে বা কোথায়? পরিচিত কংগ্রেস নেতা, শ্রমিক নেতা, কত নেতার বাড়িতেই গিয়েছে। টাকার ব্যাপারে সকলেই সমান। বন্ধুটি বদলি হ'য়ে পুণাতে চলে গেছে। লাল সিং শ্যামজীর কু-নজরে পড়ে চাকরি হারিয়ে অন্যত্র গেছে। এখন উপায়? শ্যামজীকে exploit ক'রলে কেমন হয়?···

রজত ধীরে ধীরে শ্যামজীর বাড়িতে ঢুকে পড়লো। মস্ত বড় বাগান। রাস্তার পাশে সারি সারি সাজানো কাঠ গোলাপ, গোলাপ ফুলের গাছ, কেতকী, যুঁই, গন্ধরাজ, শেফালিকা, কামিনী, ঝুমকা, জহুরী

চাঁপা, মাদার, কলা ফুল—এদেরি পাশে নিচু হ'য়ে আছে অকাল বিধবা যুবতীর রূপ, গন্ধ, রস নিয়ে রজনীগন্ধা, হাসনাহানা।

রজত যখন শ্যামজীর বসবার ঘরে এসে ঢুকলো, তার টাটকা ফুলের সুবাসকে মলিন ক'রে দিলো বিলাতি মদের উগ্র গন্ধ। রজত বসবার ঘরে অপেক্ষা না ক'রে সোজা ভিতরে এগিয়ে গেলো! শ্যামজী মদের গ্লাসটা মুখে তুলে ধরেছেন, হঠাৎ রজতকে অপ্রত্যাশিতভাবে সুমুখে দেখে ভয়ে কেঁপে উঠলেন—মদের গ্লাস কাত হ'য়ে পড়ে গেলো!

'ভাল আছেন তো? নমস্কার!' রজত চেয়ার টেনে পাশে বসলো।

'তুমি—আপনি, এখানে হঠাৎ কি ক'রে, কেন?'

রজত হেসে বল্‌লে 'চাকরির উমেদারীতে। না খেয়ে মরচি, আপনি আমার old boss.'

'Get out please.'

'দোহাই আপনার! You are my father-mother, sir. ছ'দিন যাবত কিছু খেতে পাইনি। বিদেশে এসে কি যে বিপদে পড়েচি'—

'You damn! get out!'

'চাকরি না দিলে যে চলবে না, সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করা যে কত বড় বোকামী—টাকা, টাকা—টাকা ছাড়া আমার উপায় নেই!'

'হুঁ—! কাল দেখা করো, word দিচ্চিনে অবশ্যি!' শ্যামজী মদের গ্লাসে চুমুক দিলেন!

রজত চেয়ারটা নিকটে টেনে নিয়ে বল্‌লে—যাই বলুন, সত্যিকারের life কিন্তু ওই লাল-কালো তরল পদার্থে!

শ্যামজী গোলাকার চক্ষু আশ্চর্য্যে ছানাবড়া ক'রে জিজ্ঞেস ক'রলেন 'Have you ever tasted'—

'Why not ? Surely !'

'Strange !'

'I 've no prejudice !'

'Thank you. I see you're a very goody goody boy. শ্যামজী খুশি হ'য়ে রজতকে একটা গ্লাসে মদ ঢেলে দিয়ে নিজের পাত্রটা পূর্ণ ক'রে নিয়ে এক ঢোকে গিলে জিজ্ঞেস ক'রলেন 'বিয়েকবে ক'রেচো ?'

'Love marriage, my bride is still in her teens, sir,

'Silly boy !'

রজত মোসাহেবের মত তোষামোদ ক'রতে লাগলো, বোতলের পর বোতল মদ শ্যামজীকে ঢেলে দিতে লাগলো। অত্যধিক সুরা পানের পর শ্যামজী আর টাল সাম্‌লাতে পারলেন না, সোফার ওপর ঢলে পড়লেন। রজত তবু ক্লান্ত নয়—সে যে নতুন বিয়ে ক'রেছে, যুবতী নারীর ভরণ-পোষণ ক'রতে পারছে না। শ্যামজী সুন্দরীর বর্ণনা শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে অজ্ঞান হ'য়ে পড়লেন! আশ্চর্য্য মাতালরা! এরা মদ্য পান ক'রে অতি বড় শত্রুকেও খারাপ কাজের সাথী ক'রে নিতে পারে আনন্দে।

শ্যামজী জ্ঞানশূন্য, রজত জোরে জোরে নাড়া দিয়ে পরীক্ষা ক'রলে। শ্যামজীর দ্বারা আর কোন ভয় নেই, রজত দরজাগুলি বন্ধ ক'রে শ্যামজীর পকেট থেকে চাবি নিয়ে বাক্স, সিন্দুক খুলে টাকা অনুসন্ধান ক'রতে লাগলো।

দু'মুঠি দশ টাকার নোট কাপড়ের খুঁটে বেঁধে বাক্স, সিন্দুকগুলি বন্ধ ক'রে শ্যামজীর পাশে এসে দাঁড়ালে! প্রতিশোধের উত্তেজনা সংস্কারকে ছেয়ে উঠলো; অপ্রহিত প্রয়োজন মানসিক সুবৃত্তিগুলিকে দাবিয়ে

রাখলো—সে জন্তেই রজত হো-হো ক'রে বিজয়ের হাসি দিতে গিয়ে সংশয়, দ্বিধা, পাপের ভয়ে কেঁপে উঠলো, মুখখানি ছাই-বর্ণ হ'য়ে গেলো। শক্তি, সাহস হারাবার পূর্ব্বে দৌড়ে জানালার পাশে গেলো। কালো আকাশ, জমাট-বাঁধা নীরবতার বীভৎসতার বিদ্রূপ! রজত ভ্রূক্ষেপ ক'রলো না, জানালা গলিয়ে নীচে নেবে গেলো।

অন্ধকার বিশ্রী রাতে বাগানে কেউ নেই। নিদ্রিত পুরী, বাড়ির লোকগুলি মৃদু শীতল ফুর্‌ফুরে হাওয়ায় আলস্যে বিছানায় ঢলে পড়েছে। রজত সাবধানে দে'য়াল টপ্‌কে রাস্তায় নেমে গেলো। একটি লোকও তার সাড়াশব্দ পেলো না।

শরীর তার কাঁপছে, শরীর শিথিল হ'য়ে পড়েছে, যত তাড়াতাড়ি যেতে চায় ততই যেন পিছিয়ে পড়ে! ঐ শ্যামজী মোটরে ক'রে আস্‌ছেন, পুলিশ আস্‌ছে; ধরে ফেল্‌লো! কোনভাবে যদি গঙ্গাবতীকে টাকাগুলি দিয়ে পালাতে পারে তবে আর কোন ভয় নেই! গঙ্গাবতীকে বাঁচিয়ে সে কৃত অপরাধের জন্তে জেলে হাসিমুখে পচতে পারে।

ভীত, কম্পিত মনে যেমনি রাস্তা পাড় হ'তে যাবে অমনি হঠাৎ একটি দোতালা বাস হর্‌ণ দিতে দিতে তার ওপর এসে পড়লো! যাত্রীরা বিকট কলরব ক'রে উঠলো!

মৃত্যুমুখী রজত প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলে—'টাকাগুলি গঙ্গাবতীকে দিয়ে দিও! গ-ঙ্গা ব-তী!...'

মোটরের ব্রেক কসার ভয়াবহ শব্দে, যাত্রীদের কলরবে রজতের শেষ অনুরোধ দলিত, পিষিত, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেলো!...

— কুড়ি —

গঙ্গাবতী পেশাদার ভিখারিণী! ভিক্ষা ক'রতে বহুবার চেষ্টা ক'রেছিল—কোনবার কৃতকার্য্য হতে পারে নি। মুষ্টি ভিক্ষায় পেট চলে কোন ভাবে, অভাব মোচন হয় না। ভিক্ষায় যা' পেতো তা'তে খাওয়া চলতো, ছেলের চিকিৎসা চলতো না, অসুস্থ শিশুকে সঙ্গে ক'রে ভিক্ষা ক'রতে গিয়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হ'য়েছিল—এর পর কি ভিক্ষে করা চলে, না সংস্কার বাঁচানো যায়! শিশু যখন মৃত্যুশয্যায় ঢলে পড়ে—তখন কাঁটাময় চাবুক গঙ্গাবতীর ওপর সপাং সপাং ক'রে ঘা মারতে থাকে, চাবুকের তাড়ায় বাধ্য হ'য়েছিল সতীত্বের দর্প, স্পর্দ্ধা চূর্ণ ক'রতে। সে দর্প চূর্ণ হলো, ঘূর্ণিহাওয়ায় উড়ে চল্‌লো; কোথায় কেউ জানতো না, কেউ বুঝতো না। হঠাৎ দেখা গেলো—রাস্তায় এক বৃদ্ধা থম্‌কে থম্‌কে চলেছে, দাঁড়ায় দোরে দোরে, হাত পাতে, কি যেন বলে! তার আলোড়নে বাতাস কাঁপে, ইথার কাঁপে, নীলাকাশে কাল রেখা ছড়ায়। কি বিশ্রী রেখা! কি নিকষ-কালো রূপ! কি ভয়ঙ্কর, ভয়াবহ! কেউ জানে না, কেউ বুঝে না! ইতিহাস নেই, কথিত গাঁথা নেই, স্মৃতিপট নেই। আছে শুধু মহাশূন্য আকাশ। থাক্, সেইখানেই থাক্! যার যেথা স্থান—সেইখানেই জমা হ'য়ে থাক্। গঙ্গাবতীদের দীর্ঘনিঃশ্বাস সেইখানেই জমা হচ্ছিল, এখনও হচ্ছে, হ'ক না ভবিষ্যতে! হবে যখন হ'ক। একদিন কি শূন্য আকাশ ভরে যাবে না, একদিন কি স্পন্দনে স্পন্দনে আলোড়িত হবে না! হবে,

নিশ্চয় হবে। আলোড়িত হবে, ঘর্ষণে হবে বিদ্যুৎ। সে বিদ্যুৎ কি ক্ষমা ক'রবে? কখনও ক্ষমা ক'রবে না। অবিচার, অত্যাচার, পক্ষপাতিত্ব ধ্বংস ক'রবে। প্রতিশোধ নেবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস ক'রে। সৃষ্টি ক'রবে নতুন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সৃষ্টি ক'রবে নতুন ব্রহ্ম।

গঙ্গাবতী ভিক্ষা করে। ব্যবসা ভালই চলেছে, প্রথম অবস্থায় ব্যবসা বড় মন্দা চলেছিল, এখন ভেক ধরা শিখেছে, কায়দা কানুন, অভিনয়, খুব ভাল ক'রে শিখে ফেলেছে। যখন যে রূপে সাজতে হবে ঠিক সে রূপে নিখুঁতভাবে সাজতে পারে। তাকে সর্ব্বত্রই মেলে, ঠিক সেস্থানের উপযুক্ত ভূষণে। কি নিখুঁত তার মুখোস! এর পূর্ব্বে কেউ অর্থলোভে জোরজবরদস্তিতে একটি মিথ্যা কথা বলাতে পারে নি, এখন সে নিজের থেকে পট্ পট্ ক'রে মিথ্যা কথা ঘটা ক'রে বলে, একটুকু সঙ্কোচ বোধ করে না, একটুকুও মুখে বাধে না। সত্য মিথ্যার কোন পার্থক্য নেই, যখন যেখানে যা বলা কার্য্যকরী হবে তাই বলে বসে, এখন আর মনে মনে ভাবতে হয় না। লোককে ঠকিয়ে, মিথ্যা কথায় ছলিয়ে অন্তরালে শ্লেষের হাসি হাসে না, জয়ের গৌরব অনুভব করে না, তত হীন হ'তে পারে নি, অবশ্য অনুতপ্তও হয় না। তার ধারণা এই চরম পথ, এই শেষ পথ এদের মত লোকের।

লোকের মন আকৃষ্ট ক'রবার জন্যে আকর্ষণীয় ঢঙ করে, করুণা উদ্রেক করে কথার সৌন্দর্য্যে, দয়া অনুগ্রহ আনে বিষাদ অভিনয়ে। গঙ্গাবতীর অভিনয় প্রায় সকলই সত্য বলে বিশ্বাস করে, তার রঙ বেরঙ দেওয়া কথা শুনে অনেকে দাঁড়িয়ে পড়ে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটি পয়সা না দিয়ে পারে না, কোমলহৃদয় লোকেরা গোপনে অশ্রু ফেলেন। মর্ম্মস্পর্শী মিথ্যা কথা, এত সুন্দর, এত নিখুঁত মিথ্যার অভিনয় বুঝি ইতোপূর্ব্বে কেউ ক'রতে পারে নি।

কখনো ভিক্ষে ক'রতে বের হয় অন্ধ সেজে ; কখনও চলে হাতড়িয়ে, ঠেকে ঠেকে ; কখনো খোঁড়া সেজে চলে খুঁড়িয়ে, কখনো হয় মূক ; মাঝে মাঝে হয় বধির, আবার কখনো হয় অন্ধ খোঁড়া দুই-ই। লোকচরিত্র বোঝে ভাল; লোকের চেহারা দেখেই বুঝতে পারে সে কি ধাতের লোক তাই সে নিখুঁত অভিনয় ক'রতে পারে। দুর্ব্বলচিত্ত লোকের নিকট ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে-কুটে ভীষণ অবস্থা সৃষ্টি ক'রে দেয়। বলে চলে—তার স্বামী রোগে শয্যাগত, মর মর অবস্থা ; টাকার অভাবে না হচ্ছে চিকিৎসা, না পড়ছে ওষুধ পথ্য ; চারটি সন্তান না খেতে পেয়ে মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে, লতাপাতা খেয়ে আর কতদিন বাঁচতে পারে, না খেতে পেয়ে মারা যায় যায় অবস্থা। একদানা খাবার নেই যে, কারও মুখে তুলে দিতে পারে।···প্রমত্ত প্রেমিকাকে যুবকদের মাঝে বা যুবতীদের মাঝে চালিয়াৎ প্রেমিক যুবককে বেশি বক্তৃতা দিতে হয় না—যুবতী পয়সা দিলে যুবকরা বেশি ক'রেই পয়সা দেয়, আবার যুবক পয়সা দিলে যুবতীরা যুবকের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ফিস্ ফিস্ ক'রে কানাকানি করে—অনিচ্ছা সত্ত্বেও পয়সা দিতে বাধ্য হয়। প্রৌঢ়মহলে যুবকদের নিকট প্রথম ভিক্ষা চায়, যুবক ভদ্রলোকদের সুমুখে নিজেকে উন্নত ক'রবার জন্যে বা প্রৌঢ়দের অবস্থা অসুবিধাজনক ও বিশ্রী (awkward) ক'রে দেয়—তখন প্রৌঢ়রা মনে মনে যুবকের মুণ্ডপাত ক'রে গঙ্গাবতীকে ভিক্ষা দিতে বাধ্য হয়। গঙ্গাবতী মানুষের দুর্ব্বলতা কোথায় কোন স্থানে বোঝে, সর্ব্বদা দুর্ব্বলতার সুবিধে নেয়। প্রগতি আন্দোলনে মত্তা নারীদের নিকট বলে স্বামীর অত্যাচার—পুরুষের অত্যাচার। স্বদেশী আন্দোলনের নরনারীদের নিকট বর্ণনা করে—মিলের অন্যায় অবিচারের কাহিনী, অর্থশালী ক্ষমতাশালী লোকদের বলে পীড়নের কাহিনী।···গঙ্গাবতী জীবন-কাহিনী বলতে বলতে ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদে, কখনও পেঁচিয়ে বলে বানানো বীরত্ব কাহিনী যে, সে

অবস্থাপন্ন ঘরের বউ ছিল, রোজগারে স্বামী মৃত (বা নিরুদ্দেশ) উপযুক্ত ছেলেরা মাসাধিক যাবত শয্যাগত, এতদিন জিনিষপত্তর বাঁধা বন্ধক দিয়ে, বেচে কোন ভাবে চিকিৎসা, পথ্য করিয়েছে, এখন আর একটি যায় যায়, কখনো বলে স্বামী সমাজের ভয়ে ঘরে নিতে চায় নি—তাই তার এ দুরবস্থা। এতদিন শক্তি ছিল, গতর খেটে পেট চালিয়েছে, এখন আর গতর খাটাবার শক্তি নেই, কেউ কাজ দেয়ও না—তাই তার ভিক্ষে মাত্র সম্বল ; পোড়া রূপযৌবন নিয়ে কি কম ভুগতে হ'য়েছে, কত কষ্টে যে সে আত্মরক্ষা ক'রেছে তা' একমাত্র ভগবান জানেন।…চরিত্রহীন, মাতাল, ক্ষমতাশালী লোকদের ভয়ঙ্কর হাত থেকে কি ক'রে রক্ষা পেয়েছিল, কি ক'রে ওদের চাবকিয়ে, পদাঘাত ক'রে আত্মরক্ষা ক'রেছে, তা' বর্ণনা ক'রতে ক'রতে বৃদ্ধ বয়েসেও ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠে, হাত পা' নেড়ে তাড়া করে, স্তিমিত নয়ন থেকে বহ্নিশিখা বের হয়। বীরত্ব-কাহিনী সত্য বলে এত আকর্ষণীয়, এত সুন্দর, এত হৃদয়স্পর্শী হয় যে, শ্রোতারাও উত্তেজিত হ'য়ে পড়ে। বউ-ঝিরা গঙ্গাবতীকে ছাড়তে চায় না, খুঁটে খুঁটে কেবল কথা শুনতে চায়, ছেলেমেয়েরা যেমনি দিদিমার নিকট রূপকথা শোনে এবং সর্ব্বদা রূপকথা শুনতে চায়—তেমনি বউঝিরা গঙ্গাবতীর নিকট গঙ্গাবতীর জীবন-কাহিনী শোনে এবং অন্যদিন আসবার জন্যে অনুরোধ করে। ধার্ম্মিক লোকরা রাগে, দুঃখে কেঁদে ফেলেন, এ কাহিনী শুনে কঞ্জুসরাও পয়সা না দিয়ে থাকতে পারে না।

গঙ্গাবতীর দিন বেশ ভালই চলেছে অর্থাৎ খাওয়া-পরা অস্বচ্ছলের রাজ্যে বেশ স্বচ্ছলভাবেই চলেছে। তার মস্ত বড় অসুবিধে যে ছেলেকে কারও নিকট একদণ্ডের জন্যে রাখবার উপায় নেই। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বের হ'তে হয়, যে দিন ঝড়বাদল নামে কিম্বা বেশ ঝাঁঝাঁলো রোদ উঠে—সেদিন ছেলেকে নিয়ে রাস্তায় বেরুতে সাহস পায় না ; শীতকালে

কাঁথা চাপা দিয়ে চলতে পারে। খাওয়া-পরার দুঃখ নেই তার, দুঃখ হলো ছেলেকে নিয়ে। এতটুকু ছেলে কোথায় সুখে স্বচ্ছন্দে আরাম ক'রে দিন কাটাবে—তা' না তাকেও গঙ্গাবতীর সঙ্গে সঙ্গে দোরে দোরে ভিক্ষা ক'রতে যেতে হয়। মস্ত বড় মর্ম্মান্তিক প্রশ্ন জাগে যে অবুঝ শিশুর ভিক্ষে ক'রতে যাওয়া কি অভিশাপ নয়? শিশু কি অভিশাপের জন্তে মনে মনে বিদ্রোহ করে না? কিন্তু উপায় কি? তার যে দু'দিকেই পথ বন্ধ, বাড়ি রেখেও যাওয়া যায় না—অথচ সঙ্গেও নেওয়া চলে না। সঙ্গে নিতে হয়, নতুবা খালি বাড়িতে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যেতে হয়। ছেলে কখনো ঘুম থেকে জেগে উঠে, একা একা কাঁদে, আবার ঘুমায়, কেউ দেখবার নেই। নেই কোন বন্ধু, নেই কোন দরদী, কেউ নেই ব্যথার ব্যথী, নেই কেউ একদণ্ডের সাহায্যকারী।

বলিষ্ঠ ঋজু দেহ দুর্ব্বল বঙ্কিম হ'য়ে গেছে, চুল হ'য়েছে রুক্ষ কটা জটা, নয়ন হ'য়ে গেছে অতি স্তিমিত, আঁধারে হয় দীপ্তিহীন—যাকে কথিত ভাষায় বলে রাতকানা। শক্তি সামর্থ্য নেই, কুঁজো হ'য়ে চলে, বেশিক্ষণ এক স্থানে দাঁড়াতে পারে না—লাঠি ভর ক'রে পন্ পন্ ক'রে কেবলই চলে। ক্রমাগত আঘাত পেয়ে মেজাজ হ'য়েছে বড় রুক্ষ কর্কশ, কথা বেচে জীবন চালাতে হয় বলে বাজে পাঁচালীর ঝর্ণা হ'য়ে পড়েছে, সবারই সঙ্গে বেশি বেশি ক'রে কথা বলায় এখন এমন স্বভাব হ'য়েছে যে, আপন মনে দিন রাত্তির একা একা বিড়্ বিড়্ ক'রে কত কি কথা বলে, কত কাহিনীর হয় পুনরাভিনয়। গঙ্গাবতীর হাবভাব দেখলেই মনে হবে যে তার মাথার ঠিক নেই, পাগল বল্‌লে অতিরিক্ত হবে না; তবে তার স্বার্থপর কার্য্যকলাপে দৃঢ়তা আছে, বিচারবুদ্ধি আছে, সুখশান্তির মাঝে বেঁচে থাকবার একটা নির্দ্দিষ্ট প্রণালী আছে। তার কাজে কর্ম্মে, ব্যবহারে, হাবভাবে বেশ স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, সে বড় স্বার্থপর। তার

স্বার্থপরতা পাগলামির দোষে আত্মগোপন ক'রে আছে—গঙ্গাবতী বজ্রের মত দৃঢ়, এগিয়ে চলতে চায় অপ্রতিহত শক্তিতে, এই চলাকে জয়মণ্ডিত ক'রবার জন্যে জীবন ক'রেছে পণ। এতদিনে সে সুখের পথ পেয়েছে—চিরজীবন উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে এতদিনে প্রকৃত পথ পেয়েছে। এই তার ঠিক পথ, এই তার জয়মণ্ডিত হ'বার সহজ সোজা শেষ পথ। এখন নেই যৌবনের বিপত্তি, এখন নেই স্বামীর অত্যাচার, এখন নেই বিধাতার ক্ষুদ্র মনের পাপময় প্রভাব, এখন নেই প্রকৃতির ঘাতপ্রতিঘাত। যেমন পাহাড়, জঙ্গল, নদীর ওপর তৈরি পথে রেলগাড়ি নির্ভিকভাবে অতি সহজে চলে—তেমনি সেও তৈরি পথে অপ্রতিহতভাবে চলে। দৈহিক শক্তি নেই, তাই মনের আশ মেটে না। জীবনে একটিমাত্র তার উদ্দেশ্য, একটি মাত্র কারণে তার খাওয়া-পরা, চলা-ফেরা, কাজকর্ম্ম, বেঁচে থাকা। হীন লোক যেমন স্বার্থের জন্যে অম্লানবদনে, নিঃসঙ্কোচে অপরের গলায় ছুরি চালায়—ঠিক তেমনি সে অপরের সর্ব্বনাশ ক'রতে পারে নিজের স্বার্থে।

আশ্চর্য্য রূপ গঙ্গাবতীর! সে রাত্রি চায় না, রাত্রি যে পৃথিবীকে অচেতন ক'রে রেখে বহু শক্তি অপব্যয় ক'রে দেয়। চায় সে আলোক, চায় দিন। চায় অবিরাম কার্য্য-কোলাহল নতুবা যে তার রোজগার বেশি হ'তে পারে না।…কত বড় পার্থক্য তার অতীত ও বর্ত্তমান জীবনের মাঝে! যৌবনে সে চাইতো অবকাশ প্রেমের মধু-মিলন হেতু, পর অধ্যায়ে চাইতো বিশ্রাম সন্তানের জন্যে। সে সন্তানকে আদর, সোহাগ, সেবা শুশ্রূষা ক'রতে পারেনি। সে চোখের সামনে দেখেছে যে, নিকৃষ্ট জীব সন্তানকে ক'রছে স্নেহদান, ক'রছে আদর, ক'রছে সেবা আর সে সন্তানের মুখে অহিফেন মিশানো বিন্দুমাত্র দুধ দান ক'রে পাষাণীর মত চলে গেছে গতর খাটাতে। তখন—ঠিক তখন, যখন তার ছিল প্রেমময়

যৌবন, ছিল দারিদ্র্য-পীড়িত সন্তানের দল তখন যে মুহূর্ত্তের অবকাশের জন্যে মাথা কুটে মরেছিল।...

গঙ্গাবতী বেশি রোজগারের লোভে শহর ছেড়ে বন-বনানী, প্রান্তর অতিক্রম ক'রে পল্লীতে পল্লীতেও যায় ভিক্ষে ক'রতে। সীমাহীন দিক্‌চক্রবালের কালো যবনিকার অন্তরাল থেকে ধেয়ে-আসা কালবৈশাখী কত প্রলয় দোলা দিয়ে যায় তার ওপর দিয়ে। কতবার সে নিরন্ধ্র অন্ধকারে দুর্ভেদ্য বনে ঝড়ের মাঝে পথভ্রান্ত হ'য়েছে। কতবার সে সন্তানকে রক্ষা ক'রে নিজে আহত হ'য়েছে কাঁটার বনে, ঝড়ে ভেঙ্গে পড়া ডালপালায়; কতবার সে ভীত সন্তানকে বুকে চেপে ধরেছে যখন সন্তান আলোর প্রবেশ নিষিদ্ধ স্যাঁৎসেতে ঝোপের ওপর হঠাৎ বজ্রপাতে ঝল্‌সে পড়া বিদ্যুতের উগ্র, প্রখর আলোক শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে' বনের লতা, প্রাচীন বৃক্ষের শিকড়গুলিকে সাপের মত যেন কিলবিল ক'রে ঝল্‌সে দিয়েছে দেখে 'ভূত, সাপ' বলে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠেছে। ০ ০ ০

নারী-জাতির ইতিহাস যদি দেখা যায় তবে আশ্চর্য্য হ'তে হয় দুর্ব্বোধ্য মাতৃরূপ দেখে। এই নারী-জাতি কত নগণ্য, কত তুচ্ছ, কত সাধারণ পুরুষের শক্তি, সামর্থ্য, দান ও বৃহত্তর জীবনের তুলনায়! অথচ এই নারীই কত বড়, কত রহস্যময়ী, কত বিপর্য্যয়ময়ী, কত দুর্ব্বোধ্যময়ী, কত উচ্চ স্তরের প্রাণী মাতৃরূপে। জননী পুত্রের জন্যে প্রাণ দিয়েছে, কলঙ্ক নিয়েছে, অসহ্য দুঃখকষ্ট সহ্য ক'রেছে, পুত্রের জন্যে তিলে তিলে ধ্বংশ হ'য়েছে, এমন কি নিজের দেহ পর্য্যন্ত বিলিয়ে দিয়েছে।

গঙ্গাবতী পুত্রের জন্যে কি-না ক'রেছে? টাটকা রক্ত জল ক'রেছে, অবর্ণনীয় পীড়ন সহ্য ক'রেছে, তিলে তিলে দগ্ধ হ'য়েছে, বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে সন্তানের মুখে, মিথ্যে কথা বলেছে, চুরি জোচ্চরি ক'রেছে,

হীন কাজ ক'রেছে, প্রয়োজন হ'লে খুনও ক'রতে পারতো, এমন কি সতীত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে টাকা রোজগার ক'রতে চেষ্টা ক'রেছিল! সন্তানের জন্যে কত হীন কাজ সে ক'রেছে। পূর্ব্বে তার মনে পাপ-পুণ্যের, ন্যায়-অন্যায়ের, ভালমন্দের সংশয় জাগতো প্রতি পদক্ষেপে, এখন অপত্য-স্নেহ তাকে ক'রেছে অন্ধ, বধির, জড়।

তার এত বড় অধঃপতন কেন হ'লো? কেন সে এত নীচ, এত হীন, এত কূট, হেয় স্বার্থপর হ'লো? যার স্থান ছিল দেবীর আসনে—সে কেন পাপীয়সীর আসনে স্বেচ্ছায় নামলো? এত বড় ব্যবধানে না হয় আত্মশোচনা, না হয় গ্লানি, না হয় অনুতাপ, না বোধ করে সঙ্কোচ; বরঞ্চ যুক্তিতর্কে শ্রেষ্ঠ বলেই মনে করে, এ পথই বরণীয় বলে বিশ্বাস করে। তার মত অবস্থার লোকদের এই ভাল পথ। সর্ব্বদা প্রার্থনা করে এমনিভাবে যেন জীবন কাটে। তার নেই ব্যক্তিত্ব, নেই কোন চাহিদা, নেই কোন ছোট বড় অভিলাষ। সে জানে, তার দৃঢ় ধারণা যে, সে ধরার মানুষ নয়, তার দেহ আছে, নেই প্রাণ, নেই মন বিবেক; তার চেতনা নেই, কোন অনুভূতিও নেই। যদি তার এত বড় বিচ্ছেদই হয় তবে কি ক'রে সে বাঁচে? ঘোর উন্মাদের কি অত বড় বিচ্ছেদ ঘটে? তার ছেলে ত' বেশ বড় হ'য়েছে, তবে আর কেন? এ প্রশ্ন কি তার মনে জাগে না? এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, কিন্তু প্রশ্ন ত' তৈরি হ'তে পারে না—যদি প্রশ্নের পূর্ব্বেই উত্তর জন্মে। রাজার কি অন্ন-সমস্যা হয়? ০ ০ ০ মাতৃত্ব গঙ্গাবতীকে সকল সমস্যার বাইরে নিয়ে এসেছে। তার নিকট আর কোন সমস্যা জাগে না, আর তাকে ব্যতিব্যস্ত করে না, দিবানিশি কণ্টক শয্যায় শায়িত ক'রে নরক-যন্ত্রণা দেয় না। তার নিকট কোন প্রশ্ন নেই, কোন সমস্যাও নেই—সে সকল সমস্যার বাইরে চলে গেছে।

কিন্তু আমায় বলবে কে? আমার প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? আমার দুর্ব্বল মনে প্রশ্ন জাগছে, এ পাপ—না পুণ্য? এ ন্যায়, না অন্যায়? এ ঠিক না ভুল? এ ভাল, না মন্দ? একি দু'য়ের মধ্যবর্ত্তী, না সব কিছুর বাইরে? এ কি চিরন্তন সমস্যা হ'য়ে রইলো?

গঙ্গাবতী প্রকৃত পক্ষে পাগল নয় লোকে পাগল বলে, ছোট ছেলেমেয়েরা পাগল মনে ক'রে ক্ষেপায়। গঙ্গাবতীর চেহারা দেখে ছেলেমেয়েরা প্রথম প্রথম ঠাট্টা ক'রতো, একে বেঁকে:চলার অনুকরণ ক'রে আমোদ ক'রতো, গঙ্গাবতী কোন ভ্রূক্ষেপ ক'রতো না। কিন্তু যার মাথায় একটু ছিট আছে তাকে সর্ব্বদা ক্ষেপালে চটে যায়, কথার প্রতিবাদ করে, ঝগড়া ক'রে দুষ্ট ছেলেদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়। এমনি বাদ প্রতিবাদে ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো হ'য়ে দাঁড়ায়।

এক প্রকার লোক আছে, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, কি বালক, কি ধনী, কি গরিব, কি উচ্চ নীচ—তারা অপরকে ক্ষেপিয়ে গালাগাল শুনে খুব কৌতুক পায়, অশ্লীল কথা শুনে খুব আমোদ পায়। আজ অনেক দিন পরে একটি কথা মনে পড়লো। একদিন ক'লকাতায় শ্যামবাজারের কোন এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়েছিল একটি আবেশময় কোলাহল। আমোদের কারণ ছিল একটি অৰ্দ্ধ উলঙ্গ পাগলিনী। পাগলিনীকে নিয়ে দুষ্ট লোকরা মজা ক'রছিল। একটি পড়া মাঠ, চারধারে ভদ্রলোদের বাড়ি, বহু ভদ্রলোক ছেলেমেয়েসহ মজা দেখছিলেন, কেউ কোন প্রতিবাদ করেন নি—বরঞ্চ উৎসাহ দিচ্ছিলেন। উত্যক্ত হ'য়ে একবার ওদের মনের আশ পূরণ করলো—ছিন্ন বস্ত্রখানি অপসারিত ক'রে অশ্লীল ভঙ্গিমা করলো। একটি পরিবার সে অশ্লীল দৃশ্য লজ্জারক্ত নয়নে নিরীক্ষণ ক'রছিল। ছেলে-মেয়েসহ দেখবার দৃশ্য বটে! এরা কি জানতেন না পাগলের স্বভাব? এ পাগলিনীটি কি এ পাড়ায়

নতুন এসেছিল ? থাক্ এ সব ঘরের কালিমা ! এ প্রকৃতির সর্ব্বনেশে লোকেরাই মানুষের মহা সর্ব্বনাশ করে। ভাল মানুষকে এরাই পাগল ক'রে দেয়। লোকই লোককে পাগল করে বেশি, বহু ভদ্রলোক নির্লিপ্ত ভাবে পাগল ক'রবার সাহায্য করেন।

লোকের অনিচ্ছাকৃত চেষ্টায় গঙ্গাবতী সত্যই পাগল হ'য়ে পড়লো, অবশ্য তার উদ্দেশ্য থেকে এক পা'ও সরে পড়ে নি। গঙ্গাবতী ভাবের পাগল নয়, কোন দাগার পেষণেও পাগল হয় নি, ব্যক্তিগত বা প্রকৃতির দৈব ঘটন অঘটনেও পাগল হয় নি। তার ওপর দিয়ে যে ঝড়োহাওয়া বয়ে গেছে তা'তে পাগল বা আত্মঘাতী হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। দুরাত্মাদের চেষ্টা চরিত্রে পাগল হয়ত' হতো না। কিন্তু নারী-চরিত্র একটু আলাদা ধরণের। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে পুরুষ যত বেশি বেপরোয়া হয়, মানসিক শক্তি হারায়—নারী তত হারায় না। এর একটা প্রধান কারণ—নারীদের দায়িত্বজ্ঞান অতি ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ। ঝড়ো-দোলায় লতা হেলে-দুলে কখনও এক বৃক্ষ থেকে অপর বৃক্ষে আশ্রয় ক'রে বাঁচে, খুব বড় রকম হলে মাটি আঁকড়ে লতিয়ে চলে, মরতে হয় না, কিন্তু বৃক্ষরাজ অন্যকে আশ্রয় ক'রে বাঁচতে পারে না বা হেলে-দুলে ঝড়কে এড়িয়ে মাটি আশ্রয় ক'রে ত্রাণ পায় না।···আর্থিক বা প্রিয়জন বিয়োগে অল্প নারীই উন্মাদ হয়, কারণ ওদের sentiment খুব প্রখর ও ক্ষণস্থায়ী। এরা যত সহজে মুশড়ে পড়ে—আবার তত সহজে উঠে পড়ে। এরা জলের মত বাতাসের দোলায় অতি সহজে উঠে দোলে, আবার অতি সহজে শান্ত হয়, সহজ হয় বাতাসের প্রভাব দূর হ'তেই। নারীরা চরিত্র হারিয়ে, এমন কি বেশ্যা হ'য়ে যখন অনুতপ্ত হয়—তখন অনুতাপের দাহনে পাগল হয় না। এরা ক্ষমতার সীমা অতিক্রম ক'রে মাথা খেলায় বা শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য রক্ষা ক'রে চলে বলে

পাগল হয় না এলোমেলোতে, এরা পাগল হয় অতি তুচ্ছ কারণে, অতি নগণ্য কারণে। এখানে আমি অশিক্ষিত কুসংস্কার-অন্ধ নারীদের কথা বলছি · প্রধানতঃ। পাগলতত্ত্ব লেখার উদ্দেশ্যে এত কথার ভনিতা করি নি, হয়ত' চিকিৎসাশাস্ত্র একেবারে মূল্যহীন ক'রে দিতে পারে—কারণ বহু কারণেই পাগল হয়—যা' আমি বাদ দিয়েছি, প্রকারান্তরে অস্বীকার করাও হ'য়েছে, অবশ্য সমস্ত জানিও না। পাগলতত্ত্ব যখন নয়, তখন গঙ্গাবতী কেন পাগল হলো এবং নারীরা কেন পাগল হয় তা' বলায় জবাবদিহি ক'রতে হবে না। তবে যে কথা বলেছি তা' কেউ বাস্তব উদাহরণে নিজের অভিজ্ঞতা অস্বীকার ক'রে আমায় জবাবদিহি ক'রবেন না—এ জোর আমার আছে।

উপরি উপরি তিন চারটি উপযুক্ত সন্তান হারিয়ে, স্বামীকে হারিয়ে, মস্ত বড় আঘাত পেয়েও নারী উন্মাদ হয় না, একবেলা খাবারের সংস্থান নেই—তবু বাঁচে, তবু সংসারী হয়, এমন উদাহরণ একটি দু'টি নয়—বহু বহু উদাহরণ আছে। এমন অবস্থায় পুরুষ পাগল হ'য়ে যায়, সংসার-ত্যাগী বৈরাগী হ'য়ে যায়, আত্মহত্যাও করে। নারীর বাইরের দিকটা ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে যায়, আলোছায়ায় আবার ধীরে ধীরে ভাল হ'য়ে পড়ে—কিন্তু পুরুষদের ভেতর ক্ষত-বিক্ষত হয়, বাইরে থেকে বোঝা কঠিন, হঠাৎ দেহ ধ্বংশ ক'রে দেয়—তখন আর প্রতিকার চলে না। দর্শন শাস্ত্রের দিক থেকে দেখতে গেলে এ বিষয়ে নারীরা পুরুষের চেয়ে উঁচুতে।

ঘাতপ্রতিঘাতে গঙ্গাবতী পাগল হয় নি। তার মাথার দোষ কি ক'রে হলো তা' অতি তুচ্ছ, অতি সাধারণ। অথচ এই তুচ্ছ সাধারণ কারণে শত শত নারী পাগল হয়। আমি অন্যধারার পাগলদের কথা বলছি নে, হয়ত' অনেকে ভীষণভাবে চটে উঠে পাগলতত্ত্ব বই নিয়ে ছুটে

আসবেন—ভুল সংশোধন করাতে। আমি বলচি সাধারণ পাগলদের কথা—যারা পথে ঘাটে ঘুরে ফেরে, খাওয়া-পরা কোন ভাবে চালায়, চেষ্টাও করে, বেশি কথা বলে, রাস্তাঘাটে ঝগড়া-বিবাদও করে। যেমন গঙ্গাবতী রাস্তায় বের হয় ভিক্ষে ক'রতে, নিত্যি ঝগড়া-বিবাদ করে লোকের সঙ্গে, পাগলের মত বাজে কথা বলে, পাগলের মত ছটফট করে, নানা ভঙ্গিমা করে আপন মনে।

গঙ্গাবতী একটু বেশি কথা বলতো, কেবলি ছট্‌ফট্‌ ক'রতো, কোথায়ও একদণ্ড চুপ ক'রে থাকতে পারতো না, মেজাজ হ'য়েছিল রুক্ষ, মনোমত কথা না হলেই ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলতো, সব কথাতেই কথা বলতো—হয়ত' কি কথা হচ্ছিলো তা' জানতো না। সব্বাই গঙ্গাবতীকে বেশি কথার জন্যে, সরদারী স্বভাবের জন্যে, অল্পেতে ক্ষেপে যাওয়াতে—ধমকাতো, ছেলে বুড়োরা তাই নিয়ে হৈ-হৈ ক'রে উঠতো, টিট্‌কারী দিতো—আর গঙ্গাবতী তেলে-বেগুনের মত জ্বলে উঠতো। গঙ্গাবতী একা সকলের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারতো না, তাই অবস্থা দাঁড়াতো আরও সঙ্গীন।

হয়ত' কতিপয় লোক সমাজের কোন একটা কলঙ্কের বা কারও নিন্দা ক'রছে—এমন সময়ে গঙ্গাবতী চুপ ক'রে এসে পাশে দাঁড়ায়। ভাল ক'রে সব বিষয় শোনে নি, হঠাৎ বলে বসে—'কিষণের কথা বলচো? ওর মত লোকের শাস্তি হওয়া উচিত। বউটার প্রতি এত অত্যাচার করে—'

'চুপ কর্‌ মাগী! বুঝুক বা না বুঝুক—সব কথাতে ভেঁ-ভেঁ করা চাই।'

বস্তির মধ্যে একজন মাতব্বর লোক বলে' গঙ্গাবতী প্রতিবাদ ক'রতে সাহস পায় না, মুখ কালো ক'রে চুপ করে যায়। লোকের শ্লেষ হাসিতে মনে মনে চটে যায়। কোনদিন মনে মনে বিড়্‌ বিড়্‌ ক'রতে ক'রতে

সরে পড়ে, কোথাও গিয়ে বকাবকি ক'রে মনের ঝাল মেটায়, কোন কোন দিন দাঁড়িয়েই থাকে, হঠাৎ আবার প্রতিবাদ করে—'যত দোষ সব ওর না? ও মেয়েমানুষ কি না, তাই যত অন্যায়, যত দোষ সব ওর হ'য়ে গেল। যত সব সাধুর দল এসে জুটেছে!'

'ফের আবার কথা বলিস্!'

'বল্‌বে না! পক্ষে না বল্‌লে যদি টাকাকড়ি ধার না দেয়, সাহায্য না ক'রে।'

গঙ্গাবতী বলে—'আমি কাউকে খাতির ক'রে কথা বলিনে, হুঁ-উ! উচিত কথা বলতে বাপকেও ছাড়ি নে। এ আর কেউ নয়, হুঁ-উ।'

'কি আমার উচিত বক্তা রে! সারা জীবনটা ত' ছেনালী ক'রে কাটালি, বুড়ী হ'তে চল্‌লি তবু লজ্জা সরম হয় না।'

'কি—কি বল্‌লি? আমি ছেনাল? জানি না আমি তোদের কথা। ঘর থেকে তোর বউকে যে টেনে বের ক'রে নিয়ে যায় তা' জানি না? কি কলঙ্ক! কি কলঙ্ক!'

'হারামজাদী মাগী মুখ সামলে কথা বলিস্। চাপার দাঁত আর থাকবে না।'

'কি অত ভয় দেখাস রে হারামজাদা! আমি কি জলে ডুবে গেচি?'

চেঁচামেচি শুনে লোক জড় হয়। কেউ ভাল ক'রে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখে না, গঙ্গাবতীর নাম বিকৃত ক'রে প্রতিবাদ করে, ছেলেরা সুবিধে পেয়ে আরও চটায়, গঙ্গাবতী শরীরের নানা ভঙ্গিমা ক'রে প্রতিবাদ করে, গালি দেয়। এমনি ব্যাপার দাঁড়ায় যে, গঙ্গাবতী রাগের মাথায় হয়ত' কোন শব্দ ভাল ক'রে উচ্চারণ ক'রতে পারে নি, সেই শব্দটা বিকৃত ক'রে লোকে গঙ্গাবতীকে যেখানে দেখে সেখানেই বলে; একবার, দু'বার হয়ত' গঙ্গাবতী সহ্য করে—তার পর আর নিজেকে

সামলাতে পারে না, চটে যায়, অতএব কুরুক্ষেত্র বেধে যায়। গঙ্গাবতীকে যদি 'বুড়ী', 'হেঁ-হেঁ', 'আমার ছেলে', 'আমার বুকে দুঃখ' 'তবে রে ছোঁড়া' ইত্যাদি বলা যায়, তবে গঙ্গাবতী ক্ষেপে যায়।…

গঙ্গাবতী হয়ত' ভিক্ষে ক'রতে বের হয়। দিনের অবস্থা ভালো নয় তাই সঙ্গে ছেলেকে নেয় নি। আপন মনে বিড়্ বিড়্ ক'রে চলে, অন্যমনস্ক হ'য়ে যা' ভাবে তা' ভাষায় ফুটিয়ে চলে। ওর কথা শুনলে নিশ্চয় মনে হবে যে সে কারও সঙ্গে আলাপ ক'রে চলছে। লোকে যা মনে মনে ভাবে ও বলে—গঙ্গাবতী তা' আপন মনে বলে চলে, অবশ্য সে বুঝতে পারে না যে তার মনের কথা লোকে শুনছে ও তার ভঙ্গিমা লোকে দেখছে। কেউ যদি তার ভুল ধরিয়ে দেয় তবে সে বুঝতে পারে এবং লজ্জিত হয়; কিন্তু আবার যখন অন্যমনস্ক হয় তখন আর খেয়াল থাকে না।…রাস্তার ধারে ছেলেরা ডাংগুলি খেলছে, হঠাৎ গঙ্গাবতীকে দেখে খেলা ছেড়ে পিছু লাগলো।

'এ পাগলি! ও পাগলি! পাগলি, ছাগলি!'

গঙ্গাবতী কোন উত্তর দেয় না, এড়িয়ে চলতে চায়।

'হেঁ-হেঁ-হেঁ বুড়ী! আমার ছেলে যা'—অমন কি আর আছে, রাজ-পুত্তুর।'

গঙ্গাবতী দ্রুত হাঁটে, রাগে জ্বলে উঠে, তবু এড়াতে চায়।

'তবে রে ছোঁড়া? আমার বুকে দুঃখু উঠেছে। ও পাগ্‌লি! ও বুড়ী!'

'নির্ব্বংশের ছেলেদের জ্বালায় এক পা চলা যায় না গঙ্গাবতী আর সহ্য ক'রতে পারে না, মুখ খিঁচিয়ে বল্লে 'দূর হ'—দূর হ'—নির্ব্বংশের গোষ্ঠী।'

'এ পাগলি! তোর মাথায় বেড়ালের বাচ্চা।'

'হারামজাদা ছেলেরা মরেও না। মর্, মর্! আজই যেন মরিস্।'

'এই বুড়ী! তোর থলেতে কি?'

'থলেতে তোর মা'র বাচ্চা!'

ছেলেরা ঢিল ছোড়ে, গঙ্গাবতী অকথ্য ভাষায় বকাবকি আরম্ভ ক'রে দেয়। গঙ্গাবতী অশ্লীলভাবে বকে, অভিশাপ দেয়, ধীরে ধীরে সরে পড়ে।···

'এই পাগলি! তুই নাকি ডাইনী বুড়ী?'

'তুই নাকি রাক্ষুসী, আস্ত মানুষ খাস্?'

গঙ্গাবতী তেড়ে যায় মারতে, হাত নেড়ে বলে 'হারামজাদারা—'

'ও বুড়ী, ও ডাইনী, ও রাক্ষুসী!'

'মর্, মর্, এখনি মর্, তোর বুকের রক্ত খেয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা করি।'

ছেলেরা সুর ধরে বলে—'ও রাক্ষুসী রে! পাগল ছাগল রে।'

'আমি কেন পাগল হবো, পাগল তোর বাপ্, পাগল তোর মা, পাগল তুই নিজে'—গঙ্গাবতী কুঁজো হ'য়ে মাথাটা তিন ঝুঁকি দিয়ে বলে —'পাগল তোর চোদ্দ-গোষ্ঠী।'

যুবকরা চোখ ইসারা ক'রে ছেলেদের উৎসাহ দেয় ঢিল ছুড়তে, নিজেরাও সুবিধে পেলে ঢিল ছোড়ে। গঙ্গাবতী বেঠিক জন্মের যতগুলি অশ্লীল গালি আছে তা' বলে, মনের আশ মিটিয়ে অভিশাপ দেয়। ছেলেরা যুবকরা হৈ হৈ করে, ঢিল ছোড়ে। গঙ্গাবতী চক্রের মাঝে পড়ে দিশে পায় না, একজনের পিছু নিলে, পেছনের ছেলেরা ঢিল্ ছোড়ে বা কাপড় ধরে হেঁচকা টান মারে, গঙ্গাবতী আবার এদিকে তাড়া ক'রলে অন্যদিকের ছেলেরা পেছন থেকে আক্রমণ করে। চক্রব্যূহে পড়ে গঙ্গাবতীর অবস্থা মারাত্মক হ'য়ে পড়ে। কোন কোন দিন গঙ্গাবতী আহত হয়, অবশ্য ছেলেরা কৌতুক করে, কেউ জোরে ঢিল ছোড়ে না, মারধরও করে না।

বয়স্ক লোকরা গাম্ভীর্য্যের মুখোস পরে আসে রঙ্গ ক'রতে।

গঙ্গাবতী অকূলে কূল পেয়ে কৃতজ্ঞ হ'য়ে সাহায্য চায়, বলে—'দেখ ত' বাবারা। আমি কি পাগল-ছাগল মানুষ। গরীব মানুষ—ভিক্ষে ক'রে খাই, যাচ্ছি ভিক্ষে ক'রতে—আর নির্ব্বংশের গোষ্ঠীরা লেগেছে পেছনে ভাল হবে এদের? ভাল হবে না বলে দিচ্ছি! দেখতো, দেখতো! বাচাধনরা! কি ক'রেছে আমায়!'

বয়স্করা কৃত্রিম রোষে বলে—'এই ছোঁড়ারা! তোরা বড্ড পাজি হ'য়ে গেছিস্! ভাগ এখান থেকে! ফের যদি এর পেছনে লাগবি তবে ভাল হবে না। যাও বুড়ী, সরে পড়ো, আর কিছু বল্‌বে না। এদের মত কি খারাপ ছেলে আর আছে!' চোখ ইসারা ক'রে আবার ছেলেদের উৎসাহ দেয়।

কোন ছেলে হয় ত' ভিক্ষের ঝুলি টান মেরে ছুড়ে ফেলে দেয়, অন্য ছেলেরা হৈ-হৈ ক'রে চেঁচিয়ে উঠে।

গঙ্গাবতী লাফিয়ে, নানা ভঙ্গিমা ক'রে অভিশাপ দেয়—মর্—মর্! নির্ব্বংশ হ'। তোর বাপ মার বুকে চিতার আগুন জ্বলুক (শ্মশানে চিতার আগুন যেমন নিভে না, একটা নিভে, অন্যটা জ্বলে, তেমনি প্রাণে যেন জীবনব্যাপী শোকের আগুন জ্বলে। পল্লীগ্রামে বা ছোটলোকদের মাঝে এ একটা খুব মারাত্মক অভিশাপ)। তোর মুখে যেন তোর মা-বাপ্ ত্রিসন্ধ্যেয় আগুন দেয়। মর্ হারামজাদারা, গোষ্ঠীশুদ্ধ মর্। মড়ক লাগুক। কলেরায় নেয় না কেন? বসন্ত, প্লেগ, মরণ-জ্বরে নেয় না কেন? আজই নিয়ে যাক্!'

গঙ্গাবতী একা পারে না, ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদে, কোন ভাবে পালায়। এক দল ছাড়ে ত' অপর দল পিছু ধরে। ছেলেদের পিছু নিতে পথ খুঁজতে হয় না, গঙ্গাবতী নিজেই মনে করিয়ে দেয়, পথ

দেখিয়ে দেয়। এক পাড়া থেকে যখন অন্য পাড়ায় পালায়—তখন বক্‌তে বক্‌তে, অভিশাপ দিতে দিতে চলে, অন্য পাড়ার ছেলেরা 'কি হয়েছে' বলে খবর নিতে আসে, গঙ্গাবতী মনের দুঃখে সব বলে, ছেলেরা তখন আমোদ ক'রবার জন্যে গঙ্গাবতীর পেছন লাগে। কোন কোন সময় গঙ্গাবতী বর্ষিয়সী মহিলা বা ক্ষমতাশালী লোকদের নিকট এসে অভিযোগ করে, আশ-পাশের ছেলেমেয়েরা গঙ্গাবতীকে দেখতে পেলেই গোল আরম্ভ করে, অবশ্য ওরা ছেলেমেয়েদের সত্য সত্যই বকুনি দেন।...

প্রায় দিনটাই এমন ভাবে কাটে, কোন দিন অবস্থা খুব গুরুতর হয়—কোন দিন অবস্থা খুব গুরুতর হয় না। তবে রোজই ছেলেরা পেছনে লাগে। ছেলে-যুবারা তাকে নিয়ে করে আমোদ, সে আমোদে প্রাণান্ত হ'য়ে উঠে গঙ্গাবতীর।

গঙ্গাবতী রাস্তায় বের হলে শুধু পাগলামি করে না, বাড়িতেও পাগলামি করে! লোক না থাকলে মাথার ছিট বেড়ে যায়। দিন রাত বিড়্ বিড়্ ক'রে, কত কি পাঁচালী আপাঁচালী বকে, পাক্ দিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বাহির হয়, হাত নেড়ে মুখ বাঁকিয়ে অদৃশ্য শত্রুকে গাল দেয়, অভিশাপ দেয়। এক কথা হয়ত' একশ বার বকে, কখনও মনের দুঃখে কাঁদে, কখনও হাসে, কখনও রেগে আগুন হয়। ছেলের সঙ্গেও সর্ব্বদা মাথা ঠিক রেখে কথাবার্ত্তা আচার ব্যবহার ক'রতে পারে না।

কোন দিন দুষ্ট লোকেরা গঙ্গাবতীর কুঁড়ে ঘরের চালে ঢিল ছোড়ে গঙ্গাবতী লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে, কাউকে পায় না, তখন গলা ছেড়ে বকাবকি আরম্ভ করে; গঙ্গাবতীর অকথ্য গালাগাল শুনে লোক জড় হয়, আসর বেশ ভাল ক'রে জমে উঠে, সুযোগ মত দুষ্ট ছেলেরা গঙ্গাবতীকে ক্ষেপায়, ব্যাপার বেশ গুরুতর হ'য়ে দাঁড়ায়। দুষ্ট ছেলে বা যুবারা যখনই গঙ্গাবতীর বাড়ির পাশ দিয়ে যায়—তখন গঙ্গাবতীকে

চটিয়ে গালাগালি, অভিশাপ শোনবার জন্যে একটা না একটা ক্ষতি করেই। অনেক সময় যুবকেরা বা প্রৌঢ়রা গভীর রাত্রিতে স্ফূর্তি ক'রবার জন্যে গঙ্গাবতীর বাড়িতে ঢিল ছোড়ে বা দরজাতে জোরে জোরে ঘা মারে, গঙ্গাবতী বিকটভাবে চেঁচিয়ে উঠে 'মারলো—মারলো। জোর ক'রে ধরে নিয়ে যাচ্ছে আমায়। ষণ্ডা, গুণ্ডা বদমাইসগুলো আমার সতীত্ব নষ্ট ক'রে ফেল্‌লো। জোর ক'রে আমার সতীত্ব নষ্ট ক'রে ফেলছে, কে আছো, বাঁচাও।'···প্রথম প্রথম পাড়াপড়সী সাহায্য ক'রতে আসতো, অবলা নারীকে বাঁচাতে আসতো। এখন আর আসে না—কারণ তারা বুড়ী পাগলিনীর পাগলামি বুঝতে পেরেছে। পাগলের প্রলাপে নিদ্রাভঙ্গ হয় বলে রীতিমত চটে যায় পাড়াপড়শীরা। আমরা কিন্তু জানি—এ পাগলের প্রলাপ নয়, যৌবনের বিভীষিকা।···

এমনই ক'রে চলে অভিশপ্ত জীবন। এ যেন একটা খেলা, শুধু মূল্যহীন খেলা মাত্র। নেই তার উদ্দেশ্য, নেই কোন আদি, অন্ত, নেই কোন ভিত্তি। হয়তো স্বপনের ঘোরে অলীক কল্পনার ভয়াবহ বিভীষিকা। করুণাময়, দয়াময়, সর্ব্বমঙ্গলময় দেবতাকে চিনি নে, বুঝিও না, অবশ্য চেষ্টাও করি নে। বুঝি নে দার্শনিক তত্ত্ব। লোকের রচিত দর্শনতত্ত্ব শুনলে মনে হয় শুধু তোষামোদ, শুধু নিরুপায়ের আত্মবঞ্চনাময় হতাশ সান্ত্বনা। হয়তো আমার ভুল, ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার দোষ। কিন্তু গঙ্গাবতী ত' ভুল নয়! এই যদি তার চিরন্তন খেলা, বিশেষত্ব—তবে তার চেয়ে ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর পাপী কে? হয় তো এই তাঁর রহস্য, অস্তিত্ব-হীন মানুষের জীবন ধোঁয়া, সুখ দুঃখ নাম মাত্র, মনের সংস্কার, ভুল! যদি তাই হয়, তবে বাস্তব এত বড়, এত দৃঢ় কেন? বাস্তব যদি কিছু নয়—তবে পাপ, পুণ্য, সুখ-দুঃখ, ব্যবধান অনুভূতি কেন? এত বৈচিত্র্যই বা কেন? স্বপ্ন অলীক জানি, কিন্তু দুঃস্বপ্নের আঘাত ত'

অলীক নয়। অসীম বাস্তবতার মাঝে অতি সূক্ষ্ম দর্শনের রেখাপাত করা—কি করুনাময়ের দয়া বশতঃ সান্ত্বনা দেওয়া—না পথ পরিষ্কার রাখার ধূর্ত্ত চাতুরি?

হয়ত' বা গঙ্গাবতী মানুষ নয়—অমানুষ, হয়ত' অতিমানবী (Superwoman). কোন দিন সে মানুষ ছিল যখন সে ছিল পুরুষের সঙ্গিনী, সংসাররূপ খেলার মাঠে ছিল একটি আসবাব। জীবনের প্রথম অধ্যায়ে সে আমাদের মত, তোমাদের মত, ওদের মতই মানুষ ছিল, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আসে আমূল পরিবর্ত্তন, সংস্কৃতি। তৃতীয় অধ্যায়ে হয় গঙ্গাবতীর মৃত্যু! সত্যিকারের গঙ্গাবতীর মৃত্যু হ'য়েছে, আমাদের পরিচিত, স্বজাতি গঙ্গাবতী আর নেই। এখন যাকে দেখচি তাকে আমরা চিনিনে! গঙ্গাবতীর তৃতীয় অধ্যায়কে আমরা মান্‌তে পারি নে, স্বীকার ক'রতে পারি নে!···ওর মাঝে যে রূপ দেখচি তাকে কি বিশ্বমাতৃরূপ বলে মানতে পারি?—

উৎসের মাঝে নদী যত অনাবিল, স্বচ্ছ, পবিত্র, নির্ম্মল থাকুক না কেন, যখন পৃথিবীর বুকে এঁকে বেঁকে সঞ্চালিত হয়, আপনাকে অতি সহজে বিলিয়ে দেয় দুনিয়ার মহৎ কল্যাণার্থে তখন পারে না নিজের পবিত্রতা, শুচিতা, বিশুদ্ধিতা, সংস্কার বাঁচাতে। তার পবিত্রতা দান ক'রে বাঁচাতে হয় মানুষের বিশুদ্ধি, গ্রহণ ক'রতে হয় আবর্জ্জনা, অপরিষ্কৃততা, অপবিত্রতা। বিশ্বমাতা বসুন্ধরা অম্লান বদনে বিলিয়ে দেয় সন্তানের জন্যে তার রূপ, রস, সৌরভ, প্রাণশক্তি, পবিত্রতা। প্রতিদানে সে পায় কত অত্যাচার, অন্যায়, অবিচার। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু মাতৃরূপে বিকশিত, যারা জননী বলে পূজা পেয়ে এসেছে প্রত্যেককেই যে ক'রতে হ'য়েছে প্রতিদানহীন অসীম দান, দিতে হ'য়েছে আপনাকে বিলিয়ে, সহ্য ক'রতে হ'য়েছে কত অবিচার, পীড়ন,

অসহ্য দাগার জ্বালা। বিশ্বমাতার আপন সত্বা নেই বলেই হয়তো তার এমনি রূপ, এমনি পরিণতি! ক্ষুদ্র পরিসরে মানুষের বিচরণ তাই তার এত বিভীষিকা, এত বড় সংস্কার বিশ্বমাতৃরূপে! বৃহৎ জীবনে, উচ্চতম জীবনে কে না করে আপনাকে দান! বুদ্ধদেব দিয়েছেন মত্ত হাতির পদতলে মাথা পেতে, চৈতন্য দিয়েছেন মাথার টাটকা রক্ত অশ্রুজলে মিশিয়ে বিশ্বপ্রেম, যিশু খৃষ্ট ক্রুশ বিদ্ধ হ'য়ে পরপারে যেতে যেতে হাত প্রসারিত ক'রে ক'রেছেন প্রেম দান।

এও তো দর্শনতত্ত্ব! গঙ্গাবতীর জীবনকে আধ্যাত্মিক জীবনে টেনে এনে কি বাস্তব জীবনকে অস্বীকার করা চলে, যদি নাই চলে তবে এত বড় রহস্যের কীই বা আছে উত্তর?..

পরিশিষ্ট

আগাছার কি ক'রে শিকড় গজালো, উর্ব্বর মাটি আঁকড়ে ধরে সজীব হ'তে লাগলো, তা' আপনাদের বলেচি। কি ক'রে ডাল শাখা ফুল পাতার বাহার ছড়ালো, হয়তো অলিও মুঞ্জরিয়ে উঠতে পারে এমনই অবস্থায় দাঁড়িয়েছে; তা' বলতে চাই নে। আগাছাই হোক বা অন্য কিছুই হোক, ভূমিকায় ভীষণ ঝড়ঝঞ্ঝা ছিল, সুতরাং মাঝ পথে থাকাও স্বাভাবিক—তবে বাঁচলো কি ক'রে? যাই হোক, যে ভাবেই হোক বেঁচেছে, ক্রমে বেড়েও চলছে। আগাছা এখন বৃক্ষ, উপেক্ষা করা যায় না।

গঙ্গাবতীর ছেলেকে দেখ্‌চি তেরো চোদ্দ বছরের কিশোর। নাম তার বনয়ারী। দেহ ঋজু নয়, মাংসপেশী দৃঢ় নয়, হেংলা, শরীর ঈষৎ মলিন, শরীরে বিশেষ শক্তি আছে বলে মনে হয় না, কিন্তু প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘ ভুজদ্বয় ও চেহারায় একটু বিশেষত্ব আছে, উপেক্ষা করা যায় না, কৌতূহল হয় তাকাবার জন্যে, বেশ লাগে দেখতে, তৃপ্তি মিলে ঐ ধীর, স্থির, গম্ভীর ছেলেটিকে দেখে! ওর মুখে যেন এই কথাটিই লেখা আছে যে, সে সাধারণ নয়; তার চাউনিতে আছে সরলতা, তীক্ষ্নতা; অপক্ক, কচি ললাটে আছে লেখা যে, সে অতি দৃঢ়চিত্ত। অথচ তার না আছে নিয়ম-কানুন, না আছে কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপদ্ধতি (principle)। কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, প্রয়োজন বলে কোন কিছু নেই। ছোট ছোকরা খেয়াল বশে চলে। যখন যা' সুবিধে হয় তাই করে, নিজের

কোন স্বার্থ নেই, সেজন্যেই কোন অন্যায় ক'রতে হয় না। সে ধীর, স্থির, স্বাধীনচেতা অথচ যাযাবরের মত অসংলগ্ন জীবন তার।

বনয়ারী ছেলেবেলায় এমন ছিল না, বছর দু'এক যাবৎ এমন ধারা হ'য়েছে। দু'বছর হলো তার মাতার মৃত্যু হ'য়েছে। গঙ্গাবতী মৃত্যুর পারে যাত্রা ক'রে চলতে চলতে মুখ ফিরিয়ে ছেলেকে তার নিজের, স্বামীর কথা ও বনয়ারীর জন্ম-কাহিনী বলে যায়। পিতার কথা, মাতার কথা ও নিজের কথা যেদিন জানতে পারলো সেদিন থেকেই বনয়ারীর জীবনধারা বদলে যায়। মনুষ্য জীবনের ওপর একটা বিতৃষ্ণা হ'য়ে যায়। পরশুরাম পিতৃ-আজ্ঞায় জননীকে হত্যা ক'রে পিতার নিকট পশু আখ্যা পেয়েছিলেন, বনয়ারী সেদিন জনকের সন্ধান পেলে পিতৃহন্তা হ'তো, হয়তো তার জননী তাকে ক্ষমা ক'রতেন না, তবু সে পিতাকে হত্যা করতো, একটু দ্বিধা, একটু সঙ্কোচ বোধ করতো না, এমনই তার মনের অবস্থা হ'য়েছিল।

অভিশপ্ত ভাই-বোনদের জন্যে পড়েছিল দীর্ঘ নিঃশ্বাস, ভক্তিতে অবনত হ'য়েছিল মস্তক দেবী কিশোরী বাঈ'র চরণ উদ্দেশ্যে। যোড় হাতে প্রণাম ক'রেছিল দেবতুল্য রজতকে। রজত যত সামান্য মানুষ হোক না কেন তার নিকট সে দেবতা! তাকে রক্ষা ক'রবার জন্যে যে, সে প্রাণ দিয়েছিল, ক'রেছিল অতি হীন কাজ। মাতার ওপর ঘৃণা হয় নি, ক্রোধ হয় নি, হ'য়েছিল মমতা, পড়েছিল সহানুভূতির নিঃশ্বাস, কিন্তু মাতার অপত্য-স্নেহকে সে ক্ষমা ক'রতে পারে নি। যুধিষ্ঠির যেমন কর্ণের জন্ম-কথা শুনে কুন্তীদেবীকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তেমনই বনয়ারিও মাতার অপত্য-স্নেহকে অভিশাপ দিয়েছিল। অপত্য স্নেহে অন্ধ না হলে তার মৃত্যু হতো সুনিশ্চিত। ক্ষতি কি ছিল, সে অবস্থায় মৃত্যুই যে শ্রেয়ঃ ছিল; কত বড় একটা মহা উপকার হতো

তা'তে। জননীকে অত ছোট, অত হীন হ'তে হতো না, তার নিজের জীবনের প্রারম্ভে অত বড় একটা বোঝা মাথায় চাপতো না। এ ভারি বোঝা কি আর এ জীবনে নামবে ?

বনয়ারীর জীবন বেশ সুখেই কাটছিল। অন্ন-সমস্যা ভিন্ন অন্য কোন সমস্যা ছিল না, গরিবের গরিবপণার কোন জ্বালা যন্ত্রণা ছিল না। গরিব দুঃখীরা দুঃখ কষ্ট সইবে, কুলি মজুরী ক'রেই জীবন কাটাবে। নিরাশ্রয় গরিব দুঃখীর যখন তখন দুঃখ কষ্ট হবেই, সকলেরই হয়—তারও হবে, হওয়াটাই স্বাভাবিক, জগতের নিয়ম। অবশ্য মাতার জীবিত কালে কোন দুঃখ তাকে ছুঁতে পারে নি, মা'র সঙ্গে রাগারাগি ক'রেও বৃদ্ধা জননীর শারীরিক পরিশ্রমে ভাগ বসাতে পারে নি, খেলাধূলা ক'রে সময় কাটাতে হতো, কুলি মজুরদের রাত্রির স্কুলে পড়তে যেতে হতো, তবে সে ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুত ছিল! সে জানতো—তার পিতা জীবিত নেই, তার কোন ভাই-বোন নেই, কোন দিন ছিল কি-না তা'ও জানতো না, জানতো শুধু তার মাকে, মা'র অপত্য-স্নেহকে ; চিনতো না কিন্তু গঙ্গাবতীকে। মুমূর্ষুর মুখে যখন সব কথা একটি একটি ক'রে জানতে পারে তখন বিশ্বাস করে নি, প্রথম ভেবেছিল রোগীর প্রলাপ। কিন্তু প্রলাপ ত' এমন হয় না। একি এক প্রহেলিকা! সুষুপ্তির স্বপ্ন নয়, জাগ্রত স্বপ্নও নয়! এ যে সত্য! পিতা থেকেও পিতা নেই, অথচ তার বিষাক্ত, ভয়ঙ্কর প্রভাব চারদিক ঘিরে রয়েছে, কেন সে পিতৃহীন হয় নি। একটি একটি ক'রে তার চারটি ভাই-বোন মারা গেলো, কিশোরীবাঈ মারা গেলো, রজত মারা গেলো, জগতে কত লোক মারা যাচ্ছে দলে দলে ; শুধু কি তার জন্যে, পিতার জন্যে মৃত্যুর অসীম দয়া! কি অসীম অনুগ্রহ, দয়া! এক একবার টেনে নেয় আবার ফিরিয়ে দেয়! জননী ? জননীর কথা ভাবতে পারে না। সর্বাঙ্গ শিথিল

হ'য়ে পড়ে, মন প্রাণ জড় অসাড় হ'য়ে যায়। উঃ! এত বড় দুঃখিনী এত বড় অভিশপ্তা কি কখনও এই বৈচিত্র্যময় বহুরূপী দুনিয়াতে জন্মেছে! পতিতা নয়; চরিত্রহীনা নয়—তবু পতিতা চরিত্রহীনার অধম। মিথ্যাবাদিনী জোচ্চোর নয়—তবু মিথ্যাবাদিনী জোচ্চোরের শীর্ষা। কেন? এর উত্তর—সে নারী; তার দুর্ব্বলতা, তার মাতৃত্ব! বনয়ারী মানুষ দেখলেই ক্ষেপে যায়, জননীর কোলে সন্তান দেখলেই শিউরে উঠে।...ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে জগতের মাতৃত্ব মুছে ফেলতে, তা' যদি সম্ভবপর না হয় তবে যেন অপত্য-স্নেহ না থাকে। জননী শুধু সন্তান গর্ভে ধারণ ক'রবে, তারপর অবস্থা বুঝে গলা টিপে ধরতে একটুও কুণ্ঠিত যেন না হয়। সন্তান শুধু সন্তান, রক্ত-মাংস বিশিষ্ট নর বা নারী, এসেছে আলাদা—যাবে আলাদা—এই সম্পর্কই থাক্‌বে সর্ব্বদা।

বনয়ারী যেন স্রোতের ফুল, অজানা অচেনা, অনির্দ্দিষ্ট; ভেসে এসেছে—ভেসে চলছে এই তার পরিচয়। দুনিয়ার প্রতি না আছে মমতা, না আছে লোভ, না আছে ক্রোধ, না আছে আক্রোশ। স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, সৌহার্দ্দ্য, ভক্তি, প্রেম সে জানে না—অনুভূতির সীমানায় টলবার মত স্বাভাবিক প্রকৃতিও নেই। দুনিয়াটাকে বিশ্বাসও করে না; আগাগোড়া আদি অন্ত সবই যেন ফাঁকি। এখান থেকে ধাক্কা খেয়ে ওখানে যায়, ওখান থেকে ধাক্কা খেয়ে অন্য পথে যায়। বাঁধন আঁটে না; রেখা কাটে না, আঁচড় লাগে না, কাঁটা ফোটে না। কোন কিছুই তাকে অভিভূত ক'রতে পারে না; কোন কিছুই তা'কে নাগাল পায় না, সে বড় উঁচুতে উঠে বসেছে। কেউ তাকে আঘাত দিলে সে আঘাতের প্রতিশোধ নেয় না; দাগা দিলে দাগার জ্বালা অনুভব ক'রবার ইন্দ্রিয়কে খুঁজেও পায় না; ব্যথিত হয় নিজের জন্যে নয়, ওর বোকামির জন্যে, ওর ভুলের জন্যে।

দুনিয়ার ভুলের ফাঁদকে ফাঁকি দেবার জন্যে বনয়ারী সাধু সন্ন্যাসীর পিছনে, বনজঙ্গলেও ঘুরেছে—পথ পায় নি, সত্যের সন্ধান পায় নি, শান্তি পায় নি, মনের ক্ষুধা মেটাতে পারে নি, বিভ্রান্তের মত ঘুরতে ঘুরতে আবার ফিরে এসেছে। দুঃখ কষ্টের প্রভাব ক্ষমতাহীন, অকর্ম্মণ্য।

যখন কাজ ক'রবার আবশ্যক হয়, জঠর জ্বালাকে নিতান্ত আর দমিয়ে রাখা যায় না, তখন গতর খাটে। হাতের কাছে কাজ জুটলে কাজ করে, যে যেমন খুশি মজুরী দেয়, কোন আপত্তি করে না, বিরক্ত হয় না; বেশ সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে। কাজ মেলে ত' করে, নতুবা কাজ নিয়ে অপরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে না। চাহিদা জিনিষটা তার নিতান্ত নেই, একটু অন্যমনস্কই থাকে সর্ব্বদা। শীত, গ্রীষ্ম ফুটপাতে, মাঠে, এখানে সেখানে কাটায়, বর্ষাকালে গাড়ি বারান্দায় বা কোন আবরণের নীচে স্থান না হলে জলে ভেজে; ভেজা জামা কাপড় গায়ের উত্তাপে শুকায়।

সে কারও অনুগ্রহ চায় না; সাহায্য চায় না। অনেক সহৃদয় ব্যক্তি বনয়ারীকে সাহায্য ক'রতে চান, নিরাশ্রয় বালককে আশ্রয় দিতে চান, সে কোন সাহায্য নেয় না; বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে। অপরের অনুগ্রহ স্বীকার ক'রে সে কেন নিজকে হীন ক'রবে, অপমান ক'রবে? অপরের অনুগ্রহ নেবার যে তার ক্ষমতা নেই, কোন যুক্তিতে সে নিতে পারে, সে ত' অক্ষম নয়।

বনয়ারীর নিকট গরিব ধনী, উচ্চ নীচ, শ্রেষ্ঠ অধম নেই, সবাইকে অনুকম্পার চোখে দেখে। হয়ত' স্পর্দ্ধা দাম্ভিকতার পরিচয়, তবে সে দাম্ভিক নয়, মনে এতটুকু মলিনতাও নেই। স্বেচ্ছায় পতিতারও উপকার করে, সুযোগ পেলে সতী দেবীরও সাহায্যে স্বেচ্ছায় নেমে আসে।

এমনই চলছিল তার জীবন, চলছে ক্ষতি কি, চলছে যখন চলুক না খেয়াল মত; প্রকৃতির অমন বাধ্য শান্তশিষ্ট শিশু দুনিয়াতে আর যোড়া

মিলে না। না আছে বিদ্রোহ; না আছে গোল। যেন মধ্যাকর্ষণের মত স্বাভাবিক। মধ্যাকর্ষণকে না পায়া যায় অনুভব করা, না হ'তে হয় সতর্ক—অথচ সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে তার প্রভাব। পরস্পরের বাঁধন একটু শিথিল হলে কেউ পড়ে ওপর থেকে ছিটকে—কেউ বা শূন্য থেকে। তার হিঁচড়া হিঁচড়িতে সর্ব্বদা সতর্ক—অথচ তার কথা ভাববার সময় পায় না, মনেও রাখে না; পড়ে যাবার ভয়টা কিন্তু থাকে। মানুষের সঙ্গে, জীব জন্তু জড় পদার্থের সঙ্গে মধ্যাকর্ষণের যেমন সম্পর্ক—তেমনই বনয়ারীর সঙ্গে তার জীবন ধারার সম্পর্ক ছিল। এখন সে কোথায়, কি ভাবেই বা তার জীবন চলছে জানি নে। বনয়ারীর জন্তে দুঃখ হয়, বড় কষ্ট হয়, আপনাদের প্রাণেও হয়ত' ঘা দিয়ে ... ব তার মনের ঘাত প্রতিঘাত। প্রার্থনা ক'রবেন, আমিও সর্ব্বান্তকরণে প্রার্থনা করছি—এমনি মনস্তত্ত্ব যেন বাস্তবে আর কখনো না মিলে। কিশোরীর যোড়া কচিৎ মিলে; কানাই পথে ঘাটে ছড়িয়ে আছে। কবে সে দিন আসবে যখন ঘরে ঘরে কিশোরীকে পাবো—আর কানাইকে কখনও পাবো না? গুরুতর ওপর কোন কথা বলবার আমার ক্ষমতা নেই, আমার মন, বিবেক, বিচার, বুদ্ধি এ স্থলে জড়, আপনাদের ওপর ছেড়ে দিয়ে একটু সান্ত্বনা পাবার আশা করি।...

সাঁজের আঁধার, আরও আঁধার, জমাট কুচকুচে আঁধার হ'য়েছে—পাহাড়ের মত শির তুলে কাল মেঘ হুড়াহুড়ি ক'রে আকাশ ছেয়ে ফেলছে। প্রচণ্ড বেগে ঠোক্কর খাচ্ছে, আগুনের হল্‌কা কস্‌ ক'রে জ্বলে উঠে এঁকে বেঁকে শীতল জলে নিবে যাচ্ছে, বজ্র বজ্র-নিনাদে হুঙ্কার দিচ্ছে! এমনি এক দুর্য্যোগে বনয়ারী একটা বিশ্রী গলির ভেতর দিয়ে চলছিল। রাস্তার এক বৃদ্ধকে মৃত্যু-যন্ত্রণায় গোঙাতে দেখে তার প্রাণ কেঁদে উঠে, প্রলয়ের ঝড় বাদলকে উপেক্ষা ক'রে সে যায় বৃদ্ধের সেবা ক'রতে। বৃদ্ধ

তখন প্রলাপ বকছিল, জীবনের মহাপাপের অনুতাপে মৃত্যু-ভীতির চেয়ে বেশি ছট্‌ফট্ ক'রছিল। তার কাতরতা অনুতাপ দেখলে পাষাণের পাষাণ-হৃদয় গলে যায়। এক এক ক'রে তার জীবন কাহিনী বলে যাচ্ছিল আর অসহায় শিশুর মত কাঁদছিল, গঙ্গাবতীর নিকট ক্ষমা চাইবার মত ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে বলে তার প্রাণ ফেটে যাচ্ছিল।

বনয়ারী পাষণ্ড নর পিশাচের পরিচয় পরে ভুলে গিয়েছিল, হারিয়ে ফেলেছিল আপনাকে, রক্ত হ'য়েছিল চঞ্চল, শিরায় শিরায় প্রবাহিত হ'য়েছিল খুনী রক্ত মুহূর্ত্তের তরে, অতি কষ্টে নিজেকে সামলিয়ে নেয়, মনকে স্বাভাবিক করে। অসহায়, নিরাশ্রয়, অনুতপ্ত মুমূর্ষুকে ত্যাগ ত পারে নি। প্রাণ দিয়ে সেবা শুশ্রূষা ক'রেছিল অদৃশ্য প্রভাবে।

ভেবেছিল কোন পরিচয় দেবে না, কিন্তু পারলে না। যে সম্বন্ধ বিশ্বাস ক'রতে কষ্ট পেতো, এড়িয়ে চলতো, উপেক্ষা ক'রতো, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলে না। আসন্ন জীবনমুখী কিশোর বনয়ারী তখন নিতান্ত শিশুর মত হ'য়ে গিয়েছিল। অনুতপ্ত, অসহ্য জ্বালায় ক্লান্ত, বিভ্রান্ত মুমূর্ষুকে সেবা ক'রতে ক'রতে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছিল—'পিতা, পিতা' বলে কানাইকে জড়িয়ে ধরতে বাধ্য হ'য়েছিল।

উঃ! কি করুণ সে দৃশ্য। মুমূর্ষু ছেলেকে শিথিল হস্তে উত্তপ্ত বক্ষে চেপে ধরে এমনিভাবে ক্ষমা ক'রতে বাধ্য হলো। রক্তের টান, রক্তের প্রভাব কি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন! মৃত্যু, তুমিই শ্রেষ্ঠ! তোমার পরশ যদি না ছড়াতে তবে কি বনয়ারী ক্ষমা ক'রতো? রক্তের টান কি ব্যর্থ হতো না?...

কানাই যাবার বেলায় বলে গিয়েছিল—বনয়ারী যেন পিতৃভূমিতে গিয়ে বাস করে, কুলি মজুরের পেশা যেন না নেয়। শহরের কুলি মজুরের চেয়ে পল্লীগ্রামের চাষীদের জীবন অনেক ভাল। চাষীরা

স্বাধীন, ওদের টাকাকড়ি নেই—কিন্তু ওদের জীবন স্বচ্ছন্দভাবে চলে। ওদের ক্ষমতা অল্প, [illegible] আকাঙ্ক্ষা, চাহিদাও অল্প, তাই তাদের জীবনে তৃপ্তি সুখ প্রচুর পরিমাণে মিলে। যুবকরা টাকার লোভে শহরে ছুটে আসে—কি মোহে বুঝতে পারে না, নগদ টাকার লোভে কুলি মজুরের পেশা সাদরে গ্রহণ করে। মজুরীর টাকা পায়, মদ খেয়ে আমোদ করে। অত্ত পরিশ্রমের পর মদ না খেয়ে পারে না। এদের জীবনে যে আনন্দ উৎসব নেই—তাই এদের দল বেঁধে মদ খাওয়াটা মস্ত বড় আমোদ, স্ফূর্তি। কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের পর উপযুক্ত খাদ্য পায় না, নোংরা [illegible] স্বাস্থ্য হারায়, সাংসারিক অর্থ টানাটানিতে ধৈর্য্য হারায়, [illegible] জোরে চরিত্র হারায়, দ্রুত অধঃপতনের চরম শিখরে নেমে যায়। পল্লীবাসীদের চরিত্রও দেবতুল্য নয়, স্বাস্থ্যও বিশেষ ভাল নয়, আমোদ উৎসবও বেশি নেই, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যও তেমন ভাল নয়—তবে কুলি মজুরদের তুলনায় অনেক ভা[illegible] এরা মোটা ভাত রুটির রীতিমত [illegible] করতে পারে, নির্মল হাও[illegible], জীবন অতি সাধারণ ধারায় চলে বলে ওদের তুলনায় অনেক সুখকর—ভাল। দু'দলই [illegible] [illegible] মত, একটাকে ঘুণে দ্রুত ক্ষয় করে, অপরটাকে করে না। [illegible] যত কুলি মজুর আছে ওদের অধিকাংশেরই দেশে জমি জমা আছে, ওরা বেশ স্বচ্ছন্দে জীবন চালাতে পারে—কিন্তু অর্থের লোভে [illegible] চাকরি নেয়—অধঃপতনের দ্রুত [illegible] মুখে ছুটে।

[illegible] আত্মহত্যা ক'রে মরে নি, কুলি মজুরও হয় নি, [illegible] [illegible]। [illegible] হ'তে চেষ্টা ক'রছে, না এখন খেয়ালী হেঁয়ালিপূর্ণ [illegible] [illegible] ত' জানি নে।